প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের
প্রাঞ্জল ইতিহাস

কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের

অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম্. এ., বি. টি.

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য : সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩-বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতৃদেব—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ঘোষ মহাশয়ের

শ্রীচরণেষু

নিবেদন

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, তৎসম্পর্কে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিতে আমি প্রয়াস পাইয়াছি। বঙ্গভাষা কালক্রমে কিরূপে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিবরণ সহজে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে আমি চেষ্টা করিযাছি। পরিপূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত দান করা অপেক্ষা, একটা মোটামুটি বিবরণ দিযা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দিতে আমি সমধিক যত্ন লইযাছি। এই কারণে ইতিকথা অপেক্ষা সমালোচনা এই গ্রন্থের অধিকাংশ অধিকার করিযাছে। কোন জটিল সমস্যার উল্লেখ করিয়া ও উহার সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা করিয়া কোনরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে আমি কোথাও প্রবৃত্ত হই নাই। এমন কি, সন-তারিখ লইযাও আমি বিশদ আলোচনা করি নাই। সকল বিষয়েই আমি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিযাছি। তবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে সরল ও সহজভাবে নির্দেশ করিতে এবং বিষযবস্তুটিকে যথাযথ সাজাইযা ও গুছাইয়া বলিতে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিযাছি। এইটুকুই মাত্র আমার কৃতিত্ব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রম, পৌর্বাপর্য, কাল-নির্ণয়, কবিবৃন্দের আবির্ভাব-কাল, গ্রন্থরচনার সময় ইত্যাদি বিষয়ে আমি প্রধানতঃ ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায, ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর প্রভৃতি সাহিত্যরথিবৃন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছি। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, সেখানে যেটিকে আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করিযাছি, সেইটিই লইয়াছি। বিভিন্ন মতের ও নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিযা কোনরূপ গভীর আলোচনা করি নাই।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমি মোটামুটি চারি যুগে মাত্র বিভক্ত করিয়াছি—আদি, গৌড়ীয়, চৈতন্য ও কৃষ্ণচন্দ্রীয যুগ ; ও চারিটি বিভিন্ন অধ্যায়ে একে একে চারি যুগের কথা বলিয়াছি। প্রত্যেক যুগের সূচনায় একটি ভূমিকাতে ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে দিয়াছি,

তাহার পরে, সেই যুগের প্রসিদ্ধ কবিদিগের জীবন-কথা ও তাঁহাদের রচিত কাব্যাদির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অনেক স্থলেই আলোচ্য কাব্যাদির সুন্দরাংশগুলি প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে,—যাহাতে ঐ কাব্যের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি স্বদেশবাসিগণের প্রবল অনুরাগ দেখা দিযাছে, সত্য বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যমালাব সঙ্গে এখনও তাহাদেব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। প্রাচীনকালে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন—এইটুকুমাত্র অনেকেই জানে, কিন্তু তাঁহাদের কাব্য ও কবিত্ব বিষযে তাহারা অতি সামান্যই জ্ঞাত আছে। মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, বামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি যে আবো কত কবি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদেব কাব্য-কবিতা বিষযে কোনরূপ ধারণা অনেকেবই নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ন্যায প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যও যে বিশাল, বিচিত্র ও গভীব কবিত্বে পরিপূর্ণ,—তাহা অনেকেই জানে না। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কত মনোহর কাব্য: চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ আদি শত শত গীতিকাব্য; পল্লী-গীতিকা, নাথ-গীতিকা ইত্যাদি কত হৃদযগ্রাহী কাহিনী; অদ্বৈত, চৈতন্য, নরোত্তম প্রভৃতি কত মহাপুরুষের জীবন-কথা; বিরহ, মিলন, প্রণয, ভক্তি বিবিধ ভাবের অসংখ্য কবিতা বঙ্গভাবতীর প্রাচীন ভাণ্ডাবে সঞ্চিত রহিযাছে। এই সমৃদ্ধ অতীত সাহিত্যের সহিত সকলেবই যাহাতে নিবিড পরিচয ঘটিতে পারে, সেইদিকেই আমি বরাবর লক্ষ্য রাখিযাছি। এই কারণে বড় বড কবি ও তাঁহাদের কাব্যাদি লইযা আমি বিস্তৃত আলোচনা করিযাছি; কিন্তু অখ্যাত কবি ও নিকৃষ্ট কাব্য বিষযে বিশেষ কিছুই বলি নাই। ছোট-বড সকল কবিব উল্লেখ ও পাঠ্য-অপাঠ্য যাবতীয পুথির বিবরণ দিয়া, আমার আলোচনাকে আমি অযথা ভারাক্রান্ত করি নাই। কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ কবি বা কোন বিখ্যাত কাব্যের কথা আমি বাদ দেই নাই।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্বন্ধীয বহু গ্রন্থ হইতে উপকরণ এই ইতিহাস-রচনায আমি আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়াছি। ইহার বহু স্থানে বহু গ্রন্থের বহু বাক্য যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে,—যাহাতে ইহা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কোন কোন বিষয়, আমার নিজের ভাষায় না বলিয়া, সেই বিষয়ে যিনি বিশেষ পারদর্শিতা

লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ভাষাতেই বলিয়াছি এবং পাদটীকায় তাঁহার নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। বহু গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি এই ইতিহাস-রচনায় অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু সর্বত্রই সাহিত্যের ধারাটিকে আমি নিজেই অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই [illegible] ধারাটি যাহাতে পাঠকের চিত্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে, তন্নিমিত্ত অনাবশ্যক বিষয় আমি যথাসাধ্য পরিহার করিয়াছি। এই হেতু এই পুস্তকে সকল গ্রন্থকারেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে না; কিন্তু বঙ্গবাণীর যাঁহারা পরম পূজারী, তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা ইহাতে প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাহিত্যের মূল ধারাটি কোথাও উপেক্ষিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ও বি-এ পরীক্ষা দিতে এই গ্রন্থখানি যাহাতে পরীক্ষার্থীকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে, সে বিষয়ে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। এই ইতিহাস-পাঠে বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের অন্তরে যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়, ও বাঙ্গালীর "মাতৃকোষে রতনের রাজি" দেখিবার সাগ্রহ কৌতূহল যাহাতে তাহাদের চিত্তে জাগে,—তাহাই আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

এই গ্রন্থখানি লিখিতে আমি এত বেশী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি যে, উহাদের সবগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়;—গ্রন্থশেষে মাত্র কয়েকখানির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থসমূহের সুবিজ্ঞ লেখকবর্গের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সবিনয়ে নিবেদন করি।

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা,
৫ই কার্তিক, ১৩৬৪
কোচবিহার।
22nd October, 1957.

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ।

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

বিস্তৃত বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ-বিভাগ

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদি যুগ

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড়ীয় যুগ

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্যযুগ

৯৪—৩২১

পঞ্চম অধ্যায়
কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

প্রাচীন

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ-বিভাগ

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত অনুসন্ধান ও গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, বিগত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গভাষার উদ্ভব ঘটে, ও তৎপরে বিভিন্ন যুগে বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, এবং কালক্রমে ইহার দ্বারা এক বিশাল বাঙ্গালা সাহিত্য রচিত হয়। বাঙালা, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাই সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা, এবং ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সুবিখ্যাত। বাঙ্গালা ভাষার এই বিরাট সাহিত্য বর্তমানকালে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই,—পৃথিবীর প্রায় সকল সুসভ্য দেশে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড, ফরাসী, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশেও ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যের তুলনায় ইহা এখন আর নগণ্য নহে ;—"আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন যথেষ্ট উচ্চে।"[১]

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর

কিন্তু "বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবীন সাহিত্যকে লইয়া,"[২] প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষ কোন স্থান ইহাতে নাই। কারণ, বিদেশ তো দূরের কথা, এই স্বদেশেরই অনেকের নিকটে ইহা এখনও সুপরিচিত নহে। ইহাকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়াই, নবাগত ইংরাজী-

১, ২ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'।

সাহিত্যকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া, নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠে। তাই, ইহার সম্বন্ধে সবিশেষ না জানিলেও, নবীন সাহিত্যের মর্ম-গ্রহণে কোন বাধা জন্মায় না, বরং ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে, এই নবীন সাহিত্যের অভিনব ভাবধারা যথার্থভাবে অনুভব করা যায়। এতদ্দেশে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে, ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এই নবীন সাহিত্যের উদ্ভব হইতে থাকে। এই হেতু, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসকে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগে অতি সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়—(১) প্রাচীন যুগ ও (২) নবীন যুগ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী বাঙ্গালা সাহিত্য—'প্রাচীন সাহিত্য' ও উহার পরবর্তী কালের সাহিত্য—'নবীন সাহিত্য' নামে অভিহিত। প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সকল গ্রন্থই পদ্যে রচিত, আর নবীন সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য উভয় জাতীয় গ্রন্থেরই প্রাচুর্য। প্রাচীন যুগে গদ্যভাষার সাহিত্যিক প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে, কিন্তু নবীন যুগে গদ্যভাষার অনুশীলন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই নবজাত গদ্য-সাহিত্য-সম্ভারের দ্বারাই নবীন সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। প্রাচীন সাহিত্যে কেবলমাত্র কাব্য, কবিতা ও গীত, আর নবীন সাহিত্যে এইগুলি তো আছেই, তাহার উপরে আছে নাটক, মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও নানা শ্রেণীর রম্য রচনা, বিজ্ঞান, দর্শন ও বিবিধ শিল্প-বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রাচীন সাহিত্যের কথাই আলোচিত হইবে, কাজেই নবীন সাহিত্যের কথা এখন এখানেই থাকুক।

প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন সাহিত্য

সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ভাষার তুলনায় বাঙ্গালা ভাষা তেমন প্রাচীন নহে। এখন হইতে মাত্র এক সহস্রাধিক বৎসর কাল পূর্বে তৎকালীন মগধ-প্রচলিত 'পূর্বীপ্রাকৃত' ভাষা হইতে ইহার উদ্ভব হয় ও "খ্রীষ্টীয় ৯৫০ সালের দিকে"[১] ইহা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। ইহার প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর হইতে এই নবজাত বঙ্গভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার যথারীতি আরব্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়,

বাঙ্গালার প্রাচীনতম গ্রন্থ

১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

কিন্তু উহার পূর্ববর্তী বাঙ্গালা-রচনা নিতান্ত বিরল। দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কতিপয় বঙ্গীয় সিদ্ধাচার্যের রচিত কতকগুলি সুপ্রাচীন বাঙ্গালা পদ (বা গীত) ম.এ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গীতগুলি অধুনা 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত। এই "চর্যাপদ-গুলিতেই অঙ্কুরোদ্গত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়াছে।"[১] শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা আবিষ্কৃত অপর তিনটি অপভ্রংশ-ভাষায়-রচিত দোহার পুঁথির সহিত এই চর্যাপদগুলি একত্রে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-ই বাঙ্গালা ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ।

"ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে, এমন এক ছত্র রচনাও আমাদের হস্তগত হয় নাই।"[২] এই দীর্ঘ দুইশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের উপর দিয়া পরস্বাপহরণকারী বৈদেশিক তুর্কীদের নির্মম অভিযান প্রবল ঝড়ের মত বহিয়া যায়, এবং উহার প্রচণ্ড সংঘাতে তৎকালীন বাঙ্গালার শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা সমস্তই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে "চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে যখন রাজা কংস বা গণেশ গৌড-সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন হইতে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটিল।"[৩] খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে গৌড়ের সিংহাসনে যে সকল নৃপতি একে একে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই প্রশ্রয় ও উৎসাহ লাভ করিয়া বাঙ্গালার কবিরা নবোদ্যমে বহু কাব্য-কবিতাদি রচনা করেন। এই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়া চলে, এবং ইহার ইতিহাসও এই সময় হইতেই যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়। এই হেতু, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের আরেকটি ভিন্ন যুগের সূচনা হয়, বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্ববর্তী যুগ—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাবধি কালকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের 'আদিযুগ'

আদি যুগ

১, ২, ৩ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

নামে অভিহিত করি। এই আদিযুগের অন্তর্গত শুধুমাত্র একখানি গ্রন্থ 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—বড়ু-চণ্ডীদাস। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি দাস প্রভৃতি পরবর্তীকালের বহু প্রসিদ্ধ কবি সশ্রদ্ধভাবে চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বড়ু-চণ্ডীদাসের রচিত একটি রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক সুবৃহৎ কাব্যের সুপ্রাচীন পুঁথি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক আবিষ্কৃত, এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। "বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রীষ্টীয় ১৪৫০ হইতে ১৫২০-র মধ্যে পুঁথিখানি অনুলিখিত হইয়াছিল;"[১] সুতরাং মূল গ্রন্থখানি স্বয়ং কবির দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে রচিত হইয়া থাকিবে। "সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১৪০০ সালের পূর্বেও তিনি জীবিত ছিলেন।"[২] প্রাচীনতার দিক দিয়া বিচার করিলে, 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র পরেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' স্থান। "বৌদ্ধ চর্যাপদগুলি ছাড়া অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষায় লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীনতম।"[৩] বড়ু-চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ছিলেন মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর [আনুমানিক ১৩৫০-১৪৫০ খ্রীঃ]। তিনি বাঙালী না হইলেও এবং তাঁহার রাধাকৃষ্ণ প্রেমাত্মক পদাবলী মৈথিল ভাষায় রচিত হইলেও, তাঁহার পদগুলি বাঙালা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বহু সুবিখ্যাত কবি তাঁহার অনুকরণ করিয়া সুমধুর বৈষ্ণবপদ রচনা করেন এবং 'পদকল্পতরু,' 'পদামৃতসমুদ্র' প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ-মধ্যে তাঁহার রচিত বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কারণে বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারি। "বড়ু-চণ্ডীদাসের কিছু পরে কৃত্তিবাস ওঝার উদ্ভব।"[৪] কৃত্তিবাস বাঙ্গালার সর্বজনপ্রসিদ্ধ কবি ও তাঁহার রচিত 'রামায়ণ' বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী। "ইঁহার জন্ম খ্রীষ্টীয় ১৩৯৯ সালে হইয়াছিল।"[৫]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গৌড়েশ্বর গণেশের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া কৃত্তিবাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'রামায়ণ' রচনা করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু

১, ২, ৩, ৫ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'।

৪, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ও জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ নাম লইয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেও, বাঙ্গালার কবিদিগকে তাঁহার পিতার মতই তিনি উৎসাহ দান করেন। বর্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবি মালাধর বসু গৌড়েশ্বর বারবক শাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন, ও তাঁহার পরবর্তী গৌড়েশ্বর সামসুদ্দীন ইউসুফের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মালাধর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন (১৪৮০ খ্রীঃ)। বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, যশোরাজ খান প্রভৃতি তৎকালীন বহু কবি তাঁহাদের কাব্যমধ্যে হোসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হোসেনের পুত্র নসরত শাহও বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতি ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হোসেনের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর একখানি 'মহাভারত' রচনা করেন। পরাগলের পুত্র ছুটি খানের ইচ্ছানুক্রমে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। এইরূপে গৌড়েশ্বরদিগের উৎসাহ ও প্রেরণার দ্বারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠে;—এই কারণে এই শতকটিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের 'গৌড়ীয় যুগ' নামে অভিহিত করা যায়। বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিদ্যাপতির 'পদাবলী', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'—এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা।

গৌড়ীয় যুগ

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের রাজত্বকালের শেষভাগে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৫—১৫৩৩ খ্রীঃ) ঘটে। তাঁহার দেবোপম চরিত্র ও দিব্য জীবনের প্রভাবে তৎকালীন বঙ্গসমাজে এক অপূর্ব মহতী প্রেরণা জাগিয়া উঠে;—বাঙ্গালার ধর্ম, কর্ম, কাব্য, কবিতা, চিন্তাধারা সমস্ত বিষয়েই একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁহার তিরোধানের পরেও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যবৃন্দের দ্বারা এই অভিনব ভাবধারা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষাবধি অবিরাম বহিয়া যায়। এই হেতু খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীদ্বয়কে আমরা বাঙ্গালা

চৈতন্য যুগ

সাহিত্যের 'চৈতন্য যুগ' নামে অভিহিত করিতে পারি। চৈতন্য যুগে সমগ্র বঙ্গদেশে সুশাসন, শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হওযায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়। এই কারণে ইহাকে প্রাচীন যুগের "স্বর্ণযুগ" বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলা যাইতে পারে। স্বয়ং জগদীশ্বরকে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে মানবরূপে প্রত্যক্ষ করিযা বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার, ত্রিলোচন প্রভৃতি সে যুগের বহু ভাবুক কবি তাঁহার অনুপম মহিমা লইযা অনেকগুলি সুমধুর 'গৌরপদ' রচনা করেন। তাঁহার দেবসুলভ চরিত্র-মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইযা বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জযানন্দ মিশ্র প্রভৃতি সাধুচরিত্র কবিবৃন্দ ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাঁহার অমৃতময জীবনচরিত বিশাল কাব্যাকারে অঙ্কন করেন; এবং তাঁহার প্রচারিত অপূর্ব প্রেমধর্ম আশ্রয করিয়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিগণ ঈশ্বর-প্রেম-মূলক অপার কবিত্বময রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। হিন্দুধর্মানুযায়ী সংসার-জীবন-যাপনের আদর্শ স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশে অনেক সদাশয কবি বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত ও ভাগবত-পুরাণাদি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। এইগুলির মধ্যে মহাকবি কাশীরাম দাস-বিরচিত 'মহাভারত' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহা বঙ্গভাষার বৃহত্তম মহাকাব্য। পূর্ব যুগের লৌকিক কাহিনী, দেব-দেবী-মহিমা, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া এ যুগেও অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য রচিত হয। ইহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান' ও মানিকরাম গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গল' সমধিক প্রসিদ্ধ।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার কাব্যধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই সময়ে মুরসিদকুলি খাঁ, সরফরাজ খাঁ, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি অক্ষম নবাবদের শিথিল শাসনাধীনে বঙ্গদেশের প্রায় সবত্র ঘোর অশান্তি ও অরাজকতা বাড়িতে থাকে। এই হেতু একালে বাঙ্গালা-সাহিত্যের আশানুরূপ অনুশীলন হইতে পারে নাই। কেবলমাত্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কতিপয় বঙ্গীয় কবি কয়েকখানি কাব্য ও কতকগুলি গীত রচনা করেন। এই কারণে এই অষ্টাদশ শতাব্দীকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' নামে অভিহিত করিতে পারি। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে বড় একটা উচ্চস্তরের সাহিত্য

রচিত হয় নাই। চৈতন্যযুগের নির্মল ভগবদ্ভক্তির পরিবর্তে অশ্লীল আদিরস লইয়া কতকগুলি 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্য এই যুগে রচিত হয়। সত্যনারায়ণ, ষষ্ঠী দেবী, ধর্মদেবতা, সূর্যদেব প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী লইয়া অনেকগুলি মঙ্গল-কাব্য এযুগে রচিত হইলেও, চৈতন্যযুগের মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ইহারা অতীব নিকৃষ্ট। যোগীশ্বর মহাদেবকে শস্যশ্যামলা বঙ্গপল্লীর দীনদরিদ্র কৃষকরূপে অঙ্কিত করিয়া একাধিক 'শিবমঙ্গল' একালে রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য-রচিত 'শিবায়ন' কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে মাত্র তিনজন বড় কবি আবির্ভূত হন ;—'ধর্মমঙ্গল'-রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী, 'অন্নদামঙ্গল'-প্রণেতা রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্র ও সাধককবি রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের রচিত 'শ্যামাসঙ্গীত'গুলি বঙ্গভাষার অমূল্য রত্ন ; এগুলি এখনও বহু সুগায়কের কণ্ঠে সুমধুর সুরে গীত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে 'নাথ-সম্প্রদায়' নামে একদল শৈব সাধকের আবির্ভাব হয়। এই নাথ-সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ছিলেন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপা। এই চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্যসূচক কতিপয় অলৌকিক কাহিনী সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা পদ্যে রচিত হয়। এইগুলি সাধারণতঃ 'নাথ-সাহিত্য' নামে পরিচিত। এই নাথ-সাহিত্যের অন্তর্গত 'গোরক্ষবিজয়', 'ময়নামতীর গান' ও 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামক তিনখানি কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ববঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে অনেকগুলি কাহিনীমূলক পল্লী-গীতিকা সংগ্রহ করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় এইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। এই গীতিকাগুলি কোন্ সময়ে রচিত হয় তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে, কোন কোন গীতিকায় তৎকালীন বঙ্গপল্লীর যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালের মধ্যে এই পল্লী-গীতিকাগুলি রচিত হইয়া থাকিবে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্মরণীয় পলাশী রণাঙ্গনে বাঙ্গালার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন হয়। তৎপরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকাসেমের

পরাজয় ঘটিলে, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামক ভারতাগত এক ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করে। কালক্রমে এতদ্দেশে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা দ্রুতবেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইংরাজী-সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া মৃতপ্রায় বাঙ্গালা সাহিত্য সহসা নূতন প্রাণ, নবীন ভাব ও অভিনব রূপ লইয়া জাগিয়া উঠে।

নবীন যুগ

এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা নূতন যুগের সূচনা হয়। এই নবযুগের নবীন লেখকরা পাশ্চাত্ত্যদেশের হোমার, মিল্টন, সেক্স্পীয়র, স্কট, বায়রন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিবৃন্দের অনুসরণ করিয়া নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য অচিরে প্রতীচ্যভাবের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু এই নবীন সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রচুর প্রভাব থাকিলেও, বাঙালীর জাতীয়ভাবই উহাতে প্রাধান্য লাভ করে। যাহা হউক, স্বদেশীয় ও ইউরোপীয় এই উভয়বিধ ভাবধারা ইংরাজ-আমলের কবি-হৃদয়ে সংমিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব বঙ্গভারতীর উদ্ভব হয়। এই নবীন সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে প্রধানতঃ মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থরাজীর দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য আশাতীত ঐশ্বর্যশালী হইয়া নিখিল বিশ্বসাহিত্য-সভায় গৌরবময় আসন অধিকার করে।

সারাংশ—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানতঃ দুই যুগে বিভক্ত—

(১) প্রাচীন যুগ—খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী।
(২) নবীন যুগ—খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি।

প্রাচীন যুগ নিম্নলিখিত চারি যুগে বিভক্ত—

(১) আদি যুগ—খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দী।
(২) গৌড়ীয় যুগ—খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী।
(৩) চৈতন্য যুগ—খ্রীষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী।
(৪) কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ—খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদি যুগ

[খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী—১৪শ শতাব্দী]

[১] ভূমিকা

প্রাচীন বাংলা কাব্যাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রধানতঃ ধর্মভাবকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটে। দেশের মধ্যে যখন যে-ধর্ম প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, তখন সেই ধর্মের সারতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া সেই যুগের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন যুগে বিবিধ ধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য কালক্রমে বিচিত্র রূপ প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে যখন মাগধী-প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ হইতে অভিনব বঙ্গভাষার উদ্ভব হয়, তখন বাঙ্গালাদেশের বহুস্থানে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপূর্বে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতকে ত্রিপুরা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তথাকার রাজবংশের পোষকতা লাভ করে, সপ্তম শতকে সমতটের খড়্গ বংশীয় রাজারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন, এবং অষ্টম শতক হইতে বঙ্গের পালবংশীয় নৃপতিরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। এই সুপ্রসিদ্ধ পালবংশের পাঁচশত বর্ষকাল-ব্যাপী রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্মের সাতিশয় বিস্তার ও সমধিক উন্নতি ঘটে। অতএব এই বৌদ্ধ-ধর্মের সুগভীর ভাব লইয়া তৎকালীন নবজাত বাঙ্গালা ভাষায় বহু কাব্য-কবিতাদি রচিত হয়,—এইরূপ সুনিশ্চিত অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু একমাত্র 'চর্যাপদ' ব্যতীত, এই যুগের আর কোন বাঙ্গালা-রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

পালবংশের পরে এতদ্দেশে সেনবংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে ও বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেনবংশের রাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাঁহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ

তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়েই বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিমুখ হইলে, বাঙ্গালার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদিযুগের বাঙ্গালা-গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। যাহা হউক, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে গমন করিয়া ও তথাকার রাজদরবারের গ্রন্থাগার অনুসন্ধান করিয়া এই আদিযুগের রচিত একখানি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এই প্রাচীনতম গ্রন্থখানাই 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কতকগুলি গীত বা ক্ষুদ্র কবিতা এবং অপর তিন প্রকার অপভ্রংশ ভাষায় রচিত অনেকগুলি গীত আছে। ইহার অন্তর্গত এই বাঙ্গালা গীত-সমষ্টি 'চর্যাপদ' নামে পরিচিত।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পূর্বে আদিম বাঙ্গালী-জাতি তাহার নিজের ধ্যান-ধারণানুসারে একটা নিজস্ব ধর্ম ও জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলে। প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার বাঙ্গালাদেশের জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সর্বত্র সে তখন কত দেবদেবীর অধিষ্ঠান দেখিয়াছে এবং ভক্তিভরে তাঁহাদের সকলেরই শরণাপন্ন হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালার প্রাচীন ধর্মে একাধিক দেবতার উৎপত্তি ও দেবতার উপরে মানুষের একান্ত নির্ভরশীলতা সেই ধর্ম-সাধনের ভিত্তিভূমি হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে শিব, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের পূজার্চনা সুদূর প্রাচীনকালেই বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়। ইঁহাদিগকেই বাঙ্গালার "লৌকিক দেবদেবী" বলে। এই লৌকিক দেবদেবীর মহিমা লইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আদি যুগে রচিত, এমন একখানিও লৌকিক-দেবতা-বিষয়ক কাব্য বা কবিতা এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

সেনবংশের সর্বশেষ নৃপতি লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯—১২০৬ খ্রীঃ) রাজ-সভায় উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধন প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ কবি বিরাজমান ছিলেন। জয়দেব সহজ সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' নামক রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক এক অমর কাব্য রচনা করেন। উমাপতি নাকি বাঙ্গালাভাষায় রাধাকৃষ্ণ-পদ লেখেন। জয়দেবের অনুকরণ করিয়া কোন

কোন বঙ্গীয় কবি প্রায় সেই সময়েই হয়ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া পদাবলী রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সেগুলি অতীতকালের গর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কোনরূপ নিদর্শন এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও, গৌড়ীয় ও চৈতন্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত কোন প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের হস্তগত না হইলেও, পরবর্তীকালের সাহিত্য বিচার করিয়া, ইহা নিঃসন্দেহ অনুমান করা যায় যে, "এই সময়ে মনসার কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি লৌকিক এবং রামায়ণ-কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক ছড়া বা পাঁচালী বাদ্য ও নৃত্যের সহিত গীত ও অভিনীত হইত।"[১]

[২] বৌদ্ধ গান ও দোহা—'চর্যাপদ'

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে সর্বসমেত চারিখানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুধুমাত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক প্রথম পুঁথিখানি বাঙ্গালা ভাষায়, অপর তিনখানি বিভিন্ন অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়কে সংক্ষেপে 'চর্যাপদ' বলে। চর্যাপদে মোট সাতচল্লিশটি পদ আছে। এগুলি লুইপাদ, কাহ্নুপাদ, ভুসুকুপাদ, শান্তিপাদ, সরহপাদ, চাটিলপাদ প্রভৃতি ২৬ জন কবির দ্বারা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্নকালে রচিত। ইঁহাদের মধ্যে কাহ্নুপাদের রচিত পদসংখ্যা সর্বাধিক। এই পদগুলির মূল কথা হইতেছে,—সংসার মিথ্যা, পৃথিবীর মোহ ত্যাগ কর ও ভবসাগর উত্তীর্ণ হও।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই চর্যাপদগুলি "হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায়" রচিত। আধুনিক বঙ্গভাষার তুলনায় এই ভাষা এত প্রাচীন যে, ইহাকে বাঙ্গালাভাষা বলিয়া সহজে চিনিতে পারা যায় না। সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুগভীর গবেষণার দ্বারা ইহাকে প্রাচীনতম বাঙ্গালাভাষা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। ইহার বিস্মৃতপ্রায় শব্দরাশি ভেদ করিয়া সঠিক অর্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই কারণে শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "সন্ধ্যাভাষা" নামে অভিহিত

১ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

করেন। "সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" ইহার উপরে, পদগুলি হেঁয়ালীর ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ ধরা গেলেও, ভিতবের আধ্যাত্মিক অর্থ বোঝা খুবই কঠিন। এক একটি পদে অতি-অল্প কথায এত বেশী দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে যে, উহার মর্মার্থ গ্রহণ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। এই পদগুলিতে প্রধানতঃ মহাযোগী বৌদ্ধাচার্যদেব কঠোর সাধন-লব্ধ জ্ঞানের কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদেব সেই ধর্ম-সাধনাব অনেক রহস্যই আমাদের নিকট অজ্ঞাত বলিযা, কোন চর্যাপদেরই বিশদ ব্যাখ্যা করা যায় না। তথাপি উহাদের যতটুকু স্থূল অর্থ বুঝিতে পারা যায, তাহাতেই এই পদগুলির বিশিষ্ট মাধুর্যের যথেষ্ট পবিচয পাওয়া যায়। সাধক-কবি রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতের মত এই প্রাচীনতম গীতগুলিও বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের হৃদয়কন্দব হইতে স্বতঃই নির্গত হইয়াছে। প্রসাদী গীতেব ন্যায় চর্যাপদও রাগ-রাগিনী-সহযোগে গীত হইত;—প্রত্যেক চর্যাপদেব শিরোভাগে রাগরাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। নিম্নে একটি চর্যাপদ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।—

ভব নই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥
ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ।
আদঅ দিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দূর ম জাহী॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী॥

অর্থ—ভবনদী গভীর ও তীব্র বেগে প্রবাহিত। ইহার উভয় তট পিচ্ছিল ও মধ্যস্থলে থই পাওয়া যায় না। ধর্মার্থে চাটিল তদুপরি সেতু গঠন করিলেন। পারগামী লোকেরা নির্ভয়ে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতেছে। মোহতরু ফাড়িয়া উহার পাটা (তক্তা) সংযুক্ত করিয়া অদ্বৈতের কুঠারের আঘাতে উহাকে দৃঢ়

করা হইয়াছে। এই সেতুতে চড়িয়া দক্ষিণে বা বামে হেলিও না, বোধি (পরম জ্ঞান) নিকটেই রহিয়াছে, দূরে যাইতে হইবে না। হে মানব, যদি তুমি পারগামী হইতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে অনুত্তর স্বামী চাটিলের শরণ লও।

বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর বৌদ্ধধর্মের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে এবং কালক্রমে উহা বিকৃত হইয়া 'সহজধর্মে' রূপান্তরিত হয়। চর্যাপদগুলিতে এই সহজ ধর্মের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা জীবন্ত গুরুদেবের সদুপদেশ ধর্মসাধনের পক্ষে সমধিক ফলপ্রদ ও উহাই সহজ পন্থা। এই সহজ ধর্মের কথা গুরুর মুখে শুনিতে হয়। এই নিমিত্ত এই পদগুলিতে গুরুর উপরে ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়।

চর্যাপদগুলি প্রধানতঃ সহজিযা-ধর্মের গান হইলেও, বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায় ও নাথ-সম্প্রদায় এবং বৈদান্তিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্মমত কোন কোন পদে দৃষ্ট হয়। হিন্দুদর্শন ও বৈদিক ধর্ম ভারতবর্ষের প্রায় সকল ধর্মের মূলেই নিহিত আছে। মহামতি বুদ্ধদেব বেদ-শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে না করিলেও, বৌদ্ধের নির্বাণে ও হিন্দুর মোক্ষ-লাভে বিশেষ পার্থক্য নাই। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা উভয় ধর্মের লক্ষ্য। আর্য ঋষিরা আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনে করেন, এবং তন্নিমিত্ত বাসনা ক্ষয় করিতে সদুপদেশ দেন। বুদ্ধদেবও নির্বাণ-লাভের নিমিত্ত বাসনার নিবৃত্তি করিতে বলেন। "নির্বাণ অর্থে বাসনার নিবৃত্তি"[১]। বাসনা হইতে অহংভাবের উৎপত্তি হয়, এবং অহঙ্কারবশতঃ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মানুষকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব, বাসনা-ক্ষয়ের দ্বারা অহংকে, ও অহং-নাশের দ্বারা অবিদ্যাকে বিনষ্ট করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে হয়। "নির্বাণ প্রকৃত পক্ষে অহংভাবের বিলোপ সাধন।......নির্বাণ-লাভে মহাসুখে নিমজ্জিত হওয়াই সহজ-সাধনার চরম লক্ষ্য।"[২] সহজিযারা এই নির্বাণকে শাশ্বত সুখময় জীবন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং ইহাকে রূপ দান করিয়া, নৈরাত্মা দেবী, অবধূতিকা, ডোম্বী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া, ইহার বাসস্থান পর্যন্ত

চর্যাপদের ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিকতা

১, ২ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'।

নির্দেশ করিয়াছেন। এই সদানন্দময়ী নৈরাত্মাদেবীকে পাইতে হইলে চিত্ত-দমন, মনোনাশ ও অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে হইবে। নিম্নোদ্ধৃত চর্যাপদটিতে এই মনোরূপ তরুকে ছেদন করিবার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।—

মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা-বহল পাত ফলবাহা॥
বর গুরুবঅণ-কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ॥
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমানী॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই।
সড়ি পড়িআ রে মূঢ় তা ভব মানই॥
সুণ তরুবব গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥

"মর্মার্থ—এখানে মনকে তরুর সহিত তুলনা করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়কে তাহার শাখা এবং বাসনাসমূহকে তাহার পাতা ও ফল বলা হইয়াছে। বজ্রগুরুর বচনরূপ কুঠার দ্বারা মন-তরুকে এমনভাবে ছেদন করিতে বলা হইয়াছে যেন ইহা পুনরায় উৎপন্ন না হইতে পারে। সেই চিত্ততরু শুভাশুভরূপ জল গ্রহণ করিয়া মনোরূপ সংসারভূমিতে বর্ধিত হয়। যে সকল বাল-যোগী চিত্তবৃক্ষের ছেদন অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকরণ জানে না, তাহারা সংসার-দুঃখসাগরে পতিত হয়, ভবকেই গ্রহণ করে, মোক্ষমার্গে গমন করে না। অতএব অবিদ্যারূপ শূন্য তরুকে গগন বা প্রভাস্বর কুঠার দ্বারা ছেদন কর। কিরূপে? কেবল তাহার ডাল নহে, মূলও, যেন পুনরায় ইহা আর উৎপন্ন না হইতে পারে।"[১]

হিন্দু-দর্শনানুসারে পরমাত্মা ও মহামায়ার সহযোগে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হইয়াছে। পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু মায়া-সংযোগে উহা জীবাত্মায় পর্যবসিত হইয়া অসৎ, দুঃখময় ও ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে। অতএব, এই মায়া বা "অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে পারিলেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে; ইহাই মোক্ষ।"[২] আমরা মায়ার ঘোরে ভ্রান্তিবশতঃ এই জাগতিক দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখিয়া

১, ২ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'।

ভীত, দুঃখিত ও শোকার্ত হইতেছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্তই এক ব্রহ্মের বিকাশ, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আমাদের যাবতীয় দুঃখের অবসান হইবে। নিম্নোদ্ধৃত চর্যাপদে এই জগদ্‌ভ্রান্তির কথা আলোচিত হইয়াছে।—

আইএ অনুঅনাএ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি চমকিই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না।
অইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুটই বাষণা তোরা ॥
মরুমরীচি গন্ধর্বনঅরী দাপন পড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইয়া অপে পাথর জইসা ॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা ॥
রাউতু ভনই কট ভুসুক ভনই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্‌ছসি ভান্তী পুচ্‌ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥

ভাবানুবাদ—

"অজাত জগতে ভ্রান্তির বশে
জগতের জ্ঞান হয়।
রজ্জুসর্প দেখি যে বা চমকায়
সত্য কি সে সাপে খায় ॥
হে অদ্ভুত যোগি, হাত নাহি কর লোনা।
এইরূপ ভাবে বুঝিলে জগৎ
তুটিবে তোর বাসনা ॥
যেন মরীচিকা গন্ধর্ব-নগরী
দরপণে প্রতিভাস।
বাতাবর্তে আর সুদৃঢ় হইয়া
জলে পাষাণাভাস ॥
বন্ধ্যানারীসুত যেন কেলি করে
বহুবিধ খেলা খেলে।

বালুতেলে আর শশশৃঙ্গে তার
তুলনা আকাশ ফুলে ॥
ভুসুকু রাউত ভনে অদ্ভুত
সকল স্বভাব এই।
গুরুকে পুছিও যদি মূঢ় হও
ভ্রান্তির বশ হই।"[১]

সারমর্ম—যাঁহারা পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই জগতের আদৌ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যাহারা মোহান্ধ, তাহাদের ভ্রান্তনয়নে ইহজগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই মোহ—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। প্রকৃত পক্ষে এই সংসার—মরু-মরীচিকা, গন্ধর্ব-নগরী ও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় অসার। জগতের দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র; যেমন, বায়ুর দ্বারা স্তম্ভিত জলরাশিকে পাষাণ বলিয়া অনুমান হয়। এই সংসার-জলে তোমার হাত লোনা করিও না। বন্ধ্যা নারীর পুত্র, বালুর তৈল, শশকের শৃঙ্গ, আকাশের কুসুম প্রভৃতি অলীক কল্পনার ন্যায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বস্তুতঃ অস্তিত্ব-বিহীন, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের মতে "মনঃকল্পিত জগৎ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা॥"

অবিদ্যার বশে আমাদের চিত্তে জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণা জন্মে এবং পরিণামে জগতের বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তের চঞ্চলতা ও বিভ্রান্তির উদয় হয়। কাজেই চঞ্চল চিত্তকে সংযত করা বিধেয়। কতিপয় চর্যাপদে চিত্ত, চিত্তজ বাসনা ও বাসনার দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের সংস্কার বিহিত হইয়াছে। যথা—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ-দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥

১, শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'।

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করনক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস॥
ভনই লুই আমৃহে ঝানে দিঠা।
ধমন চমন বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

ভাবানুবাদ—

"কাযারূপ তরুবব, পাঁচ তাব ডাল।
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল॥
দৃঢ় কবি মহাসুখ কব পবিমাণ।
লুই ভনে—গুরুকে পুছিয়া ইহা জান॥
সকল সমাধি দ্বাবা কিবা কবা যায।
সুখদুখে নিশ্চিত মবিবেই হায॥
ছন্দেব বন্ধন এড কবনেব (পাবিপাট্য) আশ।
শূন্যতা-পক্ষেব দিকে লহ তুমি পাশ॥
লুই বলে—ইহা আমি ধ্যানে দেখিযাছি।
ধমন চমন দুই পীঁড়িতে বসেছি।"[১]

চিত্ত-চাঞ্চল্যহেতু দেহমধ্যে কাল প্রবেশ করে। চিত্ত-চাঞ্চল্যই অধঃপতনের প্রধান কাবণ। এই সংসাব অসাব, একেবাবে শূন্য—এইরূপ বৈবাগ্য চিত্তে না জন্মিলে, সাধন-ভজনেব দ্বাবা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয না। সাধক যখন স্বীয চিত্ত পবিশুদ্ধ কবিযা বাসনা-কামনাব ঊর্ধ্বে উন্নীত হন, তখন তিনি মহাসুখময় পবমাত্মায় বিলীন হইযা ভূমানন্দ উপভোগ কবেন। এই অনাবিল পবমানন্দকেই চর্যাপদে "ডোম্বী" বলা হইযাছে। ডোম্বীব সাহচর্যে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেব প্রভাবে সাধক যাবতীয় জাগতিক দুঃখেব বাহিবে যাইতে সক্ষম হন।—

তিনি ভুঅন মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ॥
কইসনি হালো ডোম্বী তোহাবি ভাভবিআলী।
অন্তে কুলিনজন মাঝে কাবালী॥

১ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'।

ভাবানুবাদ—

"এ তিন ভুবন আমি বাহি অবহেলে।
প্রসুপ্ত রয়েছি এবে মহাসুখ-লীলে॥
কি অদ্ভুত হালো ডোম্বী, তব চতুরালী।
বাহিরে কুলীনজন, মধ্যেতে কাপালী॥"[১]

আত্মজ্ঞানী সাধু জন্মমৃত্যু-আদি যাবতীয় ভীতি হইতে অব্যাহতি লাভ করে। আত্মশক্তি বা ডোম্বীর এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা! উপনিষদে উক্ত আছে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিযাছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না। উদ্ধৃত পদটিতে যে মহাসুখের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিহারের অনুরূপ।

আত্মমুক্তি স্বীয় চেষ্টার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তত্ত্ববিচার করিতে পারিলে নির্বাণ লাভ করা যায়;—তখন বাহ্য জগতে ও অন্তরাত্মায় কোনই পার্থক্য থাকে না। একমাত্র পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এইরূপ অমরত্ব-প্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। প্রকৃতপক্ষে জীবনে ও মরণে কোনই পার্থক্য নাই; কারণ, জীবনে যে-প্রাণের অভিব্যক্তি, মৃত্যুতে তাহাই মহাপ্রাণে মিশিয়া সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়, কিছুই লোপ পায় না। মানুষ নিজের মন দিয়াই বিভিন্ন জগৎ রচনা করে এবং নিজেরই মোহবশতঃ মিথ্যাজগতের সহিত স্নেহমমতাদি নানা বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে। এইরূপ মর্মের একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

অপনে রচি রচি ভবনির্বানা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ণ জানহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো॥

ভাবানুবাদ—

"নিজ মনে রচি রচি ভব ও নির্ব্বাণে।
বৃথা লোক আপনাকে জড়ায় বন্ধনে॥

[১] শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'।

আমরা অচিন্ত যোগী, মনে নাহি লয়।
জনম-মরণ-ভব কিরূপে বা হয়॥
জনম যেমন হয় মরণও তাই।
জনমে মরণে কোন বিভিন্নতা নাই॥"[১]

কেবলমাত্র শাস্ত্র পড়িয়া বা পূজার্চনা করিয়া পবনতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। উহা নিজের অনুভূতিসাপেক্ষ। তবে, গুরুর সদুপদেশ ঐরূপ অনুভূতি-জাগরণের পক্ষে অনেকটা সহায়। এই নিমিত্ত চর্যাপদগুলিতে বার বার গুরুর শরণ লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় চেষ্টা বা সাধনা ব্যতীত কেবলমাত্র গুরুর উপদেশেই আত্মজ্ঞান অনুভূত হয় না, বরং 'বাকপথাতীত এই আনন্দের উদ্রেক করিতে গুরু বোবা এবং শিষ্য কালা' অর্থাৎ অন্তর্জগতের এই অনুভূতি তোমাকে নিজের চেষ্টায় লাভ করিতে হইবে। এইভাবে চর্যাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তারও একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে।"[২]

জো মনগোঅর আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কাআবাকচিঅ জসু ণ সমাঅ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কহিব কীস॥
জে তঁই বোলী তে তবি টাল॥
গুরু বোব সে সীসা কাল॥
ভণই কাহ্নু জিন-রঅণ বি কইসা।
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ভাবানুবাদ—

"মনের গোচর যাহা আলজাল হয়।
আগম পুস্তক ইষ্টমালা সমুদয়॥
সহজজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায় কিসে।
কায়বাকচিত্ত যার মধ্যে না প্রবেশে॥

১, ২ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'।

বৃথা গুরু উপদেশ দেয় শিষ্যসবে।
বাক্যের অতীত যাহা কিরূপে কহিবে॥
যে তাহা বলিতে চায় সকলি অসত্য।
গুরু বোবা শিষ্য কালা এই সার তত্ত্ব॥
কাহ্ন বলে জিনরত্ন সিকশিত হয়।
বধির সঙ্কেতে যেন বোবাকে বুঝায়॥"২

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড়ীয় যুগ

[খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী]

[১] ভূমিকা

গৌড়ীয় যুগ বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের এক নবজাগরণের যুগ। ইহার পূর্ববর্তী প্রায় দুই শতাব্দী কাল বাঙ্গালীর ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। সেই নিবিড় অন্ধকার তুর্কী-পাঠান প্রভৃতি বৈদেশিক দস্যুদের শাণিত কৃপাণের দ্বারা ঝলকিত ও পরাধীন বাঙ্গালীর সকাতর আর্তনাদে মুখরিত। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষকালে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী অতর্কিতে বাঙ্গালার আধিপত্য গ্রহণ করেন। তদবধি শেরাণ, আলীমর্দ্দান, নাসির-উদ্দীন প্রভৃতি বাঙ্গালার পাঠান সুলতানেরা রাজত্বের নামে বাঙ্গালীর উপরে সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরকাল নিষ্ঠুর নির্যাতন করেন ও সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি হয়। উহার পরিণামে বাঙ্গালার শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে বাঙ্গালার সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন আজম্‌ শাহের রাজত্বের (১৩৮৯—৯৬ খ্রীঃ) শেষভাগে ভাতুরিয়া পরগণার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুলতান শমস্‌উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার পর বাঙ্গালার স্বাধীনতা

পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা গণেশের সুশাসনে দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসে, সভ্যতা পুনরায় বাড়িতে থাকে এবং শিল্প ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতি দেখা দেয়। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা এবং উভয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা এই সময় হইতে পূর্ণোদ্যমে সুরু হয়। স্বদেশীয় সংস্কৃতির উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষার কাব্য-পুরাণাদি কোন কোন বঙ্গীয় কবি বাঙ্গালা-পদ্যে অনুবাদ করেন। লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক কাহিনীগুলিকে পৌরাণিক আকার দান করিতে অনেক কবি সচেষ্ট হন। তুর্কী-পাঠান প্রভৃতি বিদেশীয় মুসলমানদের অনেকে দীর্ঘকাল বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া বঙ্গভাষী ও বাঙ্গালী হইয়া পড়ে। তাই, রাজা গণেশের পরে হোসেন শাহ, নসরত শাহ প্রভৃতি মুসলমানেরা বাঙ্গালার অধিপতি হইলেও, তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর করেন। প্রধানতঃ গৌড়েশ্বরদিগের উৎসাহেই এই যুগের সাহিত্য গড়িয়া উঠে। "সুতরাং মধ্যযুগের (১৫০০—১৮০০ খ্রী:) বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি এবং বিকাশের উৎস গৌড় এবং তত্রত্য রাজদরবারে খুঁজিতে হইবে।"[১]

গৌড়ীয় যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন ও প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার পুনরভ্যুদয়ের ফলে, একদিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা পদ্যে রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশের প্রাচীন ধর্ম, পারিবারিক আদর্শ ও লৌকিক কাহিনী আশ্রয় করিয়া মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সুললিত পদাবলী রচিত হয়। এই সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মধ্যে বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও বিজয়গুপ্তের 'মনসা-মঙ্গল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্তের সমকালে বিপ্রদাস পিপিলাই একটি মনসামঙ্গল রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তীযুগেও এই জাতীয় মঙ্গলকাব্য, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের পদাবলী ও রামায়ণ-মহাভারতাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বহু কবির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে রচিত হয়।

গতানুগতিকতা

এইরূপ গতানুগতিকতা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক চণ্ডী বা মনসাদেবীকে লইয়াই বিভিন্ন যুগে একই

১ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

কালকেতু বা চাঁদসদাগরের কাহিনী বিভিন্ন কবি রচনা করেন। তবে, পরবর্তী কবিরা তাঁহাদের পূর্বগামী কবিদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাব্য লিখিতে সক্ষম হন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর হরিদত্ত অপেক্ষা পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়-গুপ্তের এবং বিজয়গুপ্ত অপেক্ষা ষোড়শ শতাব্দীর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল অধিকতর সমুন্নত হইয়া উঠে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতির মহাভারত অপেক্ষা সপ্তদশ শতাব্দীর কাশীরাম দাসের মহাভারত অনেক উৎকৃষ্ট। মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল তাঁহার পরবর্তী মুকুন্দরামের হাতে অধিকতর মনোহর হইয়া উঠে। বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা তাঁহার পরবর্তী দীন চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী সমধিক সমুন্নত। ষোড়শ শতকের কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল অপেক্ষা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ গতানুগতিকতার দ্বারা বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যগুলি উত্তরোত্তর বিকশিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহাদের বিষয়বস্তু চিরদিন সঙ্কীর্ণই রহিয়া যায়। আবার, সবক্ষেত্রেই যে ক্রমোন্নতি দেখা দেয়, তাহা নহে। বাঙ্গালা-রামায়ণের আদি-কবি কৃত্তিবাস ওঝার পরে কবিচন্দ্র, রঘুনন্দন প্রভৃতি আরো বহু কবি রামায়ণ রচনা করেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের মত কৃতিত্ব আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

যেকালে কাশী, দক্ষিণ-বিহার ও বঙ্গদেশ তুর্কীদের অধীনতায় জর্জরিত, সেকালে স্বাধীন হিন্দুরাজার আশ্রয়ে মিথিলা-প্রদেশ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। তখন বাঙ্গালার ছাত্রেরা ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়িবার জন্য মিথিলায় যাইত। তথায় মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী পড়িয়া তাহারা বিমুগ্ধ হয় এবং তাহাদের দ্বারা ঐ পদগুলি অচিরে বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। "কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির মৈথিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটি ভাঙ্গিয়া কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়া গেল, কোথাও নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া বসিল, আবার কোথাও বা পশ্চিমের (মথুরা অঞ্চলের) হিন্দীরও রূপ ইহাতে দুই এক জায়গায় আসিয়া গেল। এইরূপে বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী বাঙ্গালাদেশে এক নূতন মিশ্ররূপ ধরিয়া বসিল, তাহা না মৈথিলী না বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিমা হিন্দীর এবং পশ্চিমা অপভ্রংশেরও ছিটাফোঁটা আছে; কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে এবং লালিত্যে ও শ্রুতিমাধুর্য্যে এই মিশ্র ভাষা অনুপম

হইয়া দাঁড়াইল। পরে এই ভাষার নামকরণ হইল 'ব্রজবুলি'—অর্থাৎ যে বুলি বা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা গীত হয়।"[১]

এই কৃত্রিম ভাষায় বহু বৈষ্ণব কবি মনোহর পদ রচনা করিয়া যশস্বী হন। নবীন যুগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ব্রজবুলিতে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' লেখেন। একটা কৃত্রিম ভাষা যে এত দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিয়া একটা বিরাট কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, ইহা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়!

গৌড়ীয় যুগের অন্তর্গত বাঙ্গালা-সাহিত্যকে প্রধানতঃ তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়—

(১) রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাত্মক পদাবলী—বৈষ্ণব-সাহিত্য,

(২) রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—অনুবাদ-সাহিত্য,

(৩) লৌকিক দেবদেবীর মহিমাসূচক কাব্য—মঙ্গল-সাহিত্য।

এই বিভাগগুলি অনুসারে এই যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

[২] বৈষ্ণব সাহিত্য

বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুদেবতার আরাধনাকে বৈষ্ণবধর্ম বলে। এই বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন করেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যে কোন্ সুদূর অতীতকালে আবির্ভূত হন, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না; ঐতিহাসিকদের কৃপায় সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহারও পূর্বে তিনি বর্তমান ছিলেন। মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে তাঁহার জীবন-কথা বর্ণিত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার ধর্মমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাগবতাদি পুরাণে তিনি বিষ্ণুর অবতার-রূপে কীর্তিত হইয়াছেন। এইরূপে মর্ত্যলোকের কৃষ্ণ স্বর্গলোকের বৈকুণ্ঠবিহারী পরমেশ্বরে রূপান্তরিত হন এবং কালক্রমে তাঁহার পূজার্চনা প্রবর্তিত হয়। তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া, তাঁহার উপাসনাও বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তখন বৈষ্ণব কবিরা তাঁহার গুণকীর্তন করিয়া গীত, কাব্য, শাস্ত্র প্রভৃতি রচনা

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'।

করেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এই সমুদয় গ্রন্থের সমষ্টিকে 'বৈষ্ণব সাহিত্য' বলে। এই বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব বাঙ্গালাদেশে অতি প্রাচীনকালে ঘটে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা সমগ্র বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন বহিয়া যায়। তখন তাঁহার জীবন-কথা লইয়া বহু কাব্য-কবিতাদি রচিত হয় এবং অচিরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এই কারণে, চৈতন্যবিষয়ক গ্রন্থরাজিও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। চৈতন্যদেবের পরমভক্ত অদ্বৈত, নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদেব নির্মল চরিত্র আশ্রয় করিয়াও কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। ইহারাও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত। বৈষ্ণবধর্মের ব্যাখ্যা ও উহার সাধন-ভজন বিষয়ে যে সমুদয় গ্রন্থ রচিত হয়, সেগুলিও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-বিষয়ক পদগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ ;—ইহারা সুগভীর কবিত্ব ও সর্বোত্তম মহদ্ভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ।

পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে বাঙ্গালীর কল্পিত এক রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বাঙ্গালার জনসাধারণে প্রচলিত ছিল বলিয়া নানাকারণে অনুমান হয়। উহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সাধারণ নর-নারীর প্রেম-কাহিনী-রূপেই সম্ভবতঃ কীর্তিত হইয়া থাকিবে। উহাকে বাঙ্গালার লৌকিক-রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী বলে। আধুনিককালের একটি কবিতায় পাওয়া যায়—"কিশোর যারা, প্রাণের টানে, চাইবে তারা কিশোরী।" এই কিশোর-কিশোরীর পরস্পর অনুরাগের কথা সেই লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর মুখ্য বিষয় ছিল। একটি রূপসী কিশোরীকে দেখিলে, একজ নবীন যুবকের মনে সেই কিশোরীর সহিত মিলিত হইবার জন্য একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে, সেই কিশোরীর রূপলাবণ্যের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার অন্তর কত আকুল হইয়া পড়ে, সেই মনোলোভা সুন্দরীর মিলন-লাভের জন্য সে তখন কত ছল খুঁজিয়া ফেরে এবং অবশেষে সেই হৃদয়-বাঞ্ছিতা রমণীকে পাইয়া তাহার প্রাণে অপার আনন্দ জাগে,—সেইসব মধুর কথাই রাধাকৃষ্ণের নামের অন্তরালে সেই লৌকিক কাহিনীতে গীত হইত। সেই কাহিনীর একটা গীতাভিনয়-রূপ এককালে "কৃষ্ণধামালী" নামে বাঙ্গালা দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই কৃষ্ণধামালীর

কৃষ্ণ নিতান্তই রাখাল-বালক এবং রাধাও একেবারে গ্রাম্য বালিকাবধূ; তাই ইহাতে আদিরসের বড় বেশী বাড়াবাড়ি ও অশ্লীলতার অতিশয় ছড়াছড়ি ছিল। এই কৃষ্ণধামালীর কিছুটা গন্ধ বড়-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ু-চণ্ডীদাসের সময়ে এই লৌকিক কাহিনীর উপরে ভাগবত-পুরাণাদির প্রভাব আসিয়া পড়ে। তৎপরে রাধা-কৃষ্ণলীলা ক্রমশঃ পৌরাণিক আকার প্রাপ্ত হয়।

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীমতী রাধা অপরিহার্য। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য এই রাধাভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বা পরমেশ্বরের ভজনা করেন। রাধা যেরূপ প্রাণের সহিত কৃষ্ণকে ভালবাসেন, সেইরূপ সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইলে তাঁহার সহিত মিলন হয়,—জীবের মুক্তি হয়। এই রাধার মনোভাব লইয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবপদাবলী অনির্বচনীয় রসময় ও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অথচ এই রাধার কথা মহাভারতে ও ভাগবতে নাই। মহাভারতীয় যুগের পরবর্তীকালের কোন কোন পুরাণে রাধার আবির্ভাব ঘটিলেও, রাধা-চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় বৈষ্ণবপদাবলীতে। বাঙ্গালার কবি জয়দেব তাঁহার সুললিত 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যে এই নবাগতা রাধার প্রেমময়ী মূর্তি সর্বপ্রথম সুন্দররূপে অঙ্কন করেন। এই গীতগোবিন্দেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল উৎস দেখিতে পাই। গীতগোবিন্দের অন্তর্গত জ্যোৎস্নাপুলকিত যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশীবাদন, আর, মেঘমেদুর তামসী রজনীতে প্রেমাকুলা রাধিকার কৃষ্ণের কুঞ্জে অভিসার—এই দুইটি চিত্রের দ্বারা জয়দেব বৈষ্ণবধর্মের সার-কথার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর নিবিড় ভালবাসা বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব। ঈশ্বর যে আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়াও তিনি যে নিরন্তর আমাদের অন্তরকে তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করিতেছেন,—গীতগোবিন্দের প্রথমোক্ত চিত্রটির দ্বারা তাহাই অভিব্যক্ত; আর, মানুষের অন্তরাত্মা যে নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়া সেই ঈশ্বরের সহিত মহামিলনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,—দ্বিতীয় চিত্রে তাহারই প্রকাশ। জয়দেবের পরে বড়ু-চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, দীন-চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিদের নিপুণ তুলিকাপাতে রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেমলীলা উত্তরোত্তর মার্জিত ও সুরঞ্জিত হইয়া উঠে।

কাজেই, রাধা বাঙ্গালীর সৃষ্টি, বাঙ্গালার কবিদের দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের পরিপুষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণাবতার চৈতন্যদেবের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম নবরূপ প্রাপ্ত হয় ও উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বা সংক্ষেপে প্রেমধর্ম নামে পরিচিত হয়। এই প্রেমধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বড়ু-চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ তিনি সানন্দে শ্রবণ করিতেন। তাঁহারই দেবচরিত্রের সংস্পর্শে লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী বিশুদ্ধ হইয়া ঐশ্বরিক প্রেমলীলায় রূপান্তরিত হয়। তাই তাঁহার পরবর্তী রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে কোথাও কাম-গন্ধ নাই। সেখানে কৃষ্ণ বা রাধা কেহই কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন;—তাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের প্রতীক। 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃষ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন, কৃষ্-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। যিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ, অন্তর্যামী পরমেশ্বর। 'রাধ্' ধাতু হইতে 'রাধা' শব্দের উৎপত্তি; রাধ্-ধাতু অর্থ আরাধনা করা। যিনি সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তিনিই রাধা, পরমেশ্বরের প্রেয়সী। চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণ এই নূতন অর্থে অঙ্কিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয় যুগে বঙ্গদেশে বড়ু-চণ্ডীদাস ও মিথিলায় বিদ্যাপতি ঠাকুর—এই দুইজন মাত্র বৈষ্ণব পদকর্তা আবির্ভূত হন।

(১) বড়ু-চণ্ডীদাস

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক গীত বা কবিতাকে সাধারণতঃ 'বৈষ্ণবপদ' বলে। প্রত্যেক বৈষ্ণবপদের শেষভাগে উহার রচয়িতার নাম উল্লেখিত থাকে; ঐ অংশটুকুকে 'ভণিতা' বলে। এই ভণিতাগুলি বিচার করিলে, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, 'চণ্ডীদাস' নামে একাধিক পদকর্তা বিদ্যমান ছিলেন। এ-যাবৎ বড়ু-চণ্ডীদাস, দ্বিজ-চণ্ডীদাস ও দীন-চণ্ডীদাস নামে তিনজন চণ্ডীদাসের কথা জানা গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিজ-চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা খুব সামান্য এবং তাঁহার অস্তিত্ব-বিষয়ে আমরা এখনও নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। কিন্তু বড়ু-চণ্ডীদাস ও দীন-চণ্ডীদাস নামে যে দুইজন

কবি বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ আমাদের নাই। "চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি বর্ত্তমান ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল বড়ু, অন্যজন চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে, তাঁহার উপাধি ছিল দীন। ইঁহারা এক নহেন, বিভিন্ন। এই দুইজন ব্যতীত আর কোন চণ্ডীদাস ছিলেন না।"[১] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে শুধুমাত্র একজন চণ্ডীদাসের কথা লোকে জানিত। তাই, দুই চণ্ডীদাসের দুই বিভিন্ন জীবন-কথা তাহাদের দ্বারা সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের কাহারও প্রকৃত জীবনী আজ আর সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে, যে-চণ্ডীদাস পরকীয়া-প্রেমের গুরু এবং রামী-ধোবানী যাঁহার পীরিতি-সাধনার নায়িকা, তিনি দীন-চণ্ডীদাস। এই দীন-চণ্ডীদাসের নামেই অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তী শুনা যায়। বড়ু-চণ্ডীদাসের জীবন-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বড়ু-চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া অনেকের অভিমত, কিন্তু কেহ কেহ বাঁকুড়া জেলার ছাতনা-গ্রামটিকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশীয় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর হইতে বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়ু-চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করেন। এই হেতু বড়ু-চণ্ডীদাসের উপরে বাঁকুড়া জেলার দাবী। বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন পুঁথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত, মধ্যেও কয়েকখানি পাতা নাই। "পুঁথির আদ্যন্ত-বিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই; এমন কি, পুঁথির নামটি পর্য্যন্তও না। দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুঁথিই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং সেইহেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ হইল।"[১] ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, 'দীন-চণ্ডীদাসের পদাবলী'।

১ বসন্তরঞ্জন রায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক একটি সুবৃহৎ কাব্য। ইহাকে একটি উপাদেয় মহাকাব্যও বলা যাইতে পারে; কারণ, ইহাতে চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার সমাবেশ ও বিবিধ রসের অভিব্যক্তি আছে। সমগ্র কাব্যমধ্যে শৃঙ্গার-রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি (মাতামহী)—এই তিনজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কার্যকলাপের দ্বারা একটা বৃহৎ ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কাব্যান্তর্গত কাহিনীটি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এইহেতু ইহাকে একখানি চমৎকার নাটক বলিয়া গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ, ইহা একটি গানের পালা,—একটি বৃহদাকার গীতাভিনয়। এই অভিনয়ে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি একাদিক্রমে গানের পর গান গাহিয়া সুমধুর সুরে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ, কৃষ্ণের প্রণয়-নিবেদনে রাধার বিরক্তি, মিলনের পথে কত বাধা-বিপত্তি, সুচতুরা বড়ায়ির দৌত্যে অচিরে উভয়ের সম্মিলন, মিলনের পরে কিশোরী রাধার মনে প্রথম প্রেমের জাগরণ, তারপর সেই প্রেমের প্রবাহে তাঁহার জীবনে কত বিরহ-মিলনের বিচিত্র অনুভূতি,—কত বেদনা, কত আনন্দ, কত হাহাকার, কত উল্লাস। এইভাবে কবি মানব-মনের কত সুগভীর অনুভূতি, কত অস্পষ্ট মনোভাব, অন্তরের কত বিচিত্র আন্দোলন সুকৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অতএব, ইহা একাধারে নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য। সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কার ও সম্পাদন শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের অক্ষয়কীর্তি।"[২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-কীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য। ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা বা বড়াইর (দূতীর) উক্তি। বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা। পুঁথির প্রাপ্ত অংশ ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত; যথা—জন্ম-খণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভার-খণ্ড, ছত্র-খণ্ড, বৃন্দাবন-খণ্ড, কালিয়-দমন-খণ্ড, যমুনা-খণ্ড, হার-খণ্ড, বাণ-খণ্ড, বংশী-খণ্ড ও বিরহ-খণ্ড। জন্ম-খণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-হরণের নিমিত্ত রাধা-কৃষ্ণের জন্ম-লীলা বর্ণিত। তাম্বুল-খণ্ডে

২ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

রাধার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণ-সূচক তাম্বুলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। দান-খণ্ডে রাধা-লাভার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দানীর অভিনয়, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ। নৌকা-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী-বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনা-বিহার। ভার-খণ্ডে ভারবাহিরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমতীর পসরা-বহন। ছত্র-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র-ধারণ। বৃন্দাবন-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ অর্থাৎ রাস। যমুনা-খণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জল-বিহার এবং কৃষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্র-হরণ। হার-খণ্ডে হার অপহরণ জন্য যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণ-খণ্ডে পূর্ব্ব অভিযোগের প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণ ত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াই কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর সম্ভোগ। বংশী-খণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধা-কর্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি ও রাধার বংশী প্রত্যর্পণ। বিরহ-খণ্ডে রাধার বিরহ, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ, শ্রীমতীর শ্রান্তি ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল কাহিনী লৌকিক-রাধাকৃষ্ণ-লীলার অনুরূপ; কিন্তু ইহার উপরে ভাগবত-পুরাণ ও গীতগোবিন্দ-কাব্যের প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে। কোন কোন পদে বিদ্যাপতির সংস্পর্শ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সমগ্র কাব্য-খানিতে সাধারণ মানুষের প্রেমের কথাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, ভাগবত-প্রেমের স্থান ইহাতে নাই। ইহার রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ি চরিত্র-ত্রয় বাস্তব নর-নারীর প্রতিচ্ছবি। ইহার তাম্বুল-খণ্ডে দৃষ্ট হয়, বড়ায়ির হাত দিয়া কৃষ্ণ রাধার কাছে ফুল-পান-কর্পূর উপহার পাঠাইয়া দেন ও তদ্দ্বারা শৃঙ্গার-আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রাধা ইহাতে অতিশয় কুপিতা হইয়া বড়ায়িকে কঠোর তিরস্কার, এমন কি, প্রহার পর্য্যন্ত করেন।

এ বোল শুনিয়া নাগরী রাধা
হানএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপূর
সব পেলাইল পাএ॥

* * *

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নন্দের ঘরের গরু-রাখোআল
তা সনে কি মোর নেহা॥

শ্রীমতী রাধার নিজের ঘরে সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও সুলক্ষণ-দেহযুক্ত স্বামী থাকিতে, তিনি নন্দের ঘরের গরু-রাখাল কৃষ্ণের সংস্রবে যাইবেন কেন?

দান-খণ্ডে বর্ণিত আছে,—বড়াযির সঙ্গে দধির পসরা লইয়া শ্রীমতী রাধা মথুরার হাটে চলিয়াছেন, কিন্তু পথিমধ্যে রাধারূপ-মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ পথ-কর আদায় করিবার ছলে তাঁহার সুকোমল তনু বলপূর্বক আলিঙ্গন করেন। রাধা কুলবধূ, সধবা যুবতী, পথিমধ্যে পর-পুরুষের দ্বারা আকর্ষিতা হইয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। দুষ্টস্বভাব রাখাল-বালকের কাছ হইতে পলাইয়া যাইবার পথ তিনি খুঁজিতে লাগিলেন, অপমানের জ্বালায় তাঁহার বিষ খাইতে ইচ্ছা হইল, লজ্জায় তিনি মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিলেন।—

পাখি-জাতি নহোঁ বড়াযি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথা সে কাহ্নাঞির মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি যাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥

ইহা বঙ্গপল্লীর হিন্দু পরিবারের সতী-সাধ্বী বধূর যথার্থ চিত্র। এখানে রাধা একেবারে রক্তমাংসের নারী। তাঁহার উপরে কোন পুরাণের ছায়া পড়ে নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণও, রাধারই মত, যথার্থ বাস্তব চিত্র। তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত কবি ভাগবত-অনুসারে বর্ণন করিলেও, তিনি বিষ্ণুর অবতার নহেন ;—তাঁহার স্বভাবে দেবত্বসূচক কোনই মহিমা নাই। তিনি বৃন্দাবনের বিশাল কাননের দুর্দান্ত রাখাল-বালক, তাঁহার রুচি নিতান্ত স্থূল এবং তাঁহার আচরণও অতিশয় রূঢ়। তাঁহার বেশভূষাও তাঁহার বর্বরতার অনুরূপ —

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা।
ধূলাএ ধূসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা॥

তাঁহার পায়ে মগব-খাড়ু, হাতে বালা, মাথায় ঘোড়াব ঝুঁটিব মত লম্বা চুল, সর্বাঙ্গ ধুলায় আচ্ছন্ন। রাধাব প্রতি তাঁহার যে দুর্বাব আকর্ষণ, তাহা কোন মহৎ ব্যক্তিব নির্মল হৃদয়ানুব'গ নহে, তাহা কামুক পুরুষেব সুন্দরী-সম্ভোগেব দুর্জয় লালসা। বড়াযির মুখে বাধাব আশ্চর্য রূপেব কথা শুনিয়াই তিনি বাধাকে পাইবাব নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইযা উঠেন ও তাঁহাব আশা পূর্ণ কবিবাব জন্য বড়ায়িকে সকাতবে মিনতি কবেন—

তোব মুখে বাধিকাব রূপকথা সুনী।
ধবিবাক না পাবোঁ পবাণী॥

* * * *

বাধিকা মানাআঁ বডাসি পুব মোব আশ।

ভাব-খণ্ডে দৃষ্ট হয, শ্রীকৃষ্ণ বাধাব দধি-দুগ্ধেব পসবা বহন কবিবা মথুবাব হাটে পৌঁছাইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু উহাব কাবণ বাধাব প্রতি তাঁহাব নিঃস্বার্থ সহানুভূতি নহে, ক্লেশেব বিনিময়ে বাধাব মধুব সঙ্গ পাইবার আশা।

মোব লোভ হযিল তোব দেখি পযোভাব।
সেসি কাবণে আহ্মে বহিব তোব ভাব॥

তাবপব, দানীব বেশে পথকব আদায, নাবিকেব বেশে যমুনায পাবি-ঘাটীব বেশে পাবেব কড়িব দাবী ইত্যাদি যত কৌশলেব আশ্রয লইয়া কৃষ্ণ অসম্মতা বাধাকে বলপূর্বক হস্তগত কবিতে সচেষ্ট হইযাছেন, তাহাতে তাঁহাকে কোনপ্রকাবেই নৈতিক চবিত্রবান্ ভদ্র যুবক বলা যায় না। যদিও তিনি বাধাকে বশীভূত কবিবার উদ্দেশ্যে সদম্ভে বলিতেছেন যে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই বাম, তিনিই ববাহরূপে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধাব কবেন, তিনিই নবসিংহরূপে হিবণ্যকশিপুব বক্ষ বিদীর্ণ কবেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তথাপি তাঁহাব আচবণে কোথাও কোনরূপ দেবত্বেব বিকাশ দেখিতে পাই না। ইহা গীতগোবিন্দেব অন্তর্গত দশাবতাব-স্তোত্রেব প্রভাব মাত্র। এইরূপ প্রভাবেব দ্বাবা শ্রীকৃষ্ণেব বাখাল-স্বভাব বিন্দুমাত্রও পবিবর্তিত হয নাই। "চন্দন-চর্চ্চিত নীল-কলেবর পীতবসন বনমালী"ব মোহনবেশে এই কাব্যেব কোথাও তিনি অবতীর্ণ হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তাম্বুল-খণ্ড হইতে বাণ-খণ্ড অবধি আদিবস ও ঐন্দ্রিয়

বিলাসের বাড়াবাড়ি থাকিলেও, বংশী-খণ্ড হইতে একটা অতীন্দ্রিয় প্রেমের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। যে-রাধা ইতিপূর্বে চতুর কৃষ্ণের সাহচর্য বিরক্তির সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই রাধার অন্তরে এখন কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহার হৃদয়-পদ্মে প্রেমের সৌরভ ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রিয়তমের ক্ষণেক বিরহ তাঁহার কাছে অনন্ত যুগ বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্বে তাঁহার মিলনের আশায় কৃষ্ণ ঘুরিয়া মরিয়াছেন, এখন কৃষ্ণের মিলন পাইবার জন্য তিনিই সর্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণের অদর্শনে—কৃষ্ণের বিরহে তাঁহার অতুল রূপ-যৌবন তিনি নিতান্তই অসার বোধ করেন। কৃষ্ণের মিলন ব্যতীত তিনি আর জীবন ধারণ করিতে পারেন না।

ধরণ ন জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আনি দেহ নান্দের নন্দন॥

* * *

বিনি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রেমের মূলে কাম নিহিত এবং কামতৃপ্তির মধ্য দিয়াই আন্তরিক প্রেমের আবির্ভাব হয়। তাই মিলন-সম্ভোগের পরে রাধার চিত্ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ এখন আর কেবল ইন্দ্রিয়-বিলাসের নায়ক নহেন, তিনি এখন রাধার অন্তর্যামী, হৃদয়সর্বস্ব। তাই মদনমোহনের মধুর বেণুরবে তাঁহার সমগ্র দেহ-মন ব্যাকুল হয়, তাঁহার গৃহকর্ম বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। বংশী-খণ্ডের অন্তর্গত নিম্নলিখিত পদটিতে অলক্ষ্য কৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া রাধার অস্থিরতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীব শবদে বড়ায়ি হাবায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল কবিতেঁ কিবা আহ্মাব মন।
বাজাএ সুসব বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদনী বিদাব দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোব মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তব সুখাএ মোব কাহ্ন আভিলাসে।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

কোন অবণ্য যখন জ্বলিতে থাকে, তখন লোকে অগ্নিশিখা দেখিতে পায়; কিন্তু কুমাবের পোয়ানে (চুল্লীতে) যে মৃন্ময় কলস ছাইয়েব আড়ালে ধিকি-ধিকি আগুনে পোড়ে, তাহা কেহ লক্ষ্য কবে না। বাধাব অন্তব তেমনি ভিতবে ভিতবে কত যে তীব্রভাবে পুড়িযা যাইতেছে, অন্যে তাহা বুঝিতে পাবিবে না। বিবহ-খণ্ডেব অন্তর্গত নিম্নলিখিত পদটিতে কৃষ্ণ-বিহীনা বাধাব নিবিড় বিষণ্ণতা মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসাব।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতাব হাব॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসেব সিন্দুব।
বাহুব বলয়া মো কবিবোঁ শংখচুব॥

কৃষ্ণেব মিলন না পাইলে, বাধাব বেশভূষা সমস্তই বৃথা। তাঁহাব গলাব গজমতিহাব তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন, সীঁথিব সিন্দুব মুছিযা ফেলিবেন এবং হাতেব বালা চূর্ণবিচূর্ণ কবিবেন।—উদ্ধৃত অংশটুকু বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদ্যটিব ভাবানুবাদ—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর তোড়হ গজমতি হাব বে।
পিয়া যদি তেজল কি শিঙারে যমুনা-সলিলে সব ডার রে॥
সীঁথার সিন্দুর পোছি কর দূর পিয়া বব নৈরাশ রে।

বিদ্যাপতির এইরূপ কোন কোন পদের ভাবানুবাদ আরো দুই-তিন জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

বিদ্যাপতি—

পীনপয়োধর অপরুব সুন্দর উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমলজল দুই বহ সুরসরিধার॥

বড়ু-চণ্ডীদাস—

কনককুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োধরে।
তাহাতে উপর গজ মুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভা করে সুমেরু গঙ্গার ধারে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু অংশ ভাগবতের অনুকরণে বচিত। জন্ম-খণ্ড, বৃন্দাবন-খণ্ড, কালিয়-দমন খণ্ড ও যমুনা-খণ্ড ভাগবত-বর্ণিত কাহিনীব অনুরূপ; দুই-এক স্থলে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু তাম্বুল-খণ্ড, দান-খণ্ড, ভাব-খণ্ড প্রভৃতি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বৃন্দাবন-খণ্ড ও বিবহ-খণ্ডে গীতগোবিন্দেব অন্তর্গত অনেক পদের ভাবানুবাদ আছে। বৃন্দাবন-খণ্ডে বড়াযি যেখানে রাধাকে মনোহর বেশে সজ্জিতা হইযা বংশীবাদন-রত কৃষ্ণের কুঞ্জে যাইতে সদুপদেশ দিতেছে—

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেত বেণু বাজএ যতনে॥

সেখানে জয়দেবের—রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

—প্রভৃতি পদটির ভাবানুবাদ সহজেই ধরা পড়ে। বিরহ-খণ্ডে বড়ায়ি যে-কথায় রাধার দুর্দশা কৃষ্ণের নিকটে বর্ণন করিতেছে—

তনের উপরে হারে
মানএ যেহেন ভারে।
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে॥

তাহা জয়দেবের ভাষার বঙ্গানুবাদ—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
স' মনুতে কৃশতনুরিব ভারং ॥

এইরূপ উদাহরণ আরো বহু দেওয়া যাইতে পারে। যথা—বৃন্দাবন-খণ্ডে অভিমানিনী রাধার মান ভাঙ্গাইবার জন্ম কৃষ্ণের সকাতর মিনতি—

মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরোপ রাধা
মোব মাথার উপরে।

গীতগোবিন্দেব সেই সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব সূচনা হইতে কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রণয়লীলা কীর্তন করিতে করিতে গ্রন্থশেষে দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম প্রেমের অবতারণা করিয়াছেন। এইহেতু প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বড়ু-চণ্ডীদাসের পদাবলী সানন্দে উপভোগ কবিতেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥

(২) বিদ্যাপতি ঠাকুর

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-পদ-সাহিত্যে মিথিলার সুবিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর সবাগ্রগণ্য। গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেবকে কেহ কেহ ঐ স্থলাভিষিক্ত করিলেও, বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহাজনেরা বিদ্যাপতিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় জয়দেবের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও, বিদ্যাপতির তুলনায় তাহা নগণ্যপ্রায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর দ্বারা তাঁহারা এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার শুধু ভাব-কল্পনা-কবিত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার ভাষা-ছন্দ-সুর সবই সাগ্রহে অনুকরণ করিয়াছেন। এমন কি, বাঙ্গালা শব্দগুলিকে তাঁহারা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদ্যাপতির শব্দের আকারে নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। কারণ, বিদ্যাপতির পদের ন্যায় সুকুমার মাধুর্য বিদ্যাপতির মতই "কোমল-কান্ত" শব্দাবলীর দ্বারা প্রকাশ

করা সম্ভবপর। এইরূপে বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করার ফলে, বাঙ্গালা ভাষার আরেকটা অভিনব রূপ প্রস্ফুটিত হয়,—অধুনা উহা "ব্রজবুলি" নামে অভিহিত। এই ব্রজবুলি-ভাষাতেই বাঙ্গালার অধিকাংশ বৈষ্ণবপদ বিরচিত; এবং এই ব্রজবুলির দ্বারাই সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যাপতিই বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিবৃন্দের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদের পদসমূহে বিদ্যাপতির ভাব, ভাষা ও ছন্দের যথেষ্ট সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ-বিষয়ে এযাবৎ যতগুলি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিতেই বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে; কিন্তু জয়দেবের প্রসঙ্গ নাই বলিলেই চলে। বিদ্যাপতি যদিও মিথিলার অধিবাসী এবং মৈথিলী ভাষাতেই তাঁহার পদাবলী রচিত, তথাপি বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে ঐগুলি বহুমূল্য রত্নরূপে পরম সমাদরের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যের 'ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বিদ্যাপতির পদগুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া লইবার সপক্ষে যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"বিদ্যাপতি বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ না করিলেও এবং বাঙ্গালা ভাষায় গান না লিখিলেও বাঙ্গালীরই কবি ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহার স্থান অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে। বাঙ্গালীই ইঁহার কবিতার যথার্থ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহান্তেরাই ইঁহার পদ গান করিয়া অনুকরণ করিয়া পদ-সংগ্রহে স্থান দিয়া ইঁহার কবিতাকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছে।"

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিদ্যাপতি মিথিলায় আবির্ভূত হন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কিঞ্চিদধিক কাল অবধি বর্তমান থাকেন। "বিদ্যাপতি যে ৩৪১ লক্ষণাব্দে (=১৪৬০ খ্রী:) শুধু জীবিত নয়, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন তাহার স্বাধীন ও বলবৎ প্রমাণ মিলেছে।...১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশীদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না।"[১]

বিদ্যাপতির জীবনকথা

মিথিলার অন্তর্গত বিসফী নামক গ্রামে 'ঠাকুর'-উপাধি-ধারী এক সুবিখ্যাত-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের অনেকেই অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রধান

প্রধান রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলার রাজা গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। গণেশ্বরের তৃতীয় পুত্র কীর্তি সিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন এবং অবহট্‌ঠ ভাষায় 'কীর্তিলতা' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা কীর্তিসিংহের রাজত্ব কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কীর্তিসিংহের স্বল্পকাল রাজত্বের পরে দেবসিংহ মিথিলার রাজা হন এবং বিদ্যাপতি রাজ-পণ্ডিতের পদেই থাকিয়া যান। এই সময়ে তিনি 'ভূপরিক্রমা' নামে সংস্কৃত ভাষায় তীর্থবর্ণনা-মূলক একটি কাব্য রচনা করেন এবং মৈথিলী ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ে পদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলার রাজা হন ও বিদ্যাপতি তাঁহার সভাকবি নিযুক্ত হন। শিবসিংহের যশোগান করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ-ভাষায় 'কীর্তিপতাকা' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। শিবসিংহের রাজত্বকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'পুরুষপরীক্ষা' নামক একটি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই শিবসিংহ পরলোক গমন করেন। শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভা সমধিক বিকাশ লাভ করে, তাঁহার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ পদের ভণিতায় শিবসিংহের উল্লেখ আছে। শিবসিংহের তিরোধানের সাথে সাথে মিথিলার রাজবংশ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে ও বিদ্যাপতির কবিত্ব ম্লান হইয়া আসে। শিবসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁহার অনুজ পদ্মসিংহ মিথিলার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অযোগ্যতাবশতঃ রাজমহিষী বিশ্বাসদেবী রাজ্যভার চালনা করেন। এই বিশ্বাসদেবীর ছত্রচ্ছায়ায় বিদ্যাপতি আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত 'গঙ্গাবাক্যাবলী' ও 'শৈবসর্বস্বসার' নামে দুইখানি পূজাপদ্ধতির বই সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। পদ্মসিংহের পর মিথিলার রাজা হন নরসিংহ। নরসিংহের পত্নী ধীরমতিদেবীর নির্দেশে বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন—'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী' ও 'দুর্গাপূজা তরঙ্গিণী'। নরসিংহের পরবর্তী আর কোন রাজার সভায় বিদ্যাপতির নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করিলেও, তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক পদগুলিই শুধু বাঙ্গালাদেশে সমাদৃত ও

সুপ্রচলিত। এই পদগুলি একাধারে মধুর কবিত্ব, গভীর ভাব, সুন্দর ভাষা, ললিত ছন্দ ও মনোহর অলঙ্কারে পূর্ণ। এই পদগুলিতে তিনি মানুষের প্রণয়বৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রেমের বিভিন্ন অবস্থায় প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে যত প্রকার বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহা একে একে ধরিয়া তিনি অসংখ্য মনোরম চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাই, তিনি প্রধানতঃ প্রেমের কবি। মানুষের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যজীবনের উপরে ইহার প্রভাব সমধিক। এই প্রেমের বলে প্রিয়তমকে পাওয়া যায়,—পরমেশ্বরকেও বাঁধিয়া ফেলা যায়। কোন যুবতী নারী তাহার হৃদয়-বাঞ্ছিত প্রণয়ীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে,—তাহা সর্বজন-বিদিত; কিন্তু কোন কোন মানুষ পরমেশ্বরকেই সর্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়া ফেলে,—এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ ঈশ্বর-প্রেমিকের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, বিদ্যাপতির পদাবলীতে লৌকিক ও ঐশ্বরিক এই উভয়বিধ প্রেমেরই অপূর্ব মাধুর্য সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মানবীয় প্রেম লইয়া তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সূচনা,—এই প্রেমের মাধুর্য ও রহস্য লইয়া উহার ক্রমবিকাশ, এবং উহার পরিণতি ঐশ্বরিক প্রেমে। এই প্রেম পূর্বরাগ প্রভৃতি প্রথম ধাপ হইতে উদ্গত হইয়া, মিলন-অভিমান প্রভৃতি মধ্যবর্তী বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিরহ-ভাবোল্লাস প্রভৃতি উচ্চতম স্তর বাহিয়া,—অনন্ত প্রেমের অমৃতলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই কারণে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার পদাবলীর পরম সমাদর করিতেন—

বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ —(চৈতন্যচরিতামৃত)

বিদ্যাপতি-রচিত এক সহস্রাধিক রাধাকৃষ্ণপদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমলীলা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে প্রধানতঃ সাতটি পালা বা খণ্ডে ভাগ করা যায়,—(১) রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগ, (২) রাধার বয়ঃসন্ধি, (৩) সখীদের দৌত্য ও রাধাকৃষ্ণের মিলন, (৪) রাধার অভিসার, (৫) রাধাকৃষ্ণের মানাভিমান, (৬) প্রেমবৈচিত্ত্য এবং (৭) রাধার বিরহ ও ভাবোল্লাস।

বিদ্যাপতির কাব্যে প্রথমেই রাধার ও তৎপরে কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিন্তু শুধু কৃষ্ণেরই পূর্বরাগ, কৃষ্ণই কেবল রাধার জন্য ব্যাকুল রাধা কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। অবশ্য বারবার কৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া রাধার চিত্তেও অবশেষে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জন্মে। বিদ্যাপতির রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই—পরস্পরের প্রথম সাক্ষাৎ —বৃন্দাবনেব প্রকাশ্য পথে সর্বপ্রথম উভয়ের "লোচন লোচন মেলা"—সেই শুভমুহূর্ত হইতেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রথম দৃষ্টিপাতেই কাহাকেও ভাল লাগিলে, সেই ভাল-লাগার ফলে অন্তরের মধ্যে সহসা একটি অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগে; কিন্তু সেই আনন্দের রহস্য তখন বুঝা যায় না। কারণ, পরক্ষণে নয়ন-মিলন বিচ্ছিন্ন হইলে সে সুখের আলো নিভিয়া যায়। আলো নিভিয়া যায় বটে, কিন্তু উহার তাপ তখন মনকে পুড়াইয়া মারে,—বাঞ্ছিত জনের মিলন-কামনায় সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।—

জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি
দুহু মনে দুখ লাগু।
দুহুক আশাদীপ মিঝাএল
মদন আঁকুর ভাঁগু॥
বিরহ দহন দুহু সঁতাবএ
দুহু সমীহএ মেলী।
একক হৃদয় অওক না পাওল
তেঁ নহি ফাউলি কেলী॥

অর্থ—দুইজনের দৃষ্টি-মিলন যখন ক্ষুণ্ণ হইল, তখন দুইজনেরই মনে দুঃখ লাগিল। উভয়ের আশাদীপ নির্বাপিত হইল, মদনের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া গেল। বিরহ-দহন দুইজনকে সন্তাপিত করিল, দুইজনেই পরস্পরের মিলন কামনা করিতে লাগিল। একজনের হৃদয় অন্যজনের হৃদয়কে পায় নাই, তাই মিলনের আনন্দ বিকাশ পাইল না।

ইংরাজীতে—"Love at the first sight" বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অবস্থায় বিদ্যাপতির রাধা ও কৃষ্ণের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়, উভয়েই পরস্পরের মিলন-কামনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু কৃষ্ণাপেক্ষা রাধার ব্যাকুলতা অনেক

বেশী। রাধাই ইহার পরে মাধবের বাড়ীতে যায় এবং নিজের মাথার চুল নিজ হাতে সরাইয়া কৃষ্ণের দিকে বক্রদৃষ্টিতে বারবার ফিরিয়া চায়।

আওর কি করতি সখি পরিণত সসিমুখি
কাহ্নু জদি না বুঝ বিসেষ।

কৃষ্ণ যদি তাহার এই ইঙ্গিত বিশেষভাবে না বুঝিতে পারে, তাহা হইলে পূর্ণচন্দ্রমুখী রাধা আর কি করিতে পারে? কৃষ্ণের সুন্দর রূপে রাধা বিমুগ্ধ হইয়াছে, তাই তাঁহার সহিত মিলনের জন্ম রাধার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের যে মোহন মূর্তি তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া গেছে, তাহার হৃদয় খুলিয়া সখীদের তাহা সে দেখায়।—

কি কহব হে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন পরা সৌদামিনি রেহ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেস।
কাজরে সাজল মদন সুবেস॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস॥
বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর
সুন করলি বিহি মদন ভঁড়ার॥

অর্থ—হে সখি, কৃষ্ণের রূপের কথা আর কি কহিব? তাঁহার রূপ যে স্বপ্নের মত সুন্দর, তাহা কে প্রত্যয় করিবে? তাঁহার দেহ অভিনব জলধরের ন্যায় এবং তদুপরি পীতবসন সৌদামিনী-রেখার মত শোভা পায়। তাঁহার বদন-মণ্ডল আলুলায়িত কুঞ্চিত শ্যামল কেশরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত, যেন মদনদেব কাজল পরিয়া সুবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার ললিত অঙ্গের জাতকী-, কেতকী-কুসুম-সদৃশ-সুগন্ধে মোহিত হইয়া মন্মথ তাঁহার ফুল-শর ত্যাগ করিলেন। বিদ্যাপতি কি আর কহিবেন, বিধি আজ মদনের রূপ-ভাণ্ডার শূন্য করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মনোলোভা রূপ-কান্তি রাধার চিত্তে সর্বক্ষণ জাগিয়া থাকে,

তাঁহার মধুর সঙ্গ পাইবার জন্য তাহার অন্তরে সর্বদা নিদারুণ আকাঙ্ক্ষা। ইতিপূর্বে সে শুধু নিজের মধ্যে মগ্ন ছিল, অন্যের কথা কখন চিন্তাও করে নাই; আর, এখন কৃষ্ণের মিলন পাইবার জন্য তাহার কত সযত্ন প্রয়াস!

এত দিন অছলিহু অপনে গেআনে।
আবে মোবা মরম লাগল পচবাণে॥

রাধার ন্যায় কৃষ্ণও তাঁহার মনোমোহিনীর সহিত মিলিত হইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল। সুন্দরী রাধার অতুল রূপরাশি তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার হৃদয-সাগরে কামনার জোয়ার জাগাইয়া তুলিয়াছে। রাধার রূপ ভালভাবে দেখিতে না পারিলেও, সেই অনুপম রূপের বিদ্যুৎ-ছটায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, এবং তদবধি অনঙ্গ তাঁহার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। রাধার রূপ দেখিয়া তাঁহার মনের বিমুগ্ধভাব ও রাধার প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ নিম্নলিখিত পদটিতে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।—

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি
হিরদয়ে সেল দঈ গেল॥
আধ-আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
এক তনু গোরা কনক-কটোরা
অতনুক কাঁচলা উপাম।
হার হরল মন জনি বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম॥
দসন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আসা॥

অর্থ—হে সজনি, ভাল করিয়া দেখা হইল না। মেঘমালার সঙ্গে বিদ্যুল্লতা

যেন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া দিল। অর্ধ অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, অর্ধ বদনে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, অর্ধ নয়নের তরঙ্গ দেখা যাইতেছে। তাহার অর্ধ-অঞ্চলাবৃত অর্ধ-পয়োধর দেখিলাম। তদবধি অনঙ্গ (কাম) আমাকে দগ্ধ করিতেছে। একে তাহার দেহ গৌরবর্ণ, তাহার উপরে পয়োধর যেন সুবর্ণের কৌটা, কাঁচলি মদনের তুল্য। তাহার কণ্ঠলগ্ন হার আমার মন হরণ করিল, উহা যেন কামদেবের পাতা ফাঁদ। তাহাব মুক্তাপংক্তি-সদৃশ দন্তরাজি অধরের সহিত মিশিয়াছে এবং সে মৃদু মৃদু কথা বলিতেছে। বিদ্যাপতি বলে, অতএব এই দুঃখ রহিল যে, দেখিযা দেখিয়া আশা পূর্ণ হইল না।

'রাধার বয়ঃসন্ধি' নামক খণ্ডে বিদ্যাপতি আশ্চর্য শিল্প-চাতুর্যেব পরিচয় দিযাছেন। রাধা-অঙ্গের যৌবন-সুষমা তিনি ভাষার রেখায় চিত্রিত করিযাছেন। তাঁহার রাধা-রূপের বর্ণনা এরূপ মনোজ্ঞ যে, উহা পাঠকের মানসপটে সুস্পষ্ট সুন্দর মূর্তিতে ফুটিয়া উঠে। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার পরাইযা তাঁহার বর্ণিত রূপকে তিনি অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত করিয়া তুলিযাছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রায় সমুদয় অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করিযাছেন, তথাপি তাঁহার কোন চিত্র অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। সুন্দরী বালিকার সুকোমল দেহে যৌবন-সৌন্দর্যের ক্রম-বিকাশ তাঁহার ন্যায সুচারুরূপে অঙ্কন করিতে খুব কম কবি সক্ষম হইয়াছেন। কিশোরী রাধার জীবনে যৌবনের আগমন ও সেই সঙ্গে তাহার মনোজগতের পরিবর্তন তিনি চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কৈশোরান্তে তাহার সুকোমল শরীরে সহসা একদিন যৌবনের প্লাবন আসিয়া উপনীত হইল, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রূপের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, হৃদয় মধ্যে এক অজানা আনন্দের শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে জাগিতে লাগিল। তাহার এই বয়সের একখানি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

সৈসব জৌবন দুহু মিলি' গেল।
শ্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লই অব করই সিঙ্গার।
সখি পুছই কইসে সুরত-বিহার॥

নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি-সম পুন নবরঙ্গ।
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥

অর্থ—শৈশব ও যৌবন দুই মিলিত হইল। দুই নয়ন শ্রবণের পথ লইল। বচনের চাতুরী লঘু হাসিতে পরিণত হইল। ধরণীতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল। রাধা এখন মুকুর লইয়া সাজসজ্জা আরম্ভ করিল। রতি-ক্রীড়া সম্বন্ধে সখীদের সে জিজ্ঞাসা করে। নিজের পয়োধর নিজেই কতবার নির্জনে দেখে এবং উহার শোভা দেখিয়া পুলকিত হয়। তাহার স্তন প্রথমে বদরিসম ও তৎপরে লেবুর ন্যায় বড় হইয়া উঠিল। দিন দিন মদন তাহার অঙ্গ অধিকার করিলেন।

"বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা, আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। · যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্যোবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে। তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে, কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।"[১] তাহার এইরূপ যৌবন-চাঞ্চল্যের একটি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

অর্থ—সে কখনও কেশরাশি বাঁধে, কখনও বা বিস্তারিত করে; কখনও অঞ্চলের দ্বারা দেহ আবৃত করে, কখনও বা উন্মুক্ত করে। তাহার সুস্থির নয়ন কিঞ্চিৎ অস্থির হইল এবং পয়োধর-শোভিত বক্ষঃস্থল লোহিতাভ হইয়া উঠিল। তাহার চরণ চঞ্চল ও চিত্ত অস্থির হইল। তাহার আমোদিত নয়নে কাম-লালসা জাগিল।

১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক সাহিত্য'

অচিরে রাধার দেহ যৌবন-শোভায় পরিপূর্ণ ও তাহার চিত্ত রতি-সুখ-কামনায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। এইরূপ অবস্থায় নবীন যুবক শ্যামসুন্দরের বার-বার সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে দুর্জয় বাসনা জাগিয়া উঠিল। কাজেই সে এখন নানা কৌশলে কৃষ্ণের মনহরণ করিতে সচেষ্ট হইল; কিন্তু যুবতীসুলভ লজ্জাবশতঃ কিছুই তাঁহাকে স্পষ্টতঃ জানাইতে পারিল না। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনের পথে, যমুনার তটে ও স্নানের ঘাটে রাধার অপরিমেয় রূপ-লাবণ্য দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইলেন ও তাহার মিলন-লাভের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যাকুলতার একটি চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বর নারি॥
* * *
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু॥
পুনহি দরসন জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওব।
চরণ জাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

অর্থ—সুন্দরী কামিনী মুচকিয়া হাসিয়া গজেন্দ্র-গমনে চলিয়া গেল। ঐন্দ্র-জালিক মদনদেব এই কুহকিনী নারীর রূপে দেখা দিলেন।……চঞ্চলতার সহিত অঞ্চল দিয়া বক্ষ ঢাকিতে তাহার অর্ধ-পয়োধর দৃষ্ট হইল;—যেন শরৎকালের মেঘ পবনের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ায় সুমেরু পর্বত প্রকাশ পাইল। তাহার পুনর্বার দর্শনে আমার জীবন জুড়াইবে, বিরহের অবসান হইবে। তাহার পায়ের আলতা যেন হৃদয়দাহী অগ্নিশিখা, উহাতে আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে।

যাহা হউক, অবশেষে সখীদের দৌত্যে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন হয়। কিন্তু রাধা মিলনোৎসুকা হইলেও সুরতি-বিহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, তাই কৃষ্ণের সন্নিকটে যাইতে সে ভীতা, সঙ্কুচিতা ও সন্ত্রস্তা হইয়া পড়ে। প্রথম মিলনে নবীনা যুবতীর এইরূপ সলজ্জ আচরণের অনেকগুলি মধুর চিত্র 'মিলন' খণ্ডে অঙ্কিত হইয়াছে। বয়োধর্মের প্রেরণায় সে সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণের কাছে আসিয়াছে বটে, কিন্তু নারীসুলভ অমূলক ভীতিবশতঃ প্রিয়তমের পার্শ্ব হইতে সে পলাইয়া যাইতে চাহিতেছে। তাহার এই প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ নিম্নলিখিত পদটিতে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।—

অহে সখি অহে সখি লএ জনি জাহ।
হম অতি বালিক আকুল নাহ॥
গোট গোট সখি সব গেলি বহরায।
বজর কিবাড় পহু দেলহি লগায॥
তেহি অবসর পহু জাগল কন্ত।
চীর সম্ভারলি জিউ ভেল অন্ত॥
নহি নহি করএ নয়ন ঢর নোর।
কাঁচ কমল ভমরা ঝিক-ঝোর॥
জইসে ডগমগ নলনিক নীর।
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু কবিরাজ।
আগি জারি পুনি আগক কাজ॥

অর্থ—"ওগো সখি, আমাকে কৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইও না। আমি নিতান্ত বালিকা, আর নাথ কামে আকুল হইয়া রহিয়াছেন।" সখীরা একে একে বাহিরে চলিয়া গেল, প্রভু বজ্রসম কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই অবসরে কৃষ্ণ কামাকুল হইলেন এবং রাধা বসন সম্বরণ করিতে প্রাণান্ত হইয়া পড়িল। রাধা "না, না" করিতে লাগিল, তাহার দুই নয়নে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। ভ্রমর যেরূপ পদ্ম কলিকে লইয়া টানাটানি করে, সেইরূপ কৃষ্ণ রাধাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পদ্মপত্রে জলবিন্দু যেরূপ টলমল করে, রাধার অঙ্গ তদ্রূপ কম্পিত হইতে লাগিল। কবিরাজ বিদ্যাপতি বলেন, "শোন, অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পুনরায় অগ্নিরই কাজ হয়।"

পুরুষের সহিত প্রথম সঙ্গমে যুবতীর মনে যে লজ্জা-সঙ্কোচ দেখা দেয়, পুনঃ-পুনঃ সম্মিলনের ফলে তাহা দূর হইয়া যায়। তখন হৃদয়বল্লভের সঙ্গ পাইবার জন্য তাহার অন্তরে তীব্র কামনা জাগিয়া উঠে। সেই কামনার তাড়নায় রাধা সকলের চক্ষে ধুলা দিয়া অন্ধকার বনপথে কৃষ্ণের কুঞ্জে ছুটিয়া যায়। 'অভিসার' খণ্ডে বিদ্যাপতি রাধার এইরূপ প্রেম-লীলা-চাঞ্চল্যের কতিপয় মনোহর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এইরূপ একখানি চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥
* * * *
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারল বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥

অর্থ—নব-অনুরাগিণী রাধা কোনই বাধা মানে না। সে একাকী প্রস্থান করিল, পথ-বিপথ মানিল না।···রজনী ঘোর অন্ধকার, কিন্তু কামদেবের প্রভায় তাহার হৃদয় উজ্জ্বল। বিঘ্ন-প্রসারিত পথ সে প্রেমের আয়ুধে কাটিল।

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন যখন নিবিড় হইয়া উঠে, তখন উভয়ের মধ্যে মানাভিমান দেখা দেয়। এইরূপ অভিমানের দ্বারা নায়ক বা নায়িকা তাহার প্রণয়ীর প্রেমের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা পরীক্ষা করিয়া লয়। এই 'মান'-খণ্ডে, শ্রীকৃষ্ণের অভিমান হইলে, রাধা সেই মান ভাঙ্গিবার নিমিত্ত যেরূপ সযত্ন প্রয়াস পায়, তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি তাহার প্রেমের গাঢ়তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিমর্ষ প্রিয়তমকে প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে সে একাকী ঘোর মেঘাচ্ছন্ন যামিনীতে দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের কুটীরে গিয়া উপনীত হয়। প্রেমের প্রভাব এমনই বটে!

গগন গরজ মেঘ জামিনি ঘোর।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চরু চোর॥

এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ॥
তিল এক মাধব পরিহর মান।
তুঅ লাগি সংসয় পরল পরাণ॥
দুসহ জমুনা নরি অইলিহু তাগি।
কুচজুগ তরল তরনি তঁা লাগি।
দেহ অনুমতি হে জুঝও পঁচবান।
তোঁহে সন নগর নাগর নহি আন॥

অর্থ—ঘোরান্ধকার যামিনী, গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে। এরূপ দুঃসময়ে চোরও রত্ন অপহবণ কবিতে বাহির হয় না। এত গভীর অন্ধকাব যে আপনিই আপনাব দেহ দেখিতে পারি না;—এমন সময়ে আমি নিজগৃহ ত্যাগ কবিয়া আসিলাম। হে মাধব, এক মুহূর্তের জন্য মান পরিত্যাগ কব, তোমাব নিমিত্ত আমার প্রাণে সংশয় জাগিল। সেই কারণে দুঃসহ যমুনানদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম। তুমি অনুমতি দাও, পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক। তোমাব তুল্য নাগর নগবে আর নাই।

মান-ভঙ্গের পর রসময়ী বাধা ও প্রেমময় কৃষ্ণের মিলন-খেলা অবাধে চলিতে থাকে। তখন উভযে কত হাসি-ঠাট্টা, কত ছল-চাতুরী, কত ব্যঙ্গ-কৌতুক—কত লীলা-চাঞ্চল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠে। সময-অসময়ে, স্থানে-অস্থানে, যখন-তখন সুচতুব নাগরের প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়া প্রেমময়ী বাধা হর্ষ-পুলকে, লজ্জা-শিহরণে, আনন্দ-উল্লাসে আত্মহারা হইয়া পড়ে। 'প্রেম-বৈচিত্ত্য'-খণ্ডে তাহাদেব এই প্রকাব প্রেমাভিনয়ের অনেকগুলি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইযাছে। এই চিত্রসমূহে রাধা-চরিত্রেব কোমলতা, লজ্জাশীলতা, প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে রাধার একখানি মধুর লজ্জার ছবি উদ্ধৃত হইল।—

এ সখি রঙ্গিনি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে ন হোয়॥
একলি অছলি ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥

এদিগে ঝাঁপইত তনু উদিগে উদাস।
ধরনী পসিএ জদি পাও পরকাস ॥
করে কুচ ঝাঁপইত ঝাঁপনে ন জায়।
মলয়-সিখর জনু হিমে ন লুকায় ॥
ধিক জাউ জীবন জৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥
ভনই বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিএ চতুরাই ॥

প্রেম-বৈচিত্ত্য অবধি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা মানবীয় প্রেমের প্রতিচ্ছবি,—হৃদয়াপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রাধান্যই বেশী। "কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন।"[১] এখন আর ইন্দ্রিয়-বিলাসের চিত্র নাই, এখন কেবল কৃষ্ণ-বিরহে বাধার অন্তর-বেদনার ছবি। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন শুনিয়া সরলা রাধা ম্রিয়মাণা হইল। কৃষ্ণ নিকটে আসিলে, তাঁহাব মুখের দিকে তাকাইয়া সে অঝোবে কাঁদিয়া ফেলিল এবং হরি-হরি বলিয়া মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িযা গেল। তখন তাহাকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ বলিলেন—"অব নহি মাথুর করব পয়ান"—আমি এখন মথুরায় যাইব না। এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া রাধার পুনরায় চেতন-সঞ্চার হইল, সে তাহার প্রাণনাথের দুই হাত নিজের মাথায় তুলিয়া লইল,—মুখে কোনই কথা ফুটিল না। কিন্তু নিষ্ঠুর শ্রীহরি তাঁহার নিজের কথা রাখিলেন না;—গভীর নিশীথে নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। হায়, রাধা তাঁহার গমন জানিতে পারিল না, নহিলে সে যোগিনী হইয়া তাঁহার সঙ্গ লইত।

মোয়ঁ অভাগলি নহি জানলি রে
সঙ্গ জইতঁও জোগিনী বেস।

রাধা যে কৃষ্ণকে কত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহাকে যে শুধু প্রণয়-লীলার নায়ক নহে, অধিকন্তু প্রাণপতির আসনে বসাইয়া হৃদয়ের ভক্তি দিয়া পূজা করিয়াছে, তাহার বিরহ-জনিত খেদোক্তি শুনিয়া তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।

১ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

তাহার জীবন-দেবতার অভাবে সে আজ বিশ্বসংসার শূন্য দেখে, সাগরজলে ডুবিয়া মরিতে তাহার ইচ্ছা হয় এবং পুনর্জন্মে নিজে কৃষ্ণ হইয়া ও কৃষ্ণকে রাধা করাইয়া, তাহার এই দুঃসহ দুঃখ তাঁহাকে সে বুঝাইয়া দিতে চায়।—

হাম সাগরে তেজব পরান।
আন জনমে হোয়ব কান॥
কানু হোয়ব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥

সরলমনা রাধাকে যে কোনদিন প্রেমিক-চূড়ামণি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা সে পূর্বে জানিতে পারিলে, এরূপভাবে নিজের প্রাণ কখনই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিত না। তাহার গৃহে আজ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ নাই, শূন্য শয্যা দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সখীদের সে চিতাগ্নি সাজাইয়া দিতে বলে। কাল আসিবেন বলিয়া প্রাণেশ্বর চলিয়া গেলেন; তাহার পর কত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তবু তিনি আর আসিলেন না। রাধা আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারে না,—কালের হিসাব রাখিতে রাখিতে তাহার হাতের নখ ক্ষয় হইয়া গেল।—

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল
বিছুরিল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব ইহ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয় কিবা সাধ॥

মাধবের প্রেম স্মরণ করিতে করিতে রাধার কোমল তনু ক্ষীণ হইল, জীবনে তাহার আর সাধ নাই। কিন্তু তাহার সখীবৃন্দ তাহাকে আশ্বাস দেয়, তাহার প্রাণেশ্বর নিশ্চয় আসিবেন। হয়তো তিনি আসিবেন, কিন্তু রাধার চিত্ত তাহাতে প্রবোধ মানে না;—ততদিনে তাহার আর ধৈর্য থাকিবে না, মন ভাঙ্গিয়া যাইবে, যৌবনশ্রী ম্লান হইবে। তাহার নবযৌবন যদি ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের আশা লইয়া সে কি করিবে?—

অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ঈ নব জোবন বিরহ গমাওব
কি করব সে পিয়া নেহে॥

সূর্যের তাপে যদি অঙ্কুর জ্বলিয়া যায়, তাহা হইলে জল-ভরা মেঘে আর কি করিবে? এ সাধের যৌবন যদি বিরহেই অতিবাহিত হয়, তবে আর প্রিয়তমের স্নেহে কি প্রযোজন?—এইরূপ নিদারুণ বিচ্ছেদানলে রাধার চিত্ত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পুড়িয়া যাইতে লাগিল। এই স্থানে কবি রাধার বার মাসের বিভিন্ন বিরহাবস্থা একে একে বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনাকে 'বারমাস্যা' বলে। বারমাস্যা বর্ণন করা বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্যাপতিকেই ইহার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। তাঁহার বারমাস্যা-জাতীয় গীতগুলি একাধারে রাধার বিরহ-বেদনা ও প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া, উচ্চ শ্রেণীর নিসর্গ-কবিতায় পরিণত হইয়াছে। রাধার বর্ষাকালীন এক বিরহ-রজনী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

সখি হে হমর দুখক নহি ওর।
ই ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরসন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর সর হন্তিয়া॥
কুলিস কত সত পাত মুদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুর ডাক ডাহুক
ফাটি জায়ত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর জামিনি
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কইসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

অর্থ—হে সখি, আমার দুঃখের শেষ নাই। এই ভাদ্রমাসের ভরা বাদলে আমার গৃহ শূন্য। মেঘরাশি দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন করিতেছে, ও সারা ভুবনব্যাপিয়া বারি-বর্ষণ হইতেছে। এমন সময়ে আমার প্রাণকান্ত প্রবাসে, তাই আমি সুতীক্ষ্ণ কাম-শরে জর্জরিত হইতেছি। কত শত বজ্রপাত দেখিয়া ময়ূর আনন্দে নাচিতেছে; মত্ত দাদুরি ও ডাহুকি গলা-ফাটাইয়া ডাকিতেছে। অন্ধকারে দিগ্বিহীন ঘোর যামিনী, তাহার মধ্যে অস্থির বিদ্যুৎ-মালার মুহুর্মুহুঃ বিকাশ। বিদ্যাপতি কহেন, হরি বিনা কেমন করিয়া দিনরাত যাপন করিব?

এই পদটিতে রাধার কৃষ্ণ ও বিদ্যাপতির হরি—দুইজনেই এক হইয়া গিয়াছেন। রাধার বিরহ-বেদনার মধ্য দিয়া কবির নিজের ঈশ্বর-বিহীন জীবন যাপনের ব্যর্থতা সকরুণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে সাধক যেমন স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া যান, রাধাও তেমনি অবশেষে অনুক্ষণ মাধবের নাম স্মরণ করিতে নিজেই মাধব বনিয়া গেল,—তাহার অহং-ভাবের বিনাশ ঘটিল।—

অনুখন মাধব মাধব সুমরই
সুন্দরি ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব সুভাবহি বিসরল
অপনে গুণ লুবুধাই॥

বিরহ-খণ্ডের পরে 'ভাবোল্লাস', কিন্তু ইহাও বিরহেরই অন্তর্গত। তবে, এই খণ্ডে রাধার বিরহ-বেদনার অনেকটা লাঘব হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল অবিরাম কৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, নিজের মনের মধ্যেই সে এখন কৃষ্ণকে পাইয়াছে,—তাহার প্রাণবল্লভ যে অচিরে তাহার হৃদয়-মন্দিরে শুভাগমন করিবেন, সে-বিশ্বাস তাহার এতদিনে জন্মিয়াছে। তাই এখন শয়নে স্বপনে প্রায়ই সে তাহার জীবন-সর্বস্বের মধুর মিলন লাভ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হয়।—

কি কহব রে সখি রজনিক কাজ।
সপনহি হেরলুঁ নাগররাজ॥
আজু সুভ নিশি কি পোহায়লুঁ হাম।
প্রাণ-পিয়াকে করলুঁ পরনাম॥

এখন আর বিচ্ছেদ-যাতনা নহে, এখন পুনর্মিলনের ভাবী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রাধা তাহার প্রাণকান্তের প্রতীক্ষা করে। প্রিয়তম আসিলে, তাঁহাকে কি দিয়া অভ্যর্থনা করিবে, কোথায় বসাইবে, কেমন করিয়া সেবাযত্ন করিবে,— ইত্যাদি কত মধুর কল্পনায় সে মত্ত হইয়া পড়ে।—

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে॥
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড় করব তাহে চিকুর বিছানে॥

রাধার এইরূপ সর্বাঙ্গ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্বর্ধনা, ভক্তের সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বর-সেবার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভক্ত যেরূপ ধ্যানের মধ্যে দেবতার দর্শন পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করে, রাধাও সেইরূপ স্বপ্নযোগে কৃষ্ণের মিলন পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠে।—

আজু রজনী হাম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
অজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

একটা অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ-লাভের ব্যঞ্জনা এই পদটিতে অভিব্যক্ত। "শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরহের তপস্যায় তাঁহার প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য অন্তর্লোকে লাভ করিয়াছেন—আর তাঁহার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা,

লোকভয়, বিরহের ভয় ও সর্ব্ববিধ লজ্জা-দ্বিধা জয় করিবার চেষ্টা বা মানসিক দ্বন্দ্ব যেন কিছুই নাই। তিনি যেন শান্ত সমাহিত চিদানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন মদনের পাঁচ বাণ লাখ বাণই হউক, আর লক্ষ কোকিলই ডাকুক, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না।"[১]

কৃষ্ণের মিলন-লাভ সম্বন্ধে রাধার সব সন্দেহ এখন দূর হইয়া গিয়াছে,—যেমন, কঠোর তপস্যার পরে সাধকের যাবতীয় সন্দেহের নিরসন হইলে, তাঁহার ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। রাধা এখন আর সামান্যা নায়িকা নহে, সে এখন অসাধারণ সাধিকা। বহির্জগতে কৃষ্ণের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ না ঘটিলেও, অন্তর্জগতে সে তাহার প্রাণেশ্বরের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া নিত্যই কত নূতন আনন্দে বিভোর হইয়া রহে।

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধু বোল শ্রবনহি শূনল
শ্রুতিপথ পরস ন ভেল॥
কত মধু জামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ল ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াএত
লাখে ন মিলিল এক॥

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক পদাবলী ব্যতীত আরো বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলি 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'

১, শ্রীকালিদাস রায়, 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য'।

বা 'প্রার্থনার পদ' নামে পরিচিত। এই পদগুলিতে একাধারে গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি স্থান পাইয়াছে। কবি সারাজীবন সযত্নে যে ধন-রত্ন আহরণ করিলেন, সে-সমস্তই তাঁহার পরিজনদের ভোগে লাগিল, দেব-সেবার জন্য কিছুই ব্যয়িত হয় নাই। অথচ মৃত্যুকালে পরিজনেরা কেহই তাঁহার সঙ্গে যাইবে না; শুধু কর্মফল লইয়াই তাঁহাকে পরলোকে যাইতে হইবে। এতকাল তিনি কোন সৎকর্ম করেন নাই; তাই, অন্তিমকালে তাঁহার অন্তর অনুশোচনায় জ্বলিয়া যাইতেছে। এই অসময়ে দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিতেও তাঁহার সাহসে কুলায় না, কারণ সন্ধ্যাবেলায় ভিক্ষুককে কেহ ভিক্ষা দেয় না। তাঁহার এই আসন্ন অন্তিমকালের কথা এতদিন তাঁহার মনে জাগে নাই। উত্তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দু পতিত হইলে, বালুকারাশি যেমন উহা নিঃশেষে শুষিয়া লয়, তাঁহার মনও তেমনি পুত্র-মিত্র-রমণী-পরিবৃত সংসার-মরুতে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরাধনা করিবার মত একটু মতিও অবশিষ্ট নাই। কাজেই তাঁহার পরিণাম-বিষয়ে নিরাশ হইয়া তিনি এক্ষণে জগৎ-ত্রাতা পরমেশ্বরের শরণাগত। তিল-তুলসী দিয়া তাঁহার জীবন দয়াময় মাধবের শ্রীচরণে তিনি সমর্পণ করিতেছেন,—উহার উপরে তাঁহার আর কোনই দাবী থাকিবে না। দোষ-গুণের বিচার করিলে, তাঁহার মধ্যে কোন গুণের লেশ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না;—তথাপি তাঁহার এই ভরসা যে, যেহেতু তিনি জগতের বাহিরে নহেন, "জগন্নাথ" অবশ্যই তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। "দীনবন্ধু"-র কাছে তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনা—কর্মফলবশতঃ তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বা মনুষ্য হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও, সকল জন্মেই যেন ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার মতি থাকে।—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

[৩] অনুবাদ-সাহিত্য

মৌলিক রচনার ন্যায় অনুবাদের দ্বারাও সাহিত্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। বিজাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বহুবিধ মূল্যবান রত্ন আহরণ করিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল সুসভ্যজাতির সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীক, লাটিন,

ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্যের বহু গ্রন্থ ইংরাজী-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, ও উহার ফলে ইংরাজী সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ অনুবাদের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কাব্য-পুরাণাদির বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদের দ্বারা এই বাঙ্গালা অনুবাদ-সাহিত্যের সূচনা হয়। পরে, পার্সী, আরবী, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষার বহু গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয়।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশগুলির তুলনায়, বাঙ্গালা দেশে আর্যজাতির আগমন ঘটে বহুকাল পরে—আনুমানিক খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে। "গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আর্যভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল এবং এই সময় হইতে ভাষায়, আচার-ব্যবহারে ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালাদেশ আর্য্যাবর্ত্তের একতম অংশে পরিণত হইতেছিল।"[১] তৎকালীন বাঙ্গালীদের সভ্যতার তুলনায় আর্য-সভ্যতা সমধিক উন্নত ছিল। তাই আর্যসভ্যতা অতি সহজেই বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত হয়। তখন বাঙ্গালী জাতি আর্যদের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির অনুকরণ করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাহার ফলে, বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রচলন ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থরচনার সূত্রপাত হয়। পাল-রাজাদের সময়ে [খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী] বাঙ্গালার বহু পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, যথা—সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত কাব্য', শ্রীধর ভট্টের 'ন্যায়কন্দলী,' জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' ইত্যাদি। সেন-রাজাদের সময়ে [খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী] বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, ও উহার ফলে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা ও সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ-রচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় 'দানসাগর', 'আচার সাগর', 'প্রতিষ্ঠা সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে সংস্কৃতভাষায় হলায়ুধ—'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব', সর্বানন্দ—'টীকাসর্ব্বস্ব' ও শ্রীধর—'সদুক্তি কর্ণামৃত' রচনা করেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোয়ী—'পবনদূত', উমাপতি ধর—'চন্দ্রচূড়-চরিত', গোবর্দ্ধন—'আর্য্যা সপ্তশতী' ও জয়দেব—'গীতগোবিন্দ', সংস্কৃতভাষায় রচনা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে তুর্কী ও পাঠানদের

১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

সহসা আক্রমণে বাঙ্গালাদেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। অবশেষে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলে, বৈদেশিক তুর্কী ও পাঠানের নির্মম তাণ্ডবলীলার অবসান ঘটে, ও বাঙ্গালার স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইবার সংস্কৃতভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সমাদর বাঙ্গালার সুধীবর্গ করিতে থাকেন, এবং কেহ কেহ বঙ্গভাষায় সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে কবি কৃত্তিবাস ওঝা সর্বাগ্রগণ্য।

বাঙ্গালার অনুবাদ-গ্রন্থগুলি সর্বাংশেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ নহে। মূলভাব বা প্রধান বিষয়টিকে ঠিক রাখিয়া, প্রায় অনুবাদকই মূলগ্রন্থটিকে নিজের মনের মত করিয়া বাঙ্গালাভাষায় রূপান্তরিত করেন। কোন কোন স্থলে মূলগ্রন্থের কতকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আবার কোথাও বা অনুবাদকের স্বকপোলকল্পিত কোন কোন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। কোন কোন অনুবাদ-গ্রন্থে মূলগ্রন্থের চরিত্রগুলি বাঙ্গালীর স্বভাবানুযায়ী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থে যাহা নাই, এমন অনেক বিষয় কোন কোন অনুবাদ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মোটকথা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যাহা কিছু বাঙ্গালা সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই বাঙ্গালীর উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে ; এবং তৎকারণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন-সাধন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনের দ্বারা আর্যভাষার রত্নরাজী আমাদের ঘরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রাচীনতম অনুবাদ-গ্রন্থের নিদর্শন হইতেছে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'। কৃত্তিবাসের পরে মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন, উহা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে অভিহিত। গৌড়ীয় যুগে এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ হয় নাই। কিন্তু এই গৌড়ীয় যুগ হইতে বর্তমান যুগ অবধি এইরূপ বঙ্গভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে।

(১) কৃত্তিবাস ওঝা

১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাস ওঝা জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের পিতা—বনমালী, পিতামহ—মুরারী,

প্রপিতামহ—গর্ভেশ্বর, এবং গর্ভেশ্বরের পিতা ছিলেন নরসিংহ ওঝা। নরসিংহ ছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত স্বর্ণগ্রামের রাজা দনুজের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন ছিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালায় আনাইয়াছিলেন, শ্রীহর্ষ ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। "আন্দাজ ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম ত্যাগপূর্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।"[১] নরসিংহ অতীব প্রতাপশালী ও অতিশয় ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা আজও 'ফুলিয়ার মুখটি' বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। এইরূপ মহদ্বংশে জন্মলাভ করিয়া কৃত্তিবাস গুণে, মানে, শীলে যাবতীয় ধনের অধিকারী হন। তিনি বাল্যকালে স্বগ্রামের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন ও সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। পাঠ-সমাপ্তির পর, তৎকালীন প্রথানুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের রাজসভায় উপস্থিত হন। তৎকালে রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, রাজা গণেশ তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দেন। কৃত্তিবাস নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

"রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান।"

রামায়ণ ব্যতীত আরো কতিপয় গ্রন্থ কৃত্তিবাস রচনা করেন, যথা—'যোগাদ্যার বন্দনা', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী'। কিন্তু একমাত্র রামায়ণই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই রামায়ণের দ্বারাই আর্যদিগের জীবনাদর্শ বাঙ্গালার সাহিত্যে ও সমাজে সর্বপ্রথম প্রকটিত হয়। এই হেতু বাঙ্গালার প্রতি পরিবারে ইহা এখনও সাদরে পঠিত হইয়া থাকে।

মহর্ষি বাল্মীকির রচিত সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ রচনা করিলেও, তিনি সর্বাংশে আদি-কবির অনুসরণ করেন নাই। মূল আখ্যানভাগ একরূপ হইলেও, উভয় রামায়ণের চরিত্র-সৃজনে ও ঘটনা-পরম্পরায় বিস্তর পার্থক্য আছে। এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ-মাত্র নহে, বরং উহা অপূর্ব মৌলিকতায় বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব মহাকাব্যে

১, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'জাতীয় সাহিত্য'।

পরিণত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে মনুষ্যরূপেই দেখিতে পাই ;—তিনি সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক বীরপুরুষ হইলেও, মানবীয় গুণে বিমণ্ডিত ; সাধারণ মনুষ্য হইতে তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবোপম,—কিন্তু কোন স্থলেই তিনি দেবতা নহেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিনি দশরথের পুত্র হইলেও, বিষ্ণুর অবতার, ভক্তের দেবতা, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা,—পৃথিবীর পাপ দূর করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। "তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি,স্থিতি, সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা প্রেমাশ্রু-পূর্ণ চক্ষু : ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন।" ১ রামচন্দ্রের ন্যায় সীতাদেবীও ভিন্নরূপে চিত্রিতা হইয়াছেন,—আর্য-বীরাঙ্গনা, বঙ্গ-ললনার বেশে দেখা দিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে সীতাকে আমরা মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্রের তেজস্বিনী পত্নীরূপে দেখিতে পাই, তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইলেও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য কোথাও বিসর্জন দেন নাই। লঙ্কাযুদ্ধের পর সীতা যখন রাম-সমক্ষে উপনীতা হইলেন রামচন্দ্র তাঁহাকে জানাইলেন, "তুমি রাবণের অঙ্কক্লিষ্টা, রাবণের দুষ্টচক্ষে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে।" তদুত্তরে সীতা বলিলেন, "তুমি আমাকে এই শ্রোত্র-কঠোর দুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ? এইভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে বলিলে শোভা পায়।" কৃত্তিবাসের সীতা এইরূপ স্থলে ভীতা বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে স্বীয় চরিত্রের নিষ্কলুষতা প্রমাণ করেন।—

বাল্মীকি-রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ

বাল্যকালে খেলিতাম বালিকা মিশালে।
স্পর্শ না করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥

কৃত্তিবাসের অঙ্কিত সীতা-চিত্রে বঙ্গপল্লীর ব্রীড়াময়ী কুলবধূর কোমল চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে,—বাল্মীকির বীর-রমণীর তেজস্বিতা তাহাতে আদৌ নাই।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে সমধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় লঙ্কাযুদ্ধের বর্ণনাতে। বাল্মীকি-রামায়ণে এই যুদ্ধ ভীষণ যুদ্ধরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। রাম-লক্ষ্মণ ও রাক্ষসবৃন্দের মধ্যে প্রবল বৈরীভাব, কাহারও প্রতি কাহারও বিন্দুমাত্র সহানু-

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

ভূতি নাই ; নিষ্ঠুর জিঘাংসায় উভয়পক্ষই তীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে নিরন্তর তৎপর। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই লঙ্কাযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছে। পাপীর নিধনে বিষ্ণু-অবতার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কিন্তু পাপীর কাতরতা ও ভক্তি দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত অপার করুণায় বিগলিত হইতেছে। রাক্ষসেরাও—রাবণের জয়োদ্দেশে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্ররূপী পরমেশ্বরকে দেখিয়া তাহাদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছে। ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া তাহারা রামচন্দ্রের চরণাশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। এমন কি, মহাবীর রাবণ পর্যন্ত রামের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া অনুতাপ করিতেছেন—

জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময়।
কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ এক দৃষ্টে রয়॥

দয়াময় শ্রীরামচন্দ্রও সমাগত শত্রুর সকরুণ স্তুতি শুনিয়া আশ্বাস দিতেছেন—

আশীর্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

"এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিকরেণু-রঞ্জিত সংকীর্তনভূমি বলিয়া মনে হয়, এবং তথাকার দামামারোল খোলবাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে।"[১] তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বাল্মীকির ঘোরতর রাম-রাবণ-যুদ্ধাপেক্ষা কৃত্তিবাসের পাপাচারী রাক্ষসগণের অনুতপ্ত হৃদয়ের সকাতর প্রার্থনা ও ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের অহেতুক অনুকম্পা বাঙ্গালীর নিকট সমধিক প্রিয়। মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত ও ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া নানা পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং এইরূপে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহাতে ঈশ্বর ব্যথিত হন,—"আমাদের অপরাধ তাঁহার বক্ষে শেলসম আঘাত দিতেছে, কারণ আমরা তাঁহার সন্তান।"[২] পাপাচরণ করিতে করিতে আমরা কালক্রমে পাপে নিমগ্ন হইয়া পড়ি এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের হৃদয়ে এরূপ কঠোর বেদনা দেই যে, অবশেষে আমরা তজ্জন্য অনুতাপ করি এবং ঈশ্বরের অনুবর্তী হইতে

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।
২, ঐ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'।

অভিলাষী হই। কিন্তু তখন আর "জীবনব্যাপী ব্যবসায় ও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি না, অথচ যাঁহার সঙ্গে চিরশত্রুতা করিয়াছি, তাঁহার চরণ ভিন্ন চক্ষু আর কিছু দেখিতে চায় না; তাঁহার অভয় বাণী ভিন্ন কর্ণ আর কিছু শুনিতে চায় না। রাক্ষস বীরগণের স্তবস্তুতি মনুষ্যজীবনের এই নিগূঢ় তথ্যের আভাস দিতেছে। সাময়িক যুদ্ধ-প্রসঙ্গ নহে, ইহা মানবাত্মার নিত্যকালের সংগ্রাম।"[১] মূল রামায়ণে কিন্তু এ সমস্ত কিছুই নাই। মহীরাবণের যুদ্ধ, হনুমানের সূর্য-আনয়ন, রাবণের প্রাসাদ হইতে সুকৌশলে হনুমানের ব্রহ্মাস্ত্র হরণ, মুমূর্ষু রাবণের নিকট রামচন্দ্রের রাজনীতি শ্রবণ—প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ সংস্কৃত রামায়ণে নাই। নানাবিধ পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী হইতে এইগুলি কৃত্তিবাস সঙ্কলিত করিয়া থাকিবেন।

মহর্ষির মহাকাব্যে কেবলমাত্র রাম-সীতার কথা স্থানলাভ করে নাই, সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজীর হৃদয়গ্রাহী চিত্রও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিপুল মহিমা কিন্তু কৃত্তিবাস-রামায়ণে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। চিত্রকূটের পুষ্পসম্ভার, দণ্ডকের নিবিড় অরণ্যানী, মন্দাকিনীর মনোহর কল্লোল, গোদাবরীর শ্যামল সিকতাভূমি, পঞ্চবটীর শতদল-শোভিত সরোবর—সেসব কিছুই কৃত্তিবাসের রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। বাল্মীকি-রামায়ণে মানবজীবন লইয়া গভীর দার্শনিকতা, জীবনযাপন বিষয়ে নানাবিধ শাস্ত্রীয় রীতি-নীতির আলোচনা, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—ইত্যাদি বহুবিধ দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ আছে। এই দুর্বোধ্য বিষয়গুলিও কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে গ্রহণ করেন নাই। উভয় মহাকাব্যের কাহিনী-বর্ণনা ও ঘটনাপুঞ্জের পৌর্বাপৌর্য বিষয়ে বহুস্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ দশরথের রাজত্ব ও তাঁহার সুসমৃদ্ধ রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা লইয়া বাল্মীকি-রামায়ণের আরম্ভ। তৎপরে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও রাম-লক্ষ্মণাদির জন্ম। কিন্তু কৃত্তিবাস এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে দশরথের বিবাহ, সাংসারিক ভোগবিলাসে তাঁহার আসক্তি, রাজ্যে শনির দৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অন্ধমুনির পুত্রবধ, সম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধ, কৈকেয়ীর সেবা ও বরলাভ প্রভৃতি আরো অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। মূল কাহিনী আরম্ভ করিবার পূর্বে রামায়ণ রচয়িতা

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'।

মহাকবি বাল্মীকির পারিবারিক জীবন বিষয়ে একটা অদ্ভুত কাহিনী তিনি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে কীর্তন করিয়াছেন। কবিত্বলাভের পূর্বে বাল্মীকি নাকি ছিলেন নির্মম নরঘাতক দস্যু 'রত্নাকর'। এই রত্নাকরের কথা কিন্তু বাল্মীকি উল্লেখ করেন নাই। সীতা বিসর্জনের পর শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লব-কুশের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। যজ্ঞাশ্ব বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিলে, সীতার গর্ভজাত সন্তান লব ও কুশ উহা ধরিয়া ফেলে ও অশ্বরক্ষী-সেনাবাহিনার সহিত তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই যুদ্ধে বালক বীরদ্বয় দুর্দমনীয় বীরত্ব প্রকাশ করে;—তাহাদের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নিহত হন এবং মহাবীর রামচন্দ্রও মূর্ছিত হইয়া পড়েন। শেষে মহর্ষি বাল্মীকির কৃপায় তাঁহারা পুনর্জীবন লাভ করেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস ইহা 'জৈমিনি ভারত' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু রামায়ণ নহে, রাম-সীতার কথা লইয়া যে সমুদয় পুরাণ, উপপুরাণ, লৌকিক কাহিনী প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তৎসমূহ হইতেও অনেক কাহিনী কৃত্তিবাস আহরণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার রচিত রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণের যথাযথ অনুবাদ নহে,—অক্ষরে অক্ষরে বাল্মীকির অনুসরণ নহে। বাল্মীকির মূল কাহিনীটি তিনি মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র —অনেক ঘটনা আগে-পিছে বসাইয়াছেন, অনেক কাহিনী বাদ দিয়াছেন, অনেক নূতন আখ্যান সংযুক্ত করিয়াছেন, অনেক উপাখ্যান সংক্ষেপে সারিয়াছেন, আবার কোন কোনটি অধিকতর বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রামায়ণ শুধুমাত্র অনুবাদ-গ্রন্থ নহে, বরং একটা নূতন সৃষ্টি, একটা অভিনব মহাকাব্য।

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে বিপুল বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস একা সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাপার অক্ষরে স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইবার পূর্বে বহুকাল ধরিয়া গায়কদের মুখে মুখে ও অপর লেখকদের দ্বারা পুনর্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে লিপিতে প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে বিভিন্ন গায়ক তাঁহার নিজের প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন কাহিনী ইহার সহিত যোগ করিয়া লইয়াছেন এবং নকল-কারকেরা তাঁহাদের নিজের মনোভাব দুই একস্থানে বসাইয়া দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের পরবর্তীকালে কবিচন্দ্র, জগৎরাম, অনন্ত,

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ

অদ্ভুতাচার্য প্রভৃতি আরো অনেকে বাঙ্গালাভাষায় রামায়ণ লেখেন। তাঁহাদের রামায়ণের কোন কোন অংশ কেহ কেহ কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। "প্রচলিত কৃত্তিবাসী-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটি খুব সম্ভব কৃত্তিবাস লেখেন নাই, কৃত্তিবাসের বর্ণনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অতি প্রাচীন পুঁথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' শীর্ষক কবিতাটিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা পাইয়াছি তরণীসেনের যুদ্ধের পালাটিও কবিচন্দ্রের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।"[১] যাহা হউক, কালক্রমে কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরিণামে, কৃত্তিবাসের নিজস্ব রচনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া আজ বড়ই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে আজ আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে কেবল কৃত্তিবাসের নহে, আরো বহু কবির রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। হিমালয়-শিখর হইতে যে গঙ্গাধারা শ্যামলবঙ্গের সমতল বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার পবিত্র জলরাশিতে যেরূপ কেবলমাত্র ভগীরথ-আনীত মন্দাকিনীর স্রোত রহিয়াছে, তাহা নহে, উহাতে যমুনা, চম্বল, গগরা প্রভৃতি শত নদীর শতধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসী-রামায়ণেও সেইরূপ কৃত্তিবাসের রচনার সহিত অপর বহু কবির রচনার সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ দুষ্প্রাপ্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া পরিচিত, এইরূপ বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে এত বেশী পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন্‌খানি প্রকৃত কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে যে সমুদয় পুঁথি আহৃত হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে,—তাহাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। "ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাইতেছি, তাহাতে বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ডীপূজা এই সমস্ত মূলগ্রন্থ-বহির্ভূত বিষয় দৃষ্ট হয় না।"[২]

কৃত্তিবাসী রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলির ন্যায়, বিভিন্ন প্রকাশকের দ্বারা মুদ্রিত রামায়ণগুলিতেও প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া

১, ২ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

যায়। একই রামায়ণের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিই ইহার মূল কারণ। এইরূপ বর্ণসঙ্কর-পাঠের একখানি প্রাচীন পুঁথি পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা পরিমার্জিত করাইয়া লইয়া, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে কৃত্তিবাসী-রামায়ণ মুদ্রিত করেন। ইহার অন্তর্গত নিম্নলিখিত চরণগুলি কোনও হস্তলিখিত রামায়ণে পাওয়া যায় না, এগুলি সম্ভবতঃ স্বয়ং জয়গোপালের রচনা।—

গোদাবরী নীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।

এইরূপে "কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতি সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই।"[১] শ্রীরামপুরের পরে বটতলার মোহনচাঁদ শীল কতিপয় পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণের পুনঃসংশোধন করাইয়া একটি সুসংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশ করেন। প্রচলিত রামায়ণ বলিতে সাধারণতঃ এই রামায়ণ-খানাকেই বুঝায়। মিশনারীদের রামায়ণে যেখানে আছে—

পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥

সেইস্থানে বটতলার রামায়ণে আছে—

বক্রনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত একখানি কৃত্তিবাসী-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতিশয় প্রাচীন ও

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

ইহার অন্তর্গত কাহিনীগুলিও প্রচলিত রামায়ণের কাহিনী হইতে বিভিন্ন। ইহার ভাষার নিদর্শন—

কোন কার্য্য লাগি তুমি কর অভিমান।
যে বর মাগিবে তুমি তাই দিব দান॥
এত শুনি কেকয়ী রাজার পাল্য আশ।
পূর্ব্ব কথা রাজার ঠাঞি করিল প্রকাশ॥

ঢাকা হইতে নলিনীকান্ত ভট্টশালী একখানি কৃত্তিবাসী-রামায়ণ প্রকাশ করেন। বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। ইহার ভাষার প্রাচীনতা লক্ষ্য করিলে, ইহাকে কৃত্তিবাসের নিজস্ব রচনা বলিয়া মনে হয়। ইহার ভাষার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

রাত্রিদিন রাঞা গিঞা পাইল তপোবন।
আশ্রম নিকটে বাসা কৈল ততক্ষণ॥
বুড়ী বেশ্যা বোলে এহন নহে গীদ নাচন।
বিভাণ্ডক শাপিঞা পাছে লএত জীবন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি আরো অনেকে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাদের মধ্যেও পরস্পর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। মোট কথা, কৃত্তিবাসের বিশুদ্ধ রামায়ণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কৃত্তিবাসের নামে যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভূয়সী প্রশংসা আমরা নিবেদন করি, বহু গায়ক, বহু নকল-কারক, বহু সংশোধক ও বহু সম্পাদক তাহার অংশীদার।

সেই সুদূর গৌড়ীয় যুগ হইতে অদ্যাবধি কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালার সর্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। একদা বাঙ্গালীর নানা উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে রামায়ণ-গান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রায় প্রতি গ্রামে অনেক গায়কে দল বাঁধিয়া বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহযোগে সুমধুর সুরে রামায়ণ গাহিত। এই গায়কদের মধ্যে বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাধর্মের লোকই থাকিত। রামায়ণের কাহিনী গাহিবার সময় তাহারা নিজ নিজ ধর্মভাব উহার ভিতরে ঢুকাইয়া দিত। এই হেতু প্রচলিত রামায়ণে বাঙ্গালার বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রঘুরাজার দানশীলতা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

অন্ন ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাজা জল পান করে॥

ইহা আমাদিগকে সুবিখ্যাত বৌদ্ধ নৃপতি হর্ষবর্ধনের যথাসর্বস্ব দানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাবণের বিরুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র মহাবিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেও, রাবণকে বধ করিতে তিনি সক্ষম হইলেন না; কারণ, স্বয়ং আদ্যাশক্তি দশাননকে রক্ষা করিতেছিলেন। তখন রামচন্দ্র নিরুপায় হইয়া অকালে শ্রীদুর্গাদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। মূল রামায়ণে কিন্তু এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই;—ইহা কোন শাক্ত ধর্মাবলম্বী গায়কের দ্বারা বাঙ্গালা রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সকল ধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব রামায়ণে সমধিক পরিমাণে পড়িয়াছে। লঙ্কাযুদ্ধের প্রায় সর্বাংশ বৈষ্ণবীয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ। রাবণ, বিভীষণ, বীরবাহু, তরণীসেন, মন্দোদরী প্রভৃতি রক্ষোরাজ-বংশের প্রায় সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্য নহেন, তিনি নররূপী পরমেশ্বর বিষ্ণু; তাই তাঁহার হাতে মৃত্যু হইলে যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। বিভীষণ ও তৎপুত্র তরণীসেনের চরিত্রে এই রামভক্তির বড় বেশী বাড়াবাড়ি দেখা যায়। লঙ্কার রক্তপ্লাবিত রণক্ষেত্রে তরুণ বীর তরণীসেন রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাঙ্গে রাম-নাম, রথের সর্বত্র রাম-নাম, রথের চূড়ায় রাম-নামের পতাকা। যাহা হউক, এই রামভক্ত বীরপুঙ্গবটি মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া, তাঁহার পিতা বিভীষণ পুত্রের বৈকুণ্ঠলাভ বিষয়ে আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ও ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন। রামভক্তির এমনি মহিমা যে, পিতাও অনায়াসে পুত্রবধের সহায়তা করেন। আর রামভক্তের এমনি শক্তি যে, তরণীসেনের কাটামুণ্ডও রাম-নাম উচ্চারণ করে। পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত পুঁথিগুলিতে এই জাতীয় ভক্তিমূলক কাহিনীগুলির উল্লেখ নাই; পশ্চিমবঙ্গের পুঁথিগুলিতেই ইহাদের প্রচুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গেই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রবল প্লাবন বহিয়া যায়;—তাই ঐ অঞ্চলের রামায়ণ-গুলিতে সেই প্লাবনের পলিমাটি পড়ে। "চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের বান ডাকিয়াছিল, পরবর্তীকালের রামায়ণসমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান।······তাই পরবর্তীকালের কৃত্তিবাসে কি বীর, কি করুণ, সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। ···এ

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিবিধ ধর্মের প্রভাব

সমস্তই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"[১] কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রায় একশত বৎসর পরে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। কাজেই কৃত্তিবাসের কল্পনায় এইরূপ বৈষ্ণবীয় দীনতা না আসিবারই কথা। কিন্তু চৈতন্যের পূর্ববর্তী কোন হস্তলিখিত রামায়ণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই, তাই একথা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, অধ্যাত্ম-রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে এবং রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মন্দোদরী প্রভৃতি বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। সনৎকুমার ঋষির মুখে রাবণ শুনিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইলে বৈকুণ্ঠলাভ হয়। তাই তিনি রামরূপী বিষ্ণুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার শুভেচ্ছা লইযাই জানকীকে হরণ করেন। হয়তো কৃত্তিবাস রাবণাদির চরিত্রাঙ্কনে মূল রামায়ণ পরিত্যাগ করিয়া এই অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। অবশ্য তাঁহার পরবর্তী কোন পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারাও এইরূপ বিকৃতি সাধন অসম্ভব নহে। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি না পাওয়া পর্যন্ত, এতদ্বিষয়ে কোনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসী-রামায়ণের বিকৃতি-সাধন ও প্রক্ষেপ বিষয়ে যেরূপ সুদীর্ঘ সমালোচনা আমরা করিলাম, তাহা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান করা যায় যে, ইহা বহুভাবে পরিবর্তিত হইয়া অধুনা বিচিত্র আকারে বঙ্গসাহিত্যে বিরাজ করিতেছে। কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণের অভাববশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের যদি কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, প্রচলিত কৃত্তিবাসী-রামায়ণের দ্বারা উহা তদপেক্ষা শতগুণে লাভবান হইয়াছে। এই বিকৃত রামায়ণের মাধ্যমেই বাঙ্গালার নিরক্ষর জনসাধারণ আর্যধর্ম ও হিন্দু জীবনাদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়। হিন্দুজাতির ধর্ম-কর্ম সমস্তই দুর্বোধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সুরক্ষিত, সাধারণ লোকের উহাতে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তদুপরি ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের সংস্কৃত-শাস্ত্রাদির অনুশীলন করাও সেকালে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং বাঙ্গালাদেশের সাধারণ হিন্দুদের পক্ষে তাহাদের জীবনের আদর্শ

বাঙ্গালীর উপরে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের প্রভাব

১, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'জাতীয় সাহিত্য'।

জানিবার কোন উপায় ছিল না। তথাপি বাঙ্গালীজাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শান্তিপূর্ণ ও গৌরবময় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। হিন্দুর আদর্শ হইতে বাঙ্গালীজাতি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। বর্তমানকালেও বঙ্গপল্লীর হিন্দু-পরিবারে যে গভীর প্রেম, নিবিড় স্নেহ, প্রগাঢ় সহানুভূতি, কঠোর আত্মত্যাগ, অক্ষয় সতীত্ব ও ঐকান্তিক ঈশ্বরভক্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা পৃথিবীর বহুস্থানেই দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালীজাতির পক্ষে এইরূপ মহজ্জীবন যাপন করা কিরূপে সম্ভব হইল? কোন্ শক্তি বা শাস্ত্র-বলে বাঙ্গালার অশিক্ষিত নরনারী সক্ষম স্বামী, পতিপ্রাণা পত্নী, সহৃদয় ভ্রাতা, স্নেহশীলা ভগ্নী, পিতৃভক্ত পুত্র ও সুশীলা কন্যারূপে আদর্শ জীবন যাপনে সক্ষম হইল? এই অটল শক্তি প্রচলিত রামায়ণ হইতেই বাঙ্গালী অর্জন করে। কৃত্তিবাসের বহুকাল পরে কাশীরাম দাসের রচিত 'মহাভারত' হইতেও বঙ্গবাসী হিন্দুর আদর্শ জীবন সম্বন্ধে বহু শিক্ষা পাইয়াছে। এই দুইখানি মহাকাব্য বাঙ্গালীর জীবনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করিয়াছে, সেরূপ আর কোন কিছুরই দ্বারা সম্ভব হয় নাই। রামায়ণ-মহাভারত বঙ্গীয় সমাজের সম্মুখে রাম-যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পুরুষ ও সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় নারীর যে উজ্জ্বল চিত্র একদা প্রকটিত করিয়া ধরিয়াছিল, দুঃসহ দুঃখ-দৈন্য, নিরন্তর কলহ-বিবাদ, চিরন্তন অবিচার-অত্যাচার ও অনন্ত রোগ-শোকের ভিতর দিয়াও বাঙ্গালী সেই আদর্শকে অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রামচন্দ্রের অকাল বনবাসে বাঙ্গালী অচিন্তিত দুঃখকে সহজে বরণ করিতে শিখিয়াছে; সীতার দুঃখময় জীবন-কাহিনী-শ্রবণে বঙ্গবধূ অপার দুঃখেও পতির অনুগত রহিয়াছে, লক্ষ্মণের দৃষ্টান্তে বঙ্গগৃহের ভ্রাতা ভয়ঙ্কর বিপদেও ভ্রাতার সাহায্য করিয়াছে, রাবণের অনুতাপে পাপ-দগ্ধ বাঙ্গালী ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কাজেই, প্রচলিত রামায়ণের প্রচার বন্ধ করিয়া কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ প্রচলিত করিতে পারিলে, ঐতিহাসিকবৃন্দ লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণের তাহাতে প্রয়োজন নাই। বিকৃত ও পরিবর্ধিত কৃত্তিবাসী-রামায়ণই তাহাদের হৃদয়ের সামগ্রী। শত দুঃখ-দৈন্যে, দুঃসহ তাপ-পরিতাপে, অবস্থার বিপর্যয়ে—বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে বাঙ্গালীর বিক্ষুব্ধচিত্তে এই প্রচলিত রামায়ণ অপার শান্তি ঢালিয়া দিয়াছে। কৃত্তিবাসী-রামায়ণ বাঙ্গালীর জীবন যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার তুলনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

(২) মালাধর বসু

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম ইন্দুমতী। তাঁহারা জাতিতে কায়স্থ। গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহ তাঁহাকে "গুণরাজখান" উপাধি দান করেন। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন, ও ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত হয়।—

তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন॥

এই গ্রন্থমধ্যে তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন—

বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥

* * * *

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

* * * *

কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন॥

সংস্কৃতভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধদ্বয় প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া মালাধর বসু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। ইহা ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে; মূলগ্রন্থের কোন কোন বিষয় ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে ও বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনমত বহু বিষয় সংগৃহীত হইয়া ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। অনেক স্থানে কবি মহাভারত ও হরিবংশের অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তিনি ভাগবতের কাহিনী স্বীয় অভিপ্রায়-অনুসারে ঈষৎ পরিবর্ধিত করিয়াছেন। "বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইতেছিলেন তখন যে কোন শৃগালী তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল একথা ভাগবতে নাই। উহা ভবিষ্যপুরাণের বশিষ্ঠ-দিলীপ

সংবাদে জন্মাষ্টমী ব্রতকথায় আছে।"[১] ভাগবতে আছে যে, কংস দেবকীর পুত্রগণকে জন্মিবামাত্র একে একে মারিয়া ফেলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে—"দৈবকীর ছয় পুত্র মারিল একুবারে।" বস্তুতঃ, মালাধর ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ করেন নাই,—তাঁহার উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ তাহা ছিল না, তিনি মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত অঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—ভাগবতকে উহার পটভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারই যে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল, কাব্যের নাম হইতেও তাহা অনুমান করা যায়। ইহা সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতের অনুবাদ হইলেও, কবি ইহাকে 'ভাগবত' নামে অভিহিত করেন নাই, নাম দিয়াছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। "শ্রীকৃষ্ণবিজয় অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় চরিতাখ্যান।··· ···(এই) গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।"[২] মূল বিষয় অনুসরণ করিবার নিমিত্ত মালাধর ভাগবতের অনেক অবান্তর বিষয় পরিহার করিয়াছেন, অনেক স্থলে স্তবস্তুতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন, জটিল দার্শনিকতত্ত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন,—"এমন কি ভাগবতের বহু কবিত্বপূর্ণ রসঘন বর্ণনাও তিনি বর্জন করিয়াছেন।···তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে কাব্যরচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কৃত্তিবাস যেমন রামের জীবন-কথা লইয়া অনেকটা স্বাধীনভাবে রামায়ণ লিখিয়াছেন, মালাধরও তেমনি কৃষ্ণের চরিত-কথা লইয়া 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখিয়াছেন।"[৩]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

"যতদূর জানা যায়, বাংলাভাষায় ভাগবতের ইহাই সর্বপ্রথম অনুবাদ। ইহার পূর্বে কেহ বাংলায় ভাগবত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই।"[৪] এককালে ইহার খুবই সমাদর হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে উক্ত আছে যে, চৈতন্যদেব এই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। মালাধরের জন্মভূমি বলিয়া কুলীন গ্রামের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। ঐ গ্রামের অধিবাসী রামানন্দ বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া সবিনয়ে বলিয়াছিলেন—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥

---

১ । ২, ৩, ৪, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥

উদ্ধৃতাংশের তৃতীয় চরণটি শ্রীকৃষ্ণবিজয়-কাব্যের অন্তর্গত চতুর্থ চরণ। মালাধরের ন্যায় মহাপ্রভুরও ইষ্টদেবতা—শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য দেবতা। এই শ্রীকৃষ্ণের কথা গুণরাজখান চৈতন্যের পূর্বে বাঙ্গালাভাষায় প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। "এদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই অনুভূত হইতেছিল এবং মালাধর ও হরিদাসকে চৈতন্যদেবের অগ্রদূত বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না।"[১] জনসাধারণের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই যে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইয়াছিল, তাহা কবি নিজেও তাঁহার কাব্য-মধ্যে বলিয়াছেন—

সংসার সাগর জদি করিতে তারণ।
ভাগবত অবতরি হিতের কারণ ॥
ভাগবত-অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া ॥
সুনহে পণ্ডীত লোক এক চিত্ত মনে।
কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে ॥
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে ॥

মালাধরের পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব দৃষ্ট হয়। জগন্নাথ দাস, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, দ্বিজ মাধবদাস প্রভৃতি প্রায় কুড়িজন লেখকের শ্রীকৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই অল্প-বিস্তর মালাধরের অনুসরণ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণচরিতরূপে গ্রহণ করা যায়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ ও জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ ও নন্দবিদায় পর্যন্ত ঘটনাপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুরূপ।

১, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

"মালাধর বসু প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনভঙ্গী দীন-চণ্ডীদাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[১]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা নিজের মনের মত করিয়া সহজ ভাষায় বলিয়াছেন। ভাগবতের অনুসরণ করিলেও, তাঁহার নিজস্ব মৌলিকতা কোথাও মলিন হয় নাই। কৃষ্ণলীলাকে তিনি "বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখি, শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ভাত খাইতেছেন, মথুরায় গুয়া, জলপাই, কামরাঙ্গার গাছ আছে, দুয়ারে দুয়ারে গুয়া, নারিকেল শোভা পাইতেছে।"[২] রাসলীলা-বর্ণনায় তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ যখন অন্ধকার রজনীতে নিবিড় কানন-মধ্যে গিয়া উপনীত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পতি-পুত্রের সেবা করিতে উপদেশ দেন। উহাতে গোপীরা বড়ই মর্মাহত হয়।—

এতেক বিপ্রিয় যবে গোবিন্দ বলিল।
হেট মাথা করি গোপী কাঁদিতে লাগিল॥
স্তন বহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে।
বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে॥
কি করিব কি বলিব অনুমান করি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি বসে ধীরি ধীরি॥

এইস্থানে গোপীদের আর্তি অতি সরল ভাষায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভাগিনী দৈবকীর ক্রোড় হইতে নবজাত শিশুকন্যাকে কাড়িয়া লইয়া বধ করিবার জন্য পাপিষ্ঠ কংস যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন দৈবকীর শোকার্ত অবস্থা-বর্ণনায় কবি নিবিড় করুণ রস সৃষ্টি করিয়াছেন।—

ভাই ভাই বলি দেবি কান্দে লোটাইয়া।
চণ্ডালে ত হেন কর্ম্ম না করে আসিয়া॥
মারিলে ত ছয় পুত্র চাঁদের সমান।
একেবারে মারিলে না করিলে আন॥
না থুইলে বংশ মোর পৃথিবী ভিতরে।
ভাই হৈয়া কাল কেন হইলে আমারে॥

১, ২, শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

মোর পুত্র মারিবারে নারদ মুনি বৈল।
মারিলে ত ছয় পুত্র কীছু না বলিল॥
এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সক্র নও।
না মারিহ এই কন্যা সুন কংসরাএ॥
এতেক বলিয়া দেবি পড়িলা চরণে।
কান্দিতে কান্দিতে বলে কন্যা দেহ দানে॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় কবি স্থানে স্থানে অলৌকিকতার বিবরণ দিতে গিয়া প্রচুর অদ্ভুত রসের পরিবেশন করিয়াছেন। একদিন বাল-গোপাল খই-মুড়ি ফেলিয়া মাটি খাইতে লাগিলেন, ইহাতে জননী যশোদা ব্যস্ত হইয়া শিশুর মুখের মাটি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নন্দদুলাল কহিলেন, তিনি মাটি খান নাই, যশোদা ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে পাবেন। তখন—

হাসিযা জসোদা করে মুখ নিরক্ষণ
মাটি নাহি তথা দেখে সকল ভুবন।
সর্গ মর্ত্ত পাতাল জতেক দেবগণ॥
চন্দ্রসূর্য্য দিবারাত্র সাগর পর্ব্বত।
সাগর পর্ব্বত নদী দেখি ত্রিজগত॥
অদ্ভুত দেখিয়া জসোদা মনে মনে গণি।
কিবা দেখি কোথা আছি কীছুই না জানি॥

কিন্তু সমগ্র কাব্য-মধ্যে বীররসেরই প্রাধান্য। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনেক স্থলেই যুদ্ধের বর্ণনাই বেশী। প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অবলীলাক্রমে পরাভূত করিবার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে।"[১] শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব-বর্ণনায় কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কংসানুচর অরিষ্ট-দানব যখন প্রচণ্ড বৃষের রূপ ধরিয়া বৃন্দাবন ধ্বংস করিবার জন্য গোকুলে প্রবেশ করে, তখন বালক-কৃষ্ণ আশ্চর্য বীরত্বের সহিত তাহাকে নিহত করেন।—

মালসাট মারি কৃষ্ণ চলিলা ধাইয়া॥
দুই হাতে দুই শ্রীঙ্গ লাফ দিয়া ধরি।

১, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

ধরিয়া বুলাএ পাক চাক ভাওরি ॥
ছুড়িয়া পেলিল তারে পড়ে হাত সাতে।
পুনরপি সিংহ সারি আইসে মারিতে ॥
ক্রোধে সিংহ উপাড়িয়া সিংহের বাড়ি মারি।
পড়িয়া বাড়ির ঘায় জায় গড়াগড়ি ॥
পুনরপি উঠি ধায় কৃষ্ণ মারিবারে।
লেঞ্জে ধরি গোবিন্দাই আছাড়িল তারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য বর্ণনাতেই কবি সমধিক যত্নশীল। এই হেতু ইহাতে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবত্তা ও ঐশ্বর্যের বর্ণনার একটা যুগগত প্রয়োজন মালাধর বসু সচেতনভাবেই হয়ত অনুভব করিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে তুর্কী-আক্রমণে বাঙ্গালাদেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে—সকল বাঙ্গালীর মনেই একটা প্রবল ভীতি। এই আতঙ্কগ্রস্ত জাতির উদ্ধার হইবে কিসে?—এই বিহ্বল জাতি পুনরায় সংবিৎ ফিরিয়া পাইবে কোন্ পথে? পৌরাণিক বীরচরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে মালাধর এই কার্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাই 'লৌকিক' প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ ইহাতে প্রায় দেড়শত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সর্গ, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে ইহা বিভক্ত নহে। ইহা একদা গায়কবৃন্দের দ্বারা গীত হইত, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারা ইহার মধ্যে কিছুটা প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে। ইহার কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে নৌকালীলা, দানলীলা ও ভারখণ্ডের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ একটি সুপ্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। উহাতে দানলীলাদি অপৌরাণিক বিষয়ের স্থান নাই।

[৪] মঙ্গল-সাহিত্য

বঙ্গদেশ আর্যজাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইবার পূর্বে ইহার আদিম অধিবাসীদের দ্বারা একটা স্বতন্ত্র বঙ্গীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালার একটা বিশিষ্ট ধর্মেরও উদ্ভব হয়। কিন্তু সেই ধর্মের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার আজ আর

কোন উপায় নাই। কারণ, আর্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে উহা নানাযুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবে, বাঙ্গালাদেশের পূজা-পার্বণ, ব্রত-কথা, দেবদেবী-প্রতিমা প্রভৃতির মধ্যে উহার কথঞ্চিৎ পরিচয় এখনো পাওয়া যায়। উহা হইতে অনুমান হয়, ঈশ্বর-ভক্তিই সেই আদিম ধর্মের ভিত্তিভূমি। সংসারের যাবতীয় কর্মের মধ্যে বাঙ্গালীর নিকট ঈশ্বরাধনা বা ঈশ্বরের কৃপালাভের চেষ্টা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ঈশ্বরকে পাইলেই, সব পাওয়া যায়। ধনৈশ্বর্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিষ্ঠা-প্রাধান্য—সমস্তই ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির করতলগত। এই ঈশ্বর-প্রীতি-লাভের নিমিত্ত ভক্ত তাহার চরিত্রের পবিত্রতা, হৃদয়ের নির্মলতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, কর্মের সততা ও মনের সংযম প্রভৃতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। ভক্তের এইরূপ দুশ্চর ধর্ম-সাধনা ও তাহার প্রতি দেবতার অপার কৃপার কথা লইয়া সুপ্রাচীন বঙ্গীয় সমাজে নানাবিধ কাহিনী সম্ভবতঃ রচিত হয়। এইরূপ কাহিনীমূলক কাব্য জনসমাজে 'মঙ্গল-কাব্য' নামে পরিচিত। মনসা-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি বহু মঙ্গল-কাব্য প্রাচীন যুগে রচিত হয়। এই মঙ্গল-কাব্যগুলি একদা বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রসহযোগে বহু কণ্ঠে গীত হইত। এই গীত শ্রবণ করিলে, শ্রোতার রোগ, শোক, দারিদ্র্য প্রভৃতি দূর হয় ও ধন-জন-সুখ-সম্পদাদি লাভ হয়। শ্রোতার এইরূপ মঙ্গল হয় বলিয়া এই কাব্যগুলি 'মঙ্গলকাব্য'-নামে অভিহিত। মনসা-মঙ্গল আজিকালিও উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গে ইহা 'বিষহরির পালা' নামে পরিচিত। এই মঙ্গল-কাব্যগুলি পাঠ করিলে, বাঙ্গালার নিজস্ব ধর্ম-সাধনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন যুগে রচিত মঙ্গল-কাব্যসমূহের পরস্পর তুলনা করিলে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে বাঙ্গালার এই ধর্মমত কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত এই লৌকিক ধর্মের কিরূপ অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে তাহার ধর্মমত গড়িয়া উঠে। যখন মানবের জ্ঞান-বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ হয় নাই, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিতে মানুষ শিখে নাই, তখন প্রকৃতির অনেক কার্যই মনুষ্যের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইয়াছে। অগ্নির দ্বারা দহন হইতেছে, মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে, সূর্যের উদয়ে দশদিক আলোকিত হইতেছে—ইত্যাদি প্রাকৃতিক

ঘটনাবলী তাহার চক্ষে রহস্যময় মনে হইয়াছে, ও উহাদের অন্তরালে নানারূপ দেবতার অধিষ্ঠান সে কল্পনা করিয়াছে। এইরূপে মেঘের দেবতা ইন্দ্র, জলের দেবতা বরুণ, অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর প্রভৃতি বহু দেবদেবীর উদ্ভব ও তাঁহাদের পূজার্চনা প্রবর্তিত হয়। বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীরাও তাহাদের সহজ বুদ্ধি ও সরল বিশ্বাসের দ্বারা এইরূপ বহু দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে শিব, মনসা, চণ্ডী ও ধর্মদেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগকে এক কথায় 'লৌকিক দেবতা' বলে।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই লৌকিক দেবতাদের মধ্যে শিব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এই শিব-সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র সুপ্রাচীন কাব্য এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। তবে, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক মঙ্গল-কাব্যের প্রারম্ভে শিবের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আমাদের অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। "লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে শিব সর্বপ্রাচীন, অবশ্য এই শিব পৌরাণিক শিব নহেন, এই শিব বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি, এক সম্পূর্ণ আভিজাত্যহীন বাঙ্গালার কৃষকের স্থানীয় দেবতা।"[১] মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-কাব্য-বর্ণিত ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বর শিব ইনি নহেন, ইনি ত্রিশূল ভাঙ্গাইয়া লাঙ্গল তৈয়ার করেন, সারাদিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া শস্য রোপণ করেন এবং ক্ষেত্রস্থ শস্যরাজী রক্ষার্থে অগ্নি জ্বালিয়া উহার ধূম্ররাশির দ্বারা পতঙ্গ প্রভৃতি তাড়াইয়া দেন। কামের দেবতা মদনকে ভস্ম করা তো দূরের কথা, কোন যুবতী নারী দেখিলেই এই লৌকিক শিব—স্বল্পবুদ্ধি গ্রাম্য কৃষকের মত—কাম-লালসায় জর্জরিত হইয়া পড়েন। কিন্তু বাঙ্গালার গ্রাম্য কবির এই স্থূল সৃষ্টি—এই লৌকিক শিব পরবর্তীকালে পৌরাণিক শিবের প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া যান। "সেনরাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই দেশীয় সমাজের উপর যখন হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল তখনই বাঙ্গালার সমাজে কৃষক শিবের পরিবর্তে পৌরাণিক শিবের শান্ত সমাধি-মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল—তখন তিনি বিশেষ হইতে নির্বিশেষে উন্নীত হইয়া গেলেন।"[২]

কিন্তু সাংসারিক লোকের পক্ষে এইরূপ শান্ত সমাহিত নির্বিকার দেবতার

১, ২, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস'।

বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে দেবতা ভক্তের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন, ভক্তের উন্নতির জন্য কিছুই করেন না, সর্বদাই ধ্যানস্থ রহেন, তাঁহার পূজা করিয়া মানুষের কি উপকার হইবে? ববং যে দেবতা বিপদে-আপদে ভক্তের সহায়, ভক্তের মঙ্গল সাধনেব নিমিত্ত সর্বদা তৎপব, যাঁহার কৃপায় ভক্ত যাবতীষ বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হইবার শক্তি লাভ করে,—তিনিই সাধারণ মানুষেব আরাধ্য ইষ্ট দেবতা। তাই নির্বিকার শিবের স্থান শীঘ্রই ভক্তবৎসলা শক্তিময়ী দেবী চণ্ডী ও মনসা আসিযা অধিকার কবেন। এইরূপে শিবোপাসনার পবিবর্তে শক্তি-পূজা বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয। মনসা ও চণ্ডী—এই দুই লৌকিক দেবীর মহিমা লইযা প্রাচীন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত।

যাবতীয় মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার প্রচারও সর্বাপেক্ষা সমধিক। বাঙ্গালাব প্রায় সকল অঞ্চলেই মনসা-মঙ্গলেব প্রাচীন পুঁথি পাওযা যায়। মনসা সর্পকুলেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্প-পূজা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এখনো প্রচলিত আছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভাবতে যে-সব দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা বাস কবে, তাহাদেব মধ্যে এই সর্প-পূজাব সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। "অতএব মনে হয়, সর্প-পূজা দ্রাবিড সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল, ইহাব ব্যাপক প্রভাববশতঃ পরবর্তীকালে আর্যসমাজও ইহা নিজ সভ্যতার মধ্যে বহুলাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইযাছে।"[১] মনসাদেবী যে অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছেন, তাহা মনসা-মঙ্গলের কাহিনী হইতেও সহজে অনুমান করা যায। আর্য শিবোপাসক চাঁদসদাগব অনার্য মনসাদেবীর পূজা কবিতে সহজে স্বীকৃত হন নাই, মনসা-দেবীকেও তাঁহার পূজা-প্রচলনেব নিমিত্ত বহু বেগ পাইতে হয। যাহা হউক, "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীব পূর্বেই মনসা-পূজা এই দেশেব সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।"[২] মনসা-পূজাব অনতিকাল পবে চণ্ডীদেবীর পূজা বঙ্গীয সমাজে প্রচলিত হয়। এই চণ্ডীদেবীও অনার্যসমাজে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হন, কিন্তু কালক্রমে পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবে ইনি পরিপুষ্ট হইয়া উঠেন। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে দৃষ্ট হয, "গোহিংসক" রাঢ় ব্যাধ-সন্তান কালকেতু তাঁহার প্রথম পূজারী, কিন্তু পরম শৈব ধনপতি সদাগর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী

১, ২, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস'।

খুল্লনাকে এই "ডাকিনী দেবতা"র পূজা করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। অতএব, অনার্য চণ্ডীদেবী যে ধীরে ধীরে আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, কাব্যান্তর্গত কাহিনী হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার পূর্ববর্তী মনসামঙ্গল-রচয়িতা কাণা হরিদত্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

কাণা হরিদত্ত

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।

"সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।"[১] ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাণিক দত্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

মাণিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পথ-পরিচয়॥

কিন্তু এই মাণিক দত্ত কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক, এইরূপে পরবর্তীকালের কবিদের উক্তি হইতে তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, "খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ (age of origin)......প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গল-কাব্যের সৃজন যুগ (age of creation)। এই যুগেই প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস; চণ্ডীমঙ্গলকার মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম; ধর্মমঙ্গলকার মাণিক গাঙ্গুলি, খেলারাম প্রভৃতি আবির্ভূত হন।"[২]

গৌড়ীয় যুগে শুধু মনসামঙ্গল রচিত হয়, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি অন্য কোন মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় যুগে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সমকালে বিপ্রদাস পিপিলাই একটি মনসামঙ্গল রচনা করেন, কিন্তু বিজয়গুপ্তের ন্যায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত

১, ২, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস'।

কাব্যের খণ্ডিতাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

(১) বিজয়গুপ্ত

পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয়গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী। তিনি মনসাদেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর মূর্তি, মন্দির ও দীঘি অদ্যাপি ফুল্লশ্রী গ্রামে বর্তমান আছে। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মনসামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। ঐ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে সুলতান হুসেন শাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার কাব্য-মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

মনসাদেবীর জন্ম পদ্মবনে হয় বলিয়া তাঁহার আর এক নাম পদ্মা। এই কারণে মনসা-মঙ্গল 'পদ্মাপুরাণ' নামেও অভিহিত। মনসাদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে অতি প্রাচীনকালেই বাঙ্গালাদেশে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া, বিজয়গুপ্ত তাঁহার বিরাট কাব্য রচনা করেন। মনসা-মঙ্গলের কাহিনী প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শিবদুর্গার কাহিনী, মনসার জন্ম, চণ্ডীর সহিত মনসার বিবাদ ইত্যাদি; দ্বিতীয়ভাগে রাখালবৃন্দ কর্তৃক সর্বপ্রথম মনসার পূজা ও তৎপরে হাসন-হোসেন প্রভৃতি মুসলমানদের ভীতিবশতঃ মনসার পূজা; এবং তৃতীয়ভাগে চাঁদসদাগরের দ্বারা পূজিত হইবার জন্য মনসাদেবীর নিষ্ঠুর নির্মম লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই তৃতীয় ভাগই কাব্যের মূল আখ্যায়িকা। এই তৃতীয় ভাগেই চাঁদসদাগরের অনমিত পৌরুষ, বেহুলার দুষ্কর তপস্যা, সনকার মাতৃহৃদয়ের নিবিড় বেদনা প্রভৃতি মহদ্বিষয় সকরুণসুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

পদ্মাপুরাণ

কাব্যের প্রারম্ভে 'স্বপ্নাধ্যায় পালা'য় বিজয়গুপ্ত তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিবার একটা অলৌকিক কারণ দর্শাইয়াছেন। তাঁহার নিদ্রাকালে স্বয়ং মনসাদেবী স্বপ্নযোগে তাঁহার শিয়রে আসিয়া তাঁহাকে মনসা-মঙ্গল রচনা করিতে মিনতি জানান। তৎপূর্বে হরিদত্ত মনসার যে গীত রচনা করেন, তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।—

হরি দত্তের যত গীত লোপ পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাইক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয কেহ মিছে লাঁফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥
মোর বোলে পুত্র তুমি হও অবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত॥

স্বপ্নাধ্যায পালার পর 'পদ্মাবতীর জন্ম পালা'। পৃথিবীর "দুর্লভ স্থান" বারাণসীধামে বিশ্বনাথ শিব এক বিশাল পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বীয পত্নী চণ্ডিকাদেবী সহ তথায় পরম সুখে বাস করেন। চণ্ডিকাদেবী ও স্বর্গ-নদীর দক্ষিণ কূলে একটি মনোহর পুষ্পকানন রচনা করেন। কিন্তু এই পুষ্পবাটীর কথা শিব প্রথমে জানিতেন না। পরে দেবর্ষি নারদ মুনির মুখে এই পুষ্পোদ্যানের কথা শুনিয়া তিনি একদিন বসন্তকালে তথায় গমন করেন। লবঙ্গ, মালতী, মাধবী, কেতকী প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পের অপরূপ সৌন্দর্য ও সৌরভে সেই কুসুমকানন বড়ই মনোমুগ্ধকর। প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজীতে ভ্রমরকুল গুঞ্জন করিয়া নাচিতেছে, শ্যামল পত্রাবলীর অন্তরালে সুকণ্ঠ কোকিল পঞ্চম তানে গীত গাহিতেছে, সুশীতল মলয়ানিল মৃদুমন্দ বহিতেছে। এক বৃক্ষশাখায় দুইটি পক্ষীকে মিলন-লীলায় প্রমত্ত দেখিয়া শিব সহসা কামভাবে চঞ্চল হইয়া উঠেন। সম্মুখে এক সুশোভন বিল্ববৃক্ষে যুবতী-স্তন-সদৃশ রাশি রাশি শ্রীফল দেখিয়া, তিনি উহাকে সবেগে জড়াইয়া ধরেন :—আচম্বিতে তাঁহার রেতঃস্খলন হয়। কিন্তু সৃজনকর্তা শিবের মহাবীর্য বিফল হইবার নহে; তাই তিনি উহা তখনই বামকরতলে ধারণ করেন ও সন্নিকটস্থ সরোবরের এক সরস শতদলের উপরে উহা সযত্নে রাখিয়া দেন। অনন্তর তিনি কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন।

এদিকে শিবের সেই মহাবীর্য পদ্মের মৃণাল বাহিয়া পাতালপুরীতে প্রবেশ করে ও উহা হইতে মনসাদেবীর জন্ম হয়। পাতালের নাগকুলে পদ্মা সযত্নে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন ও যথাকালে কৈশোর প্রাপ্ত হন। তখন শিব একদিন

পুনরায় সেই সরযূ-কাননে পুষ্প চয়ন করিতে আসেন। তথায় এক অনুপম লাবণ্যময়ী কিশোরী বালাকে একাকিনী বিহার করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হন। তাহাকে বিবাহ করিবার মনস্থ করিয়া তিনি অকস্মাৎ সেই বালিকার মিলন যাচ্ঞা করেন। ইহাতে পদ্মা বড়ই লজ্জিত হইয়া, পিতার নিকটে আত্মপরিচয় দেন। তখন আত্মভোলা শিব স্বীয় কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কিন্তু চণ্ডীদেবী হয়তো মনসাকে সুচক্ষে দেখিবেন না,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার ফুলের সাজির মধ্যে রাশি রাশি ফুলেব অন্তরালে এই নবলব্ধা কন্যাকে তিনি সাবধানে লুকাইয়া রাখেন। এমন সময়ে চণ্ডীদেবী এক "ডোমনী" নারীর ছদ্মবেশ ধরিয়া সরযূনদীর ঘাটে নৌকা লাগান। ফুলের সাজিটা হাতে করিয়া তিনি সেই নৌকায় উঠেন এবং ডোমনীর অঙ্গে যৌবন-শোভা দেখিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহাতে ডোমনী-বেশী চণ্ডীদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় মূর্তি ধারণ করেন ও কামান্ধ পশুপতিকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যান।

দিবাবসানকালে শিব ফুলের সাজি লইয়া চণ্ডিকাব আবাসে উপনীত হন। কিন্তু অভিমানিনী চণ্ডীদেবী ঘরের কবাট খুলেন না;—তাঁহার সকাতর কাকুতি-মিনতি সবই অগ্রাহ্য করেন। অগত্যা তিনি তাঁহার যোগগৃহে প্রবেশ করিয়া ও ফুলের সাজিটা ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিয়া "বাঘছালের" উপরে শুইয়া পড়েন। পরদিন প্রত্যূষে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলে, চণ্ডী সেই যোগগৃহে প্রবেশ করিয়া ফুলের সাজিটা দেখিতে পান। উহার মধ্যে এক পরমা রূপসীকে দেখিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন;—না জানি কাহার ঘরের নারীকে "ভাঙ্গরা" শিব চুরি করিয়া আনিয়াছেন। তখন শিবকে উদ্দেশ্য করিয়া অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে তিনি দুইহাতে মনসার কোমল অঙ্গে প্রচণ্ড কিল-চাপড় মারিতে থাকেন। মনসা আত্মপরিচয় দান করিলেও তিনি নিরস্ত হন না, বরং উহা চাতুরি-বাক্য মনে করিয়া আরো গুরুতরভাবে তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকেন। ইহাতে মনসা অতিশয় কুপিত হইয়া ভীষণ মূর্তি ধারণ করেন ও সৎমাতার বক্ষঃস্থলে বজ্র-কামড় মারিয়া কালকূট ঢালিয়া দেন। সেই কালবিষের জ্বালায় চণ্ডীদেবী তন্মুহূর্তে অচেতন হইয়া পড়েন। অবশেষে পিতার কথায় পদ্মা শিবানীর সর্বাঙ্গ হইতে সমস্ত

বিষ হরণ করেন। মনসার এইরূপ দুর্জ্জয় তেজের পরিচয় পাইয়া, চণ্ডীদেবী অতঃপর তাঁহাকে সভয়ে পালন করিতে থাকেন।

অচিরে অযোনি-সম্ভবা মনসা যৌবন-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলে, শিব তাঁহার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। নারদ মুনির মধ্যস্থতায় মহাতেজস্বী জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ স্থির হয়। এই জরৎকারু মুনির কথা মহাভারতে উক্ত আছে। মহাভারতের অনুকরণে পদ্মার বিবাহ-পালা রচিত। বিবাহ-রাত্র না পোহাইতেই মুনিবর তাঁহার সদ্যঃবিবাহিতা পত্নীকে গঙ্গাতীর হইতে কুশতৃণ আনিতে আদেশ করেন,—তিনি প্রাতঃ-সন্ধ্যা করিবেন। কিন্তু বিবাহ হইতে না হইতেই দশজনের সম্মুখে স্বামীর প্রতি তাঁহার এইরূপ আনুগত্য প্রকাশ করিতে মনসা বড়ই লজ্জা বোধ করেন।—

আজু মাত্র হইয়াছে বিয়া নহে পোহায় রাতি।
পুষ্প তুলিতে যাব বড়ই অখ্যাতি ॥
বাপের প্রতাপে আমি নানা ভোগে ভোগী।
বনমধ্যে ফল ফুল কভু নাহি তুলি ॥
কোপ করহ তাপ করহ যেবা মনে লয়।
কোনকালে হেন কর্ম্ম আমা হইতে নয়।

মনসার দর্প দেখিয়া জরৎকারু অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও তাঁহাকে দুর্বাক্য বলেন। কিন্তু দাম্ভিকা মনসা সেই দুর্বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীর প্রতি বিষদৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করেন,—"কাল বিষের ঝালে" মুনিবর তখনই মূর্ছিত হইয়া পড়েন। অবশেষে শিব ও চণ্ডীর অনুরোধে মনসা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। কিন্তু মুনিবর এইরূপ তেজস্বিনী পত্নী লইয়া সংসারযাত্রা করিতে কিছুতেই সম্মত হন না, তিনি পুনরায় একাকী বনবাসে যাইতে মনস্থ করেন। ইহাতে শিব-চণ্ডী বড়ই দুঃখিত হন;—স্বামী-পরিত্যক্তা মনসার জীবন ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা অতিশয় শোকাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহাদের গভীর কাতরতা দেখিয়া, জরৎকারু অগত্যা মনসাকে তাঁহার অভীষ্ট বর প্রদান করিতে সম্মত হন। তখন শিব-চণ্ডী, কার্তিক-গণেশ, নন্দী-ভৃঙ্গী, সকলেই মনসাকে তাঁহার স্বামীর নিকট বর প্রার্থনা করিবার জন্য বারংবার আদেশ করেন। তাঁহাদের কোলাহলে বিচলিত হইয়া, পদ্মা "পুত্র, পুত্র"

বলিয়া আটবার চীৎকার করিয়া উঠেন। মুনিবর তখন পবিত্যক্তা পত্নীকে অষ্টপুত্র লাভের ববদান কবিয়া চিরকালের মত বনবাসে চলিয়া যান,—পদ্মার দিকে আর ফিরিয়া তাকান না।

যথাকালে পদ্মাদেবীর গর্ভে আস্তিক, তক্ষক প্রভৃতি অষ্টনাগ এককালে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে লইয়া তিনি পিতৃগৃহেই বাস করিতে থাকেন। তিনি একেই ভয়ঙ্করা, তদুপরি দুর্দান্ত অষ্টপুত্র লইয়া তাঁহার প্রতাপ আরো ভযঙ্কব হইযা উঠে। শিবাণীর সঙ্গে সর্বদা তাঁহার ভীষণ কলহ বাধে, তখন শিব তাঁহাব কলহপবায়ণা কন্যাকে দূরে সরাইযা দিতে সংকল্প করেন। দক্ষিণদিকে জয়ন্তী-নামক এক পর্বতে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করাইযা, তিনি সপুত্র মনসাকে তথায় বাখিযা আসেন। পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইযা মনসা বড়ই দুঃখিত হন। তাঁহাব দুঃখ দেখিযা শিবেব চোখেও জল আসে এবং সেই "নেত্রেব জলেতে তখন জন্মিলেক নেতা"। এই নেতাকে মনসাব চিব-সহচারিণীরূপে জযন্তী পাহাড়ে থাকিতে উপদেশ দিযা শিব নিজগৃহে ফিবিযা যান।

নেতাব সাহচর্যে মনসা তাঁহাব অষ্টনাগ পুত্র লইযা জযন্তী পর্বতেব অধীশ্বরীরূপে সদর্পে বাস কবিতে থাকেন। যাবতীয সর্পকুল তাঁহাব আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হয এবং পর্বতবাসী যক্ষ-দানবাদি ভক্তিসহকাবে তাঁহাব পূজা কবে। অনন্তর তিনি মর্ত্যলোকে তাঁহার পূজা প্রচাব কবিতে উদ্যোগী হন। নেতাব যুক্তি অনুসাবে তিনি শিবের নিকটে গিযা স্বীয মনোভিলাষ ব্যক্ত করেন। শিবেব আদেশে বিশ্বকর্মা মনসা-পূজার এক দিব্য ঘট নির্মাণ কবিযা দেন। ঘটেব গায়ে মনসাব মূর্তি, মূর্তিব বামপার্শ্বে নেতা ও উহাব চৌদিকে নাগকুলের চিত্র। এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশ ধবিয়া, শিব সেই ঘট মস্তকে লইযা ধরাতলে গমন করেন। একস্থানে কতিপয় রাখালকে জুযাখেলায মত্ত দেখিয়া তিনি তথায উপনীত হন। এক রাখাল তাঁহাব মাথায় ঐ ঘট দেখিযা উহার বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, উহা মনসাদেবীর ঘট; উহা ভক্তিভাবে পূজা করিলে, মনসার বরে ভক্তের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয। ঘটের এইরূপ মহিমার কথা শুনিয়া, সেই রাখাল তখন মনসার নাম লইয়া জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হয় ও আশাতীত জয়লাভ করে। ইহার পূর্বে সে প্রতিবারেই জুয়াখেলায় পরাজিত হইয়াছে। কাজেই মনসার মহিমা সে

তখনই বুঝিতে পারে ও তাঁহার পূজা করিতে সে সংকল্প করে। তাহাকে ঘটটি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণরূপী শিব সহসা অন্তর্ধান হন;—রাখালেরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার আর সাক্ষাৎ পায় না। বিস্ময়াবিষ্ট রাখালবৃন্দ অচিরে গঙ্গাতটে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রত্যহ মনসার পূজা করিতে থাকে। এইরূপে মর্ত্যলোকে রাখালদের মধ্যে মনসার পূজা সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়।

মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী মনসাদেবীর যথাবিধি পূজার্চনা করিয়া পূর্বোক্ত রাখালবৃন্দ মহানন্দে দিন কাটাইতে থাকে। কিন্তু জোলাহাটী গ্রামের হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের অত্যাচারে তাহাদের এই পরমসুখে শীঘ্রই ব্যাঘাত ঘটে। তকাই নামে এক মোল্লা একদিন বৃষ্টি-বাদলে ভিজিতে ভিজিতে রাখালদের পূজামন্দিরে প্রবেশ করে ও অহঙ্কারবশতঃ মনসার ঘট ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়। ইহাতে রাখালেরা তাহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়া বিদায় করে। কিন্তু মোল্লাসাহেবের এইরূপ ঘোর অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া সেই গ্রামের দুষ্ট দুর্দান্ত কাজি হাসন ও হোসেন অতিশয় রাগান্বিত হইয়া রাখালদিগকে শৃঙ্খলিত করে ও তাহাদের পূজামণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ফেলে। তখন নির্দোষ ভক্তবৃন্দের উপর এইরূপ অন্যায় পীড়নের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত প্রলয়ঙ্করী বিষহরিদেবী এক বিষধর বিঘতিয়া বোড়াকে মুসলমানকুল ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। সেই কাল-সর্পের দংশনে জোলাহাটী গ্রামের মুসলমান তাঁতীরা একে একে প্রাণ হারায়। ক্রমে সেই বিষধর বোড়া হোসেনহাটীগ্রামে উপনীত হয়,

"কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাঁপ, তাহা দিয়া যায় সাপ, বিবি পলায়, পদ্মার কৌতুক।"

সেই সর্পের দংশনে কাজির পুত্র ঢলিয়া পড়ে,—কাজিরা দুই ভাই প্রাণভয়ে জলে ঝাঁপ দেয়। অবশেষে তাহারা সশঙ্কভাবে পদ্মাপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই ঘোর বিপত্তি হইতে নিস্তার পায়।

অতঃপর 'চন্দ্র-পদ্মার পরস্পর অভিশাপ' নামক পালা হইতে তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ চাঁদসদাগরের কাহিনী সুরু হইয়াছে। মনসাদেবীর মহিমা ততদিনে বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেবাসুরেরাও ভক্তিভরে তাঁহাকে পূজা করেন। একদিন পুষ্প নামক এক গন্ধর্ব সবান্ধবে নাগাভরণা মনসাদেবীর পূজার্চনা করিতেছেন। এমন সময়ে চান্দ অধিকারী হেন্তালের যষ্টি হস্তে সেই পূজাস্থলে দৈবাৎ উপনীত হন। তাঁহাকে দেখিয়া পদ্মাঙ্গবেষ্টনকারী সর্পকুল আতঙ্কিত

হইয়া দ্রুত পলায়ন করে; তাহাতে নাগমাতা আভরণহীনা হইয়া পড়েন। এইরূপ বিড়ম্বিত হইয়া তিনি সক্রোধে চান্দকে অভিশাপ দেন—

সভামধ্যে আমাকে যে করিলা লজ্জিত।
আজি হৈতে পতন তব হবে পৃথিবীত ॥

বস্তুতঃ, চান্দ অধিকারী কিন্তু সজ্ঞানে কোনই অপরাধ করেন নাই। তাই মনসার অন্যায় অভিশাপে তিনিও সাহঙ্কারে শপথ করেন—

আমি যদি তোমার পূজা করি কুতূহলে।
তবে যেন তোমার পূজা হয় মহীতলে ॥

চাঁদ পৃথিবীতে আসিয়া চম্পক-নগরের সুবিখ্যাত বণিক বিজয়সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যাদি করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য আহরণ করেন। তিনি নিত্য ভক্তিসহকারে শিবপূজা করেন এবং শিবের বরে মহাজ্ঞান ও হেন্তালের যষ্টি প্রাপ্ত হন। এই মহাজ্ঞানের বলে তিনি সর্পদষ্ট মৃতব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন এবং তাঁহার হেন্তালের লাঠির ভয়ে বিষধর সর্পকুল বহু দূরে পলাইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পত্নী সোনেকা বাল্যকাল হইতেই একমনে মনসাদেবীর পূজা করেন। মনসার বরে তাঁহার গর্ভে একে একে ছয়টি বিদ্যাধরতুল্য পুত্র জন্মলাভ করে। ধনাঢ্য সদাগর যথাকালে ছয়পুত্রের বিবাহ দিয়া ছয়টি মনোমত পুত্রবধূ নিজের ঘরে আনেন। এইরূপে দারা-পুত্র-পুত্রবধূ ও দাস-দাসী প্রভৃতি বহু পরিজনের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তিনি মহাড়ম্বরে পরমসুখে বাস করেন। একদা নানাদেশে বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রচুর ধনৈশ্বর্য লইয়া চম্পক-নগরের ঘাটে উপনীত হন। পুত্রবধূবৃন্দ-সহ গৃহিণীকে ঘাটে আসিয়া ডিঙ্গার ধনরাশি বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য তিনি এক পাইকের দ্বারা সোনেকাকে সংবাদ পাঠান। কিন্তু সোনেকা তখন মনসা-পূজায় বসিয়াছেন, তাই তাঁহার যাইতে বিলম্ব হয়। ইহাতে সদাগর অতিশয় রুষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন ও হেন্তালের বাড়ি মারিয়া মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অন্তরীক্ষ হইতে মনসা তাঁহার অপমান দেখিয়া চাঁদের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন,—"সেই হতে চান্দের সনে পদ্মার হইল বাদ।"

চিরসাথী নেতার পরামর্শে পদ্মাদেবী একে একে সদাগরের নানারূপ ক্ষতি করিতে থাকেন, যাহাতে সদাগর অবশেষে ভীত হইয়া তাঁহার পূজা করিতে

বাধ্য হন। তিনি প্রথমে সর্পকুলের দ্বারা সদাগরের এক নন্দনকানন-তুল্য বিশাল "গুয়াবাড়ী" ধ্বংস করেন, কিন্তু শঙ্করগাড়রী নামক এক ধন্বন্তরি ওঝার দ্বারা সদাগর তাঁহার গুয়াবাড়ি ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি পুনরায় সঞ্জীবিত করান। মনসা তখন কৌশলে শঙ্করের প্রাণ ও সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করেন। তৎপরে তিনি এক রজনীতে কতিপয় বিষধর সর্প পাঠাইয়া সদাগরের ছয় পুত্রের খাদ্যদ্রব্যে কালকূট মিশাইয়া রাখেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সদাগরের পুত্রেরা সেই বিষাক্ত খাদ্য খাইয়া অকালে প্রাণ হারায়। দুঃসহ পুত্রশোকে বিকল হইয়া সোনেকা তাঁহার স্বামীকে বিষহরির পূজা করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু শিবভক্ত অটল সদাগর কোনক্রমেই অনার্যদেবী মনসার আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত হন না। অনন্তর শোক-সন্তপ্তা সোনেকা সদাগরের অগোচরে ঝালু-মালু নামক দুই ধীবর ভ্রাতার গৃহে গিয়া ভক্তিভরে মনসার পূজা করেন। তাঁহার শোক দূর করিবার মানসে মনসা আশীর্বাদ করেন, তাঁহার গর্ভে লখিন্দর নামে আর একটি পরমসুন্দর পুত্র অচিরে জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু বিবাহ-বাসরে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইবে। সোনেকা ভাবেন, লখিন্দরের বিবাহ না দিলেই হইবে, তাই তিনি হৃষ্টমনে সেই বর গ্রহণ করেন।

চাঁদসদাগর পুনরায় বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। দক্ষিণ-পাটন নামক এক সমৃদ্ধ নগরে উপনীত হইয়া তিনি বাণিজ্যের দ্বারা অপরিমিত ধনরত্ন লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে তিনি তথায় সানন্দে শিব-দুর্গা-নারায়ণাদি সকল দেবতার পূজা করেন, কিন্তু মনসার পূজা করেন না। তখন মনসা এক বৃদ্ধা নারীর রূপ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসেন ও তাঁহাকে মনসার পূজা করিতে বলেন; তাহা হইলে মনসা তাঁহাকে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ করাইয়া স্বদেশে পৌঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু "লঘুজাতি" নাগদেবীর কথায় তিনি সক্রোধে বলেন,—

যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর-ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কাণী॥

এই বলিয়া তিনি তাঁহার বিরাট হেতালের লাঠি লইয়া মনসাকে তাড়া করেন। মনসাও ইহার ভীষণ প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত নেতার সহিত পরামর্শ করিতে থাকেন। চাঁদসদাগর যখন তাঁহার ধনরত্নপূর্ণ বিশাল তরী-

সমূহ লইয়া অকূল সমুদ্রের মধ্যে উপনীত হন, তখন মনসা সুযোগ বুঝিয়া সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি তোলেন। সেই প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত্যায় সাগরের জলরাশি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা ডিঙ্গাগুলির উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, দেখিতে দেখিতে খরতর স্রোতাবর্তে উহারা অতল জলে ডুবিয়া যায়। চাঁদসদাগর মাঝি-মাল্লা-বিহীন হইয়া সেই উত্তাল বারিধি-বক্ষে একাকী ভাসিয়া যান।

চিত হইয়া ভাসে চান্দ নাহিক সম্বিৎ।
দেখিয়া মনসাদেবী হইল হরষিত॥
মরা জ্ঞানে ছো মারে চিল আর কাকে।
ব্যথা পাইয়া সদাগর মা-বাপ ডাকে॥

কিন্তু চাঁদসদাগরকে তো প্রাণে মারিলে চলিবে না, তাঁহাকে দিয়া মনসার পূজা করাইতেই হইবে, কারণ তিনি পূজা করিলেই মনসার পূজা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাইবে। কাজেই মনসা শীঘ্র একটি কলাগাছ কাটিয়া উহার গায়ে লিখেন, চাঁদ যদি মনসার পূজা করেন তবে তাঁহার চৌদ্দ ডিঙ্গা এখনই তিনি ফিরিয়া পাইবেন. এবং সেই গাছটা ভাসমান চাঁদের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। সদাগর ঐ গাছটা অবলম্বন করিয়া শ্রান্ত দেহে একটু বল পান, কিন্তু উহার গায়ের লেখা পড়িয়া তখনই উহা ঘৃণার সহিত ত্যাগ করেন। যাহা হউক, দৃঢ়চিত্ত চাঁদসদাগর অবশেষে অকূল সাগরে কূল পান। তখন ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তিতে তাঁহার সমস্ত দেহ নিতান্ত অবসন্ন। সাগরবেলায় একখানা কলার বাকল দেখিয়া তিনি তাহাই সাগ্রহে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু তন্মুহূর্তে পদ্মা একটা গাভীর রূপ ধারণ করিয়া সেই কলার বাকল হরণ করিয়া নেন। অগত্যা সদাগর নিকটস্থ নগরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যের অন্বেষণে পথে পথে ঘুরিতে থাকেন। জনৈকা গৃহবধূ তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাকে একমুষ্টি চাউল ভিক্ষা দেন। কিন্তু পদ্মার আদেশে নেতা কাকের আকার ধরিয়া সেই চাউল হরণ করে। তখন সদাগর এক বাজারে গিয়া ধীবরদের কাছ হইতে মৎস্য চাহিয়া আনেন। কিন্তু নেতা এক চিলের রূপ ধরিয়া উহা তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। প্রতিহিংসাময়ী বিষহরির বিরোধিতায় উপবাস-খিন্ন সদাগর এইরূপ বহুবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে করিতে চন্দ্রধর নামক তাঁহার এক বন্ধুর আলয় প্রাপ্ত হন, এবং সেই বন্ধুর কৃপায় তাঁহার প্রাণ

রক্ষা পায়। তৎপরে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল নানা দেশের পথে-বিপথে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে চম্পকনগরে আসিয়া পৌঁছান। কিন্তু তাঁহার জীর্ণ-শীর্ণ-বিবর্ণ মূর্তি দেখিয়া তাঁহার বাড়ীর দাস-দাসীরা তাঁহাকে চিনিতে পারে না, বরং তাঁহাকে চোর মনে করিয়া প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে ও তাঁহাকে বাঁধিয়া সোনেকার নিকট লইয়া যায়। পতিপ্রাণা সোনেকা স্বামীর এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় মর্মাহত হন ও সযত্ন সেবাশুশ্রূষার দ্বারা দৈবাহত সদাগরের যাবতীয় ক্লেশ অপনোদন করেন।

চাঁদসদাগরের অনুপস্থিতকালে সোনেকার গর্ভে লখিন্দর জন্মগ্রহণ করে। সে এখন যৌবন-প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সর্বস্বান্ত সদাগর বড়ই উৎফুল্ল হন ও খুব ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ দিবার আয়োজন করেন। উজানী-নগরের সুপ্রসিদ্ধ সাহবেনের পরমা সুন্দরী কন্যা বেহুলার সহিত তাহার শুভবিবাহ স্থির হয়। বিবাহ-রাত্রে সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে জানিয়া দৈব-বিরোধী সদাগর এক নিচ্ছিদ্র লৌহ-বাসর নির্মাণ করান ও উহার অভ্যন্তরে বরবধূকে শুভরাত্রি যাপন করিতে বলেন। কিন্তু দুর্বার নিয়তির গতি তিনি কোন উপায়েই প্রতিরোধ করিতে পারেন না ; সেই সুরক্ষিত লৌহ-গৃহের মধ্যেও বিষধর সর্পদংশনে লখিন্দর অকালে প্রাণ হারায়।

সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা। সেই প্রথানুসারে লখিন্দরের দেহ কলাগাছের ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। পতিপরায়ণা বেহুলা-সতী মৃত স্বামীর অনুগমন করিয়া ও স্বর্গলোকে উপনীত হইয়া দেবতাদের নিকট হইতে তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সেই ভেলার উপরে আরোহণ করে। এই দুষ্কর সাধনা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা কত সকাতর মিনতি জানায়, কিন্তু পতিপ্রাণা সতীর সংকল্প কেহই টলাইতে পারে না। মৃত স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া অসহায়া বেহুলা "গাঙ্গুরের জলে" ভেলায় ভাসিয়া চলে।

বেহুলা পবিত্র-চরিত্রা ধর্মপরায়ণা নারী ; তাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, সে তাহার স্বামীকে নিশ্চয় ফিরিয়া পাইবে। নিজের সতীত্বের প্রতি তাহার এইরূপ অসীম শ্রদ্ধাবশতঃ অজ্ঞাত বিপদরাশি বরণ করিয়া লইতে সে বিন্দু-মাত্রও ভীত হয় নাই। অনাহারে অনিদ্রায় প্রখর রৌদ্রে ও অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টিতে

সে শুধু একমনে তাহার স্বামীর প্রাণ অবিরাম প্রার্থনা করিতে করিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। দিনে দিনে লখিন্দরের শব গলিয়া যাইতেছে, হাড় হইতে মাংস খসিয়া পড়িতেছে, দুর্গন্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে,—তবু সে আত্মবিশ্বাস হারায় নাই; "সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দুরের জোরে" সে তাহার অসাধ্য সাধনার সফলতার দিকে অটুট ধৈর্যের সহিত আগাইয়া যাইতেছে। কালক্রমে তাহার ভেলা গোদার ঘাটে আসিয়া ঠেকে। সেই ঘাটে দুশ্চরিত্র গোদা বঁড়শিতে মাছ ধরিতেছে। বেহুলার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া সে তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিতে চাহে। বেহুলা তাহাকে অভিশাপ দিয়া পুনর্বার ভাসিয়া চলে। এইরূপে আপু-ডোমের ঘাট, ধোনা-মোনার ঘাট, টেটনের ঘাট প্রভৃতি আরও কত ঘাটে কত দুষ্ট লোকের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে ক্রমাগত আগাইতে থাকে। মনসার আদেশে নেতা ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিয়া লখিন্দরের গলিত শব ভক্ষণ করিতে আসে। স্বামীর পরিবর্তে নিজের দেহ সে তাহাকে দিতে চাহে। নেতা পুনবায় চিলের রূপ ধরিয়া লখিন্দরের পাঁজর ছোঁ মারিয়া লইতে চেষ্টা পায়, কিন্তু বেহুলা অঞ্চলে ঢাকিয়া স্বামীর পঞ্জর রক্ষা করে।

ক্রমে বেহুলার ভেলা নেতার ঘাটে আসিয়া লাগে। নেতা স্বর্গের ধোপানী। তাহার সহিত বেহুলা স্বর্গপুরীতে গিয়া উপনীত হয়। সেখানে মহাদেবের ভবনে সুমধুর নৃত্যগীতের দ্বারা সে দেববৃন্দকে সন্তুষ্ট করে। তখন মহাদেবের আদেশে মনসাদেবী তাহাকে লখিন্দর, লখিন্দরেব ছয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও চাঁদসদাগরের জলমগ্ন চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরাইয়া দেন। কিন্তু সর্ত থাকে—চাঁদ তাঁহার পূজা করিবেন, অন্যথায় বেহুলা তাহার স্বামী-ভাশুর প্রভৃতি সমস্ত হইতেই বঞ্চিত হইবে। অনন্তর, চাঁদসদাগরের সাত পুত্র ও ধনরত্নপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া সতী-সাধ্বী বেহুলা চম্পক-নগরের ঘাটে আসিয়া উপনীত হয়। চাঁদ সদাগর অপার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই ঘাটে ছুটিয়া আসেন; কিন্তু যে মুহূর্তে শুনিতে পান, তাঁহাকে মনসার পূজা করিতে হইবে, সেই মুহূর্তে তিনি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বেহুলা তখন শ্বশুরের পদতলে পতিত হইয়া সাশ্রু নয়নে বারংবার মিনতি জানায়—অভাগিনীর প্রতি তিনি দয়া করিয়া সদয় হউন। দেবীতুল্য পুত্রবধূর নেত্রজলে বজ্রকঠোর চাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়,—বেহুলার কঠোর তপস্যা তিনি বিফল হইতে দেন

না, স্বেচ্ছায মনসাব চবণতলে পূজাব অর্ঘ্য সবিনয়ে নিবেদন কবেন। তদবধি মনসাব পূজা মর্ত্যলোকে প্রচাব লাভ কবে।

চাঁদসদাগবেব চবিত্র-সৃজনে বিজযগুপ্ত প্রশংসনীয় সক্ষমতাব পবিচয় দিযাছেন। চাঁদেব চবিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব ও অদ্বিতীয। তাঁহাব দুর্দম পৌরুষ লইয়া তিনি দুর্বাব দৈবেব বিরুদ্ধে অবিবাম সংগ্রাম কবিযাছেন। পুত্রশোকে বা ধননাশে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই, ঘোব বিপদেও কাহাবও নিকটে নতি স্বীকাব কবেন নাই, সুখ-দুঃখ ও লাভ-ক্ষতি সমস্তই সমানভাবে ববণ কবিযা লইয়াছেন। তাঁহাব এই অনমিত পুরুষকাব বিজযগুপ্তকে চিব অমব কবিয়া বাখিবে।

বিজযগুপ্তেব মনসামঙ্গলে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজেব বহু চিত্র প্রতিবিম্বিত হইযাছে। তৎকালে সুলতান হোসেন শাহ বঙ্গেব অধীশ্বব, সাবা বাঙ্গালা-দেশে মুসলমানদেব দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাহাদেব বর্বরোচিত অত্যাচাবে বঙ্গবাসী হিন্দুদেব ধর্মকর্ম-সম্পাদনে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ কবিতে হইত। হাসন-হোসেন পালায সেই নির্যাতনেব ছবি ফুটিয়া উঠিযাছে। হোসেনেব শালা দুলা-হালদাবেব প্রসঙ্গে উক্ত হইযাছে—

পদ্মাপুরাণে বঙ্গীয় সমাজ

তাব ভয়ে হিন্দুসব পলায তবাসে ॥
… … …
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পবম কৌতুকে।
কাব পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয মুখে।

হিন্দুব সন্তানদেব মুখে উচ্ছিষ্ট খাদ্য পুবিয়া দিযা মুসলমানেবা যে তাহাদেব জাতি নাশ কবিত, হোসেন-কাজিব ক্রোধোক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইযাছে।—

হাবামজাদ হিন্দুব হয এত বড় প্রাণ।
আমাব গ্রামেতে বেটা কবে হিন্দুয়ান ॥
গোটে গোটে ধবিব গিয়া যতেক ছেমবা।*
এড়া † রুটী খাওযাইযা কবিব জাতিমাবা ॥

জনৈক মনসাভক্ত বাখালেব প্রতি এই কাজি-সাহেবেব কঠোব তিবস্কাবের মধ্য দিয়া হিন্দুব আবাধ্য দেবতাব প্রতি বিধর্মী মুসলমানদেব ঘোব তাচ্ছিল্য অভিব্যক্ত হইযাছে।—

* বালক, † উচ্ছিষ্ট।

খোদা থাকিতে কেন ভূতেরে নোয়াও মাথা।
মোর আগে কহ তোমার বাপ দাদার কথা॥

বেহুলার বিবাহোৎসব-বর্ণনায় তৎকালীন বঙ্গপল্লীর বিবাহানুষ্ঠান-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বহুস্থানে রান্না-বান্না ও খাওয়া-দাওয়ার ঘটা দৃষ্ট হয়। সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার সন্তানেরা যে একদা অতিশয় ভোজনপটু ছিল, ইহার দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তাজদী-জোলার বেটা সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইলে, তাহার বিধবা বিবির ক্ষোভ-প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন নিম্নজাতীয়া রমণীর লোভনীয় খাদ্যের কথা জানা যায়।—

শোল মাগুর কৈ, আলু মানকচু চই,
গুয়াপান আনিত নানা মতে॥

শিব-চণ্ডীর অন্তরালে বঙ্গপল্লীর বর্বর কৃষক ও কলহপরায়ণা কৃষক-পত্নীর চিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কন্যার যৌবনোদ্গম দর্শনে বাঙ্গালী পিতার উদ্বিগ্নতা নিম্নলিখিত ঘটনায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—

একদিন সখীগণ সঙ্গে করি মেলা।
জলমধ্যে মনসা করেন জলখেলা॥
উদ্‌লা মাথার কেশ বুকে বস্ত্র নাই।
দৈবদলে সেই পথে চলিলা গোসাঞি॥
জলকেলি করে পদ্মা আর নাহি চিত।
পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর লজ্জিত॥
সম্পূর্ণ যৌবন কন্যার রূপে নাহি সীমা।
ঘরে অবিবাহিতা বড়ই অমহিমা॥

এইরূপ সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে, "এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লীপ্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া যায়।"[১]

বিজয়গুপ্তের ভাষা ও বর্ণনভঙ্গী

বিজয়গুপ্তের ভাষা ও বর্ণনভঙ্গী প্রশংসনীয়। তিনি সহজ কথা ও সাধারণ উপমা দিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করেন। ভাষার এইরূপ সরলতাবশতঃ তাঁহার বর্ণিত বিষয় পাঠকের মানসনেত্রে প্রত্যক্ষপ্রায় হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কর্মকারবৃন্দের দ্বারা লোহ-বাসর-নির্মাণের চিত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।'

লোহা তাতাইয়া কামারগণ করে গণ্ডগোল।
কেহ বলে তাতা তাতা কেহ বলে তোল॥
একেবারে কামারগণ করে হুড়াহুড়ি।
কামারের বোলচাল হাতুরের বাড়ি॥
ঠাস ঠাস করিয়া দোহাতি বাড়ি মারে।
বিজলি সঞ্চারে যেন তপ্ত লোহা উড়ে॥

মানব-মনের দুঃখ-বেদনাদি অব্যক্ত গভীর ভাবগুলিও কবি অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান চাঁদসদাগরের তৎকালীন নৈরাশ্যময় মর্মবেদনা নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় পংক্তিতে মাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

আর না পূজিব আমি দেব মহেশ্বর।
আর না যাইব আমি চম্পক নগর।
পুত্র নাহি বন্ধু নাহি সবে দুইজন।
মরণকালে সোনার সঙ্গে নহিল দরশন॥
কাহারে ডাকিবে সোনা কোন ভিতে রবে।
পুত্র শোক মনে উঠিলে কার মুখ চাবে॥

বাসর-ঘরে সর্পদংশনে লখিন্দরের অকাল মৃত্যু ঘটিলে, বেহুলার মুখে কবি যে বিলাপ বসাইয়াছেন তাহা অতীব মর্মস্পর্শী।—

বিয়ার রাত্রে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন।
লজ্জা করি অভাগিনী নাহি দিল মন॥
মুই ত না জানিলাম প্রভু হইবে এমন।
গা তোল প্রভু মোরে দেও আলিঙ্গন॥
... ...
হস্তের কঙ্কণ মলিন হৈল আমার সিঁথির সিন্দুর।
নেতের আঁচল দিয়া কাজল করে দূর॥
আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল॥
সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বাঁধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব॥

বিজয়গুপ্তের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার "কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে।"[১] যথা—শিব তদীয় কন্যা পদ্মাদেবীর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু বিবাহানুষ্ঠানের কোনই আয়োজন করেন নাই। এতদ্বিষয়ে শিব-চণ্ডীর আলাপন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
আর চাবে তৈল সিন্দুরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এযো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে পরাণ
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পানগুয়া দিবে কোন জনে।

দক্ষিণ-পাটন নামক সুদূর বিদেশে বস্তুবদলের দ্বারা চাঁদসদাগরের ব্যবসায় প্রসঙ্গে কবি প্রচুর হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। ঐ দেশের মূর্খ রাজার কাছ হইতে হরিদ্রা বদলে সোনা, কলাই বদলে প্রবাল, পান বদলে মাণিক্য, মূলা বদলে হস্তিদন্ত প্রভৃতি সদাগর সুকৌশলে গ্রহণ করিতেছেন। পাটের ছালাকে দুর্লভ বস্ত্র বলিয়া রাজা-রাণীকে পরাইতেছেন।—

রাজার যোগ্য বসন, না পরে সামান্য জন,
অনেক শকতি ইহা কিনি।
যতনে রাখিয়া ঘরে, সর্ব্বকাল লোক পরে,
বড়ই দুর্লভ চটের ভূনি॥
চান্দর ললিত ভাষে, খলখলি রাজা হাসে,
আপন হাতে চট মেলি চায়।
একখান কাছিয়া পিন্ধে, আর খান মাথায় বান্ধে,
আর খানা দিল সর্ব্বগায়॥

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

রাজার স্বল্পজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া তিনি পরিহাস-ছলে বলিতেছেন—

মান্দারের ফুল আর চটের কাপড়।
পরিলে বুড়ায় হয় তরুণ নাগর ॥

বিজয়গুপ্তের কাব্যের স্থানে স্থানে কতিপয় সুন্দর নীতি-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

স্ত্রীরে যে আপন বলে সেজন বর্ব্বর।

* * *

অতি কোপ করিলে কাজ ঠেকে অথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে বাঁকে পড়ে চর ॥

* * *

নিশ্চিন্তে খাইয়া বেড়াও হাঁড়ীতে না দেও ফুক।
পরের বলিতে তোমার চাঁদ হেন মুখ।

* * *

জনমদুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥

প্যারীমোহন দাসগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলখানি সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই গ্রন্থের কোন কোন স্থলে কবি কর্ণপুর, বর্দ্ধমান দাস, চন্দ্রপতি, জানকীনাথ, পুরুষোত্তম দাস প্রভৃতি অপরাপর কবির ভনিতা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, বিজয়গুপ্তের কাব্যে কালক্রমে প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্যযুগ

[খ্রীঃ ১৬শ—১৭শ শতাব্দী]

[১] ভূমিকা

'চৈতন্যযুগ' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ'। এই যুগে বঙ্গভাষার অত্যাশ্চর্য উন্নতি হয় ও অনেক শক্তিশালী কবি আবির্ভূত হন। এই যুগে বাঙ্গালার বৃহত্তম মহাকাব্য কাশীরামদাসের 'মহাভারত', মধুরতম গীতি-কবিতা দীন-চণ্ডীদাসের 'পদাবলী', সর্বোত্তম মহামানবের জীবন-কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', শ্রেষ্ঠতম বাস্তবতামূলক কাব্য মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়। চণ্ডী-মনসার ন্যায় শিব, ধর্ম, কালী, দক্ষিণা রায় প্রভৃতি অপরাপর লৌকিক দেবদেবী লইয়া স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য দেখা দেয়। সংস্কৃত পুরাণাদির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী, পারসী, আরবী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার কতিপয় কাব্যাদি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত হয়। ফলতঃ, চৈতন্যযুগে বঙ্গসাহিত্য বহুদিক দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই কল্পনাতীত উন্নতির প্রধান কারণ—তৎকালে বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহার মত মহাপুরুষ ইতিপূর্বে আর আবির্ভূত হন নাই, এবং পরেও আর এযাবৎ কেহ দেখা দেন নাই। তাঁহার দেবতুল্য দেহকান্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নির্মল চরিত্র ও আন্তরিক ঈশ্বরভক্তির দ্বারা তাঁহার প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত প্রবলভাবে ছড়াইয়া পড়ে। উহার ফলে বাঙ্গালার সমাজ ও সাহিত্য স্বল্পকাল মধ্যে সমুন্নত হইয়া উঠে। বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসে তিনি যে মহদ্ভাবের বন্যা বহাইয়া দেন, তাহা প্রায় দুইশত বর্ষ ব্যাপিয়া বঙ্গসাহিত্যে রস-সঞ্চার করে। এইহেতু, গৌড়ীয় যুগের পরবর্তী যুগ 'চৈতন্যযুগ' নামে অভিহিত, এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দদ্বয় ইহার অন্তর্গত।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন নবদ্বীপের এক দরিদ্র

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব গৃহে চৈতন্যের জন্ম হয়, এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে পুরীব সন্নিকটস্থ টোটাগ্রামে তাঁহাব তিরোধান ঘটে। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতাব নাম শচীদেবী। শৈশবে তিনি নিমাই, বাল্যে গৌব ও যৌবনে চৈতন্য নামে অভিহিত হন, কিন্তু তাঁহাব নামকবণ হয বিশ্বম্ভব। বিশ্বম্ভরের পূর্বে বিশ্বরূপ নামে জগন্নাথেব আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। কিন্তু তিনি যৌবন-প্রাপ্তির পূর্বে সন্ন্যাস লইয়া সংসার ত্যাগ কবেন। তাঁহার সংসারত্যাগেব কতিপয বৎসব পবে জগন্নাথের মৃত্যু হয়। অল্প বয়সেই নিমাই ন্যায়-দর্শন-ব্যাকরণ শাস্ত্রাদিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ কবিয়া টোল খোলেন এবং তদ্দ্বাবা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহাব সুশিক্ষাদান-গুণে অসংখ্য ছাত্র তাঁহাব টোলে সমাগত হয়। তখন তিনি নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতনেব কন্যা লক্ষ্মীদেবীব পাণিগ্রহণ কবেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসব পবে লক্ষ্মীদেবীব মৃত্যু হইলে, নবদ্বীপবাসী বল্লভ আচার্যের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াব সহিত তাঁহাব দ্বিতীযবার বিবাহ হয। তৎপবে তিনি পিতৃকৃত্য সম্পাদন কবিবাব জন্য গয়ায় গমন কবেন। তথায় পরমেশ্বর বিষ্ণুদেবের পাদপদ্ম দর্শন কবিষা তাঁহার চিত্তে সহসা ঈশ্বরভক্তির উদয় হয়। সেই সময দৈবযোগে শ্রীহট্টবাসী পরম বৈষ্ণব ঈশ্বরপুরীব সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ ঘটে। ঈশ্বরপুরীব আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইযা তাঁহাব নিকট তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন।

শ্রীচৈতন্য

গয়া হইতে নবদ্বীপে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবিয়া গৌবাঙ্গেব আর গৃহকর্মে মন বসে না; সর্বদাই পাবমার্থিকভাবে তিনি তন্ময় হইযা থাকেন ও ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া অবিবাম অশ্রুবর্ষণ কবেন। গদাধব, গোপীনাথ, শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ, ভাগবত-পাঠ ও হবিনাম-সংকীর্তন করিয়া তিনি দিনরাত্রি যাপন কবেন। তাঁহাব এই অপূর্ব ভক্তিভাব অনতিকালমধ্যে সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়ে, এবং অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অপরাপর ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত আসিযা মিলিত হন;—দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপ একটি পবিত্র তীর্থধামে পরিণত হয়।

তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ হোসেন শাহের সুশাসনে সুখ-সমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি হইলেও, হিন্দুসমাজে ঘোরতর ধর্মহীনতা জাগিয়া উঠে। ধনাঢ্য হিন্দুগণ

মহাড়ম্বরে দোল-দুর্গোৎসব ও চণ্ডী-মনসার পূজা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে যথার্থতা ঈশ্বরভক্তির বিলোপ এবং তাঁহাদের আচরণে সততা ও পবিত্রতার অভাব দেখা দেয়। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া হিন্দুজাতি উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই শতধা হিন্দুজাতির ঘোর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া ও তাহাদের সকলের হৃদয়ে আন্তরিক ঈশ্বরভক্তির উদয ঘটাইয়া, এক অখণ্ড হিন্দুজাতি গঠন করিবার নিমিত্ত, শ্রীচৈতন্য শীঘ্রই হরিনাম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। গৃহী অপেক্ষা সন্ন্যাসীর প্রতি জনসাধারণের সমধিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া, তিনি মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে কাটোযায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নবপরিণীতা পত্নী ও বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশবাসীদের কল্যাণসাধন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন।

নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে হরিনাম কীর্তন করিয়া তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জনসাধারণকে তাঁহার অনুগত করেন। তৎপরে পুরীতে গিয়া তিনি কিয়ৎকাল ভক্তবৃন্দসহ জগন্নাথ-মন্দিরে হরিসংকীর্তনে মত্ত রহেন। তথায় অদ্বৈতবাদী মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হন ও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। পুরী হইতে তিনি একজন মাত্র সাথী সঙ্গে করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যটনে বহির্গত হন এবং গোদাবরী-তটে প্রেমভক্তি-সাধক রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া তিনি রামকেলী গ্রামে উপনীত হন। সেখানে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী সনাতন (দবীর খাস) ও রূপ (সাকরমল্লিক) তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বৈরাগ্য লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণারাধনায় প্রবৃত্ত হন। তৃতীয়বারে তিনি ছোট-নাগপুরের অরণ্যময় পথে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন; পথে কাশী-প্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান তিনি দর্শন করেন। এইরূপে প্রায় ছয় বৎসরকাল তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। যেখানে যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে-ই তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র ও ঈশ্বরভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছে। কত অহঙ্কারী পণ্ডিত, কত ভিন্ন

মতালম্বী ধার্মিক, কত বিচক্ষণ কুতার্কিক তাঁহার সহিত শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু সকলেই অবশেষে তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসীম প্রেমের পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট সবিনয়ে নতি স্বীকার করিয়াছে।

জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ শ্রীচৈতন্য পুরী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান নাই। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় বাঙ্গালাদেশ হইতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ পুরীতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। ক্রমে তিনি দিবারাত্র বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া দিব্যোন্মাদে বিহ্বল হইয়া রহিতেন। অবশেষে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব হয়।

জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি ও ভক্তি-উদ্দীপনের নিমিত্ত নাম-সংকীর্ত্তন—ইহারই উপর শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিচারে সকল মানুষকেই পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইতে তিনি শিক্ষা দেন। "তখনকার দিনের হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া সমাজে একতা আনিয়া অখণ্ড বাঙ্গালীজাতি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়তা করিয়াছিল। অপূর্ব্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত হইযা বাঙ্গালীর প্রতিভা কি ধর্ম্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতকলায় সর্ব্বত্রই বিচিত্রভাবে স্ফূর্ত্ত হইতে লাগিল।"[১]

শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দের সংখ্যা অসংখ্য। মুখ্য পারিষদবর্গের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের অনেকেই একাধারে পরম সাধু ও দার্শনিক কবি ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা চৈতন্যের ধর্মমত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। চৈতন্যের নির্দেশে রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন এবং রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও জীব গোস্বামী তাঁহাদের সহিত তথায় মিলিত হন। ইঁহারা "ষট্ গোস্বামী" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের প্রভাবে পাঞ্জাব, রাজপুতনা এমনকি সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়। সনাতন ছিলেন প্রতিভাশালী পণ্ডিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'হরিভক্তিবিলাস' নামে বৈষ্ণবধর্ম-সাধন বিষয়ে একখানি সরল গ্রন্থ রচনা করেন। রূপ গোস্বামীও সংস্কৃতভাষায় রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কতিপয় কাব্য রচনা করেন, যথা—'বিদগ্ধ মাধব',—'ললিতমাধব', 'উজ্জ্বল

১। শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'।

নীলমণি', 'দানকেলীকৌমুদী', 'হংসদূত'। চৈতন্যের আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতভাষায় মহাপ্রভুর জীবন-কথা লেখেন; উহা 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামে অভিহিত, কিন্তু জনসাধারণে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যের অপর দুইজন সহচর নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষ তাঁহার দিব্যোন্মাদের বিভিন্ন অবস্থা অবলম্বন করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার গীত রচনা করেন; ঐগুলি 'গৌরপদ' নামে অভিহিত। এইরূপে চৈতন্যদেবের জীবনকালেই তাঁহার জীবনী লেখার সূচনা হয়। তাঁহার তিরোধানের পর বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বাঙ্গালা পদ্যে তাঁহার জীবন-কথা লইয়া সুবৃহৎ চরিত-কাব্য রচনা করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পারিষদবর্গের একে একে তিরোধান ঘটিলে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ গোস্বামীর দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হয়। তৎপরে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার মন্দীভূত হইয়া আসিলেও, উহা অদ্যাপি ভারতবর্ষের বহুস্থানে এবং বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহারই দ্বারা উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তিনি নিজে রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে আরাধনা করেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কল্পিত রাধাচরিত্র তাঁহার জীবনে প্রমূর্ত হইয়া দেখা দেয়। কৃষ্ণপ্রেমাকুলা শ্রীরাধার ন্যায় তাঁহারও কৃষ্ণবর্ণ মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িয়া যায়, শ্যামল তমাল তরুকে কৃষ্ণভ্রমে জড়াইয়া ধরেন, কদম্ববৃক্ষ দেখিলে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। রাধার মত তাঁহারও দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময়;—চটকপর্বত দেখিয়া গিরি-গোবর্ধন মনে করেন, যে-কোন নদী দেখিলেই উহাকে কালিন্দী বলিয়া গণ্য করেন, বন দেখিলেই বৃন্দাবন বলিয়া তাঁহার ভ্রম হয়। বস্তুতঃ, তিনি যেন একেবারে মূর্তিমতী রাধা। তাই তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী-কালের বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া রাধাচরিত্র অঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহারা প্রেমময় পরমেশ্বররূপে চিত্রিত করেন। এই কারণে গৌড়ীয়যুগের রাধাকৃষ্ণলীলা অপেক্ষা চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণ-লীলা সমধিক উন্নত, মার্জিত ও পারমার্থিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে,—মানবীয় প্রণয়লীলা ঐশ্বরিক প্রেম-সাধনায় পরিণত হয়। এই সবভাবে অনুপ্রাণিত

হইয়া এই চৈতন্যযুগে যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও দীন-চণ্ডীদাস সমধিক প্রসিদ্ধ।

মঙ্গল সাহিত্য

চৈতন্যযুগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্য ঘটিলেও লৌকিক ধর্মের একেবারে বিলোপ ঘটে নাই। বরং বহুলোকে "মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে" এবং "দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে" বলিয়া বৃন্দাবনদাস তাঁহার 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাই এযুগেও বহুসংখ্যক মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়। চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে মাধব আচার্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং মনসামঙ্গল লেখকদের মধ্যে বংশীদাস চক্রবর্তী, নারায়ণ দেব ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরাপর মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গল' উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনুবাদ-সাহিত্য

চৈতন্যযুগে বঙ্গভাষার অনুবাদ-সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নতি হয়। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা বলিয়া বহু লেখক তদ্বিষয়ক সংস্কৃত পুরাণাদি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। গৌড়ীয়যুগে মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ মাত্র অনুবাদ করেন, কিন্তু চৈতন্যযুগে ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত, মাধব আচার্য, কবিশেখর প্রভৃতি অনেকেই সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য প্রচার করা এই অনুবাদ-কাব্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া, ইহারা সাধারণতঃ 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ইহারা মনসামঙ্গল-জাতীয় মঙ্গল-কাব্য নহে। যাহা হউক, যাবতীয় ভাগবতানুবাদের মধ্যে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত-সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী চণ্ডীর মহিমা ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় লেখক মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অনুবাদগুলি 'কালিকামঙ্গল' 'দুর্গামঙ্গল' প্রভৃতি নামে অভিহিত; কিন্তু ইহারাও মনসামঙ্গল-জাতীয় মঙ্গল-কাব্য নহে। এইগুলির মধ্যে জন্মান্ধ কবি ভবানী-প্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ-গ্রন্থ হইতেছে কাশীরামদাস-বিরচিত 'মহাভারত'।

চৈতন্যযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্য অতীব বিশাল; ইহার সমগ্র পরিচয় বিস্তৃতরূপে দান করা সম্ভবপর নহে। আমরা শুধু প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দ ও প্রশংসনীয়

কাব্যসমূহের কথা সংক্ষেপে বলিব। আলোচনার সুবিধার্থে এই যুগের সাহিত্যকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করা যায়—

(১) বৈষ্ণব সাহিত্য—(ক) গৌরপদ
(খ) রাধাকৃষ্ণ পদ
(গ) চরিত-কাব্য
(২) মঙ্গল সাহিত্য—(ক) চণ্ডীমঙ্গল
(খ) মনসামঙ্গল
(গ) অপরাপর মঙ্গল-কাব্য।
(৩) অনুবাদ সাহিত্য।
(৪) পল্লী-গীতিকা।

[২] বৈষ্ণব সাহিত্য

১। গৌরপদ

শ্রীগৌরাঙ্গকে যে কেহ দুই চোখে দেখিয়াছে, সে-ই তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। তিনিও যাহাকেই কাছে পাইয়াছেন তাহাকেই দেবতার মত সাদরে দুই বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, তাহাকে লইয়া মহানন্দে হরিনাম গাহিয়াছেন। সে-ব্যক্তিও হরিনাম গাহিতে গাহিতে পাগলের মত স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে; গ্রামের লোকেরাও তাহার মুখে হরিনাম শুনিয়া "হরি হরি" বলিয়া প্রেমানন্দে নাচিয়াছে। মন্দ অভিপ্রায় লইয়াও তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কত পাপিষ্ঠ তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়াছে; তাঁহার নির্মল প্রেমাশ্রুধারায় তাহাদের চিত্তের যাবতীয় কালিমা চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে। জগাই-মাধাই নামে দুই দুর্দান্ত মদ্যপ ভ্রাতা, সত্যবাই-লক্ষ্মীবাই নামে দুই মনোহারিণী বারবণিতা, ভীলপন্থ-নরোজী নামে দুই ভয়ঙ্কর দস্যু তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া পাপমুক্ত হইয়াছে। তাঁহার দেবদুর্লভ উজ্জ্বল গৌরকান্তি, কৃষ্ণপ্রেমাকুল মনোহর মূর্তি, সুমধুর কণ্ঠের অমৃতবর্ষী হরিনাম-কীর্তন সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে, সকলের হৃদয়েই স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। তাই, তাঁহারই মধ্যে সেকালের লোকেরা তাহাদের "প্রেমের ঠাকুরকে" দেখিয়াছে, সর্বান্তঃকরণে তাঁহার পূজা করিয়াছে, জীবনে তাঁহাকে আর ভুলিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা কবিত্ব-শক্তির অধিকারী তাঁহারা সাগ্রহে তাঁহার বিভিন্ন দৈবীলীলা সুমধুর ভাষায় অঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তাঁহাদের সেই আন্তরিক কামনা নরহরি সরকারের উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে।—

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা হয় বড় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥

নরহরি সর্বপ্রথম গৌরপদ রচনা করেন। তাঁহার সমকালে বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দাস, মাধবী দাস, বল্লভ দাস, ত্রিলোচন, মুরারি, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি আরো বহু কবি বহু গৌরপদ রচনা করেন। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এক সহস্রাধিক গৌরপদ সংগ্রহ করিয়া 'গৌরপদ তরঙ্গিণী' নামে একটি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গৌরপদগুলির মধ্য দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বহুবিধ ভাববিহ্বল মূর্তি ও বিচিত্র অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ জীবন্তপ্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন গৌরপদে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, সংসার-ত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার মর্মবেদনা, নবদ্বীপবাসীদিগের নিদারুণ কাতরতা সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবির আন্তরিকতা ও বর্ণনীয় বিষয়ের বাস্তবতাগুণে এই গৌরপদগুলি অতিশয় হৃদয়স্পর্শী।

বাল্যকালে নিমাই বড়ই চঞ্চল ছিলেন। তাঁহার সেই চাঞ্চল্যের একটি মধুর চিত্র বাসুদেব ঘোষ-রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে দৃষ্ট হয়।—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা॥

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌরাঙ্গ আর গৃহকর্মে মন দিতে পারেন নাই; সর্বক্ষণ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া সজল নয়নে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন। বাসুদেবের অঙ্কিত সেই অবস্থার একটি চিত্র—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধুলায় ধুসর তনু ভূমে গড়ি যায় ॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
দিবস-রজনী গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মান-ভাব গোরাচাঁদের বাসুঘোষ গায় ॥

দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় গৌরাঙ্গ, শ্রীরাধার ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁহার শয়ন-গৃহে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। নরহরি সরকার-রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে ঐরূপ একটি আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে।—

পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গ সুন্দর, বসিয়া বিরস মনে।
রাধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর, বাসক সজ্জার ভাণে ॥
কহে শ্যামবঁধু আসিবে বলিয়া, শেষ সাজাইনু ফুলে।
গতপ্রায় নিশি কোথা কাল শশী, রজনী গেল বিফলে ॥
না আসিল কালা আর প্রেমজ্বালা, কত বা সহিব প্রাণে।
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পিরীতি, সে শ্যাম নিঠুর সনে ॥

শ্রীচৈতন্য যখন হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য কবিতে থাকিতেন, তখন লোকে আর ঘরে থাকিতে পারিত না, দলে দলে তাঁহার কাছে ছুটিযা আসিত ও পরমানন্দে হরিনাম কীর্তন করিত। এতদ্‌সম্বন্ধে বলরাম দাসের একটি পদের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক না রহিল ঘরে।
... ...
নাচিতে নাচিতে গোরা যেনা দিগে যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহ হরি গায় ॥
কুলবধূ সকল ছাড়িয়া হরি বলে।
প্রেম-নদী বহে সবার নয়নের জলে ॥

প্রেমের সাগর গৌর-সুন্দর যে সকলকেই হরিনামামৃত বিতরণ করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই গৃহত্যাগ করিবেন, তাহা পুত্রপ্রাণা শচীদেবী ও পতিপরায়ণা

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে পূর্বেই জাগিয়া উঠে। তাঁহারা উভয়েই কম্পিতকলেবর ও আতঙ্কিত মন লইয়া কাল কাটাইতেন। তাঁহাদের তৎকালীন করুণাবস্থা প্রত্যক্ষদর্শী বাসুদেব ঘোষের কতিপয় গৌরপদে সকরুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদটিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে।—

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র-চুলে।
ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারি দিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন বহি বহি দেখি।
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

গভীর রজনীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রাকালে গৌরাঙ্গদেব গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন, হতভাগিনী পত্নী জাগিয়া উঠিয়াই স্বামীর নাগাল পাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন; —কিন্তু হায়।—

শুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
... ...
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু বেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা॥

ত্বরিতে জ্বালিয়া বাত্তি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ-সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥

সেই নিদারুণ রাত্রি প্রভাত হইলে নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ পূর্বদিনের মত প্রাতঃস্নান করিয়া প্রফুল্ল মনে গৌরাঙ্গ-দর্শনে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে গিয়া হতবাক্ হইয়া দেখিলেন—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে ॥

ইত্যবসরে গৌরাঙ্গ কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লইয়া মাথা মুড়াইয়াছেন, গেরুয়া বসন পরিয়াছেন ও হাতে দণ্ড লইয়াছেন। তাঁহার সেই অপূর্ব বৈরাগ্য-মূর্তি স্নেহ-শীলা শচীমাতা সহ্য করিতে পারেন নাই। যাঁহার মুখ দেখিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের বিচ্ছেদ ভুলিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামীর মৃত্যু বিস্মৃত হইয়াছেন, শত দুঃখেও নবীন আশা লইয়া সংসার বাঁধিয়াছেন, তাঁহাকেই আজ এরূপ নিষ্ঠুরভাবে সংসার ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিলেন। বল্লভদাসের একটি পদে সেই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার তৎকালীন জ্বালাময়ী উক্তি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।—

ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥

করুণাময়ী শচীদেবী তাঁহার নয়নের মণি নিমাইয়ের কথা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি স্বপ্নে দেখিতেন তাঁহার গৌর-সুন্দর আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—মাকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না, মায়ের গলা ধরিয়া তিনি তাঁহা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন। তাঁহার

এইরূপ চৈতন্যময় অবস্থা বাসুঘোষের একটি পদে সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পদটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা।

আজিকার স্বপনের কথা শুন লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপাণে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাই বাঁধে
কি করিব কহ না উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি সদা দেখ তায়॥

২। রাধাকৃষ্ণ-পদ

শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণোপাসনার প্রবর্তন করেন। ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত প্রেম-প্রীতি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে তিনি শিক্ষা দেন। তিনি নিজেও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের আরাধনা করেন। বিরহিনী রাধার ন্যায় তিনিও কৃষ্ণের মিলন পাইবার জন্য গয়া, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থের পথে পথে কাঁদিয়া ফেরেন; অরণ্য, পর্বত, নগর,

প্রান্তর—সর্বত্র তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজেন; দিবানিশি আকুল কণ্ঠে কৃষ্ণ-নাম কীর্তন করেন। তাই, তাঁহার সময় হইতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বাঙ্গালীর বড়ই প্রিয় হইয়া উঠে, এবং জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, দীন চণ্ডীদাস, প্রভৃতি বহু কবি উহা অবলম্বন করিয়া বহু সুমধুর পদ রচনা করেন। তাঁহাদের হাতে পূর্বযুগের বড়ু চণ্ডীদাসাদির রাধাকৃষ্ণলীলা মার্জিত হইতে থাকে, এবং সাধারণ মানবীয় প্রেমলীলা হইতে উহা অসাধারণ ঐশ্বরিক প্রেমে উন্নীত হয়। এইহেতু পূর্বকালের রাধাকৃষ্ণের সহিত একালের রাধাকৃষ্ণের চরিত্রগত পার্থক্য দেখা দেয়। এই পার্থক্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে কৃষ্ণ ও রাধার চরিত্রের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাধাকৃষ্ণ লীলার বিবর্তন

শ্রীকৃষ্ণের কথা অতিশয় প্রাচীন ও কালক্রমে তাহা রূপান্তরিত হয়;—ঐতিহাসিক কৃষ্ণ স্বর্গের দেবতায় পরিণত হন। শ্রীকৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি,—আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, তাহার অকাট্য প্রমাণ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র' নামক গ্রন্থে দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক, তাই কালপ্রবাহে বহু অলৌকিক কল্পনা তাঁহার প্রকৃত জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়ে। ব্যাসের মহাভারতে কৃষ্ণ-জীবনের যে সমুদয় কথা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যথাযথ বলিয়া মনে হয়; অবশ্য মহাভারতেও কালক্রমে বহু প্রক্ষেপ ঘটে ও কৃষ্ণের জীবনী কতকটা বিকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ বিকৃতির অপসারণ করিয়া প্রবল প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র অঙ্কন করেন, তাহাতে তিনি যে আদর্শ মানব ছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় থাকে না। মহাভারতে তাঁহার মানবত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ; তিনি মানুষ হইলেও, সাধারণ মানব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তিনি ছিলেন মহামানব,—মনুষ্যের যাবতীয় বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ তাঁহার চরিত্রে;—তিনি আদর্শ কর্মী, পরম জ্ঞানী, উদার ধার্মিক, বিশ্বপ্রেমিক, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, দুর্দমনীয় বীর, সুচতুর রাজনীতিক, সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য। মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ তিনি, কিন্তু কোনরূপ দৈবীশক্তির অধিকারী তিনি নহেন।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ

মানবজাতি চিরদিন আদর্শের পূজারী;—আদর্শ-মানুষের উপাসনা তাহারা চিরকাল করে; তাহারই পরিণামে কৃষ্ণ ক্রমে উপাস্য দেবতায় উন্নীত হন।

তিনি গোলোক-বিহারী বিষ্ণুর অবতার; পৃথিবীর পাপভার দূর করিতে মনুষ্যরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ। তাঁহার এই অবতারত্ব হিন্দুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীগীতাতে সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত হয়। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাদিতে সেই দেবত্বের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং অবশেষে তিনি রীতিমত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী বংশীধারী পরমেশ্বরে পরিণত হন।

পৌরাণিক কৃষ্ণ

মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে যৌবনাবস্থায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় সর্বপ্রথম আমরা দেখিতে পাই। তখন তিনি ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ বীর; কংসাসুরকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং যাদব-রাজ্য দ্বারকায় স্থানান্তরিত করিয়া উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনন্তর, তাঁহাব দ্বারা শিশুপাল-বধ, কৌরবযুদ্ধে যোগদান ও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি পরিণত বয়সের ক্রিয়াকলাপ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরেব কোন কথাই মহাভারতে নাই;—বৃন্দাবনে দৈবলীলা, গোপীদের সহিত প্রণয় ও রাধার সঙ্গে প্রেম—এ সমস্ত কিছুই মহাভারতে নাই। বস্তুতঃ কৃষ্ণের বাল্যজীবন মহাভারতে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে পুরাণকারেরা তাঁহাব বাল্যলীলা বিষয়ে ইচ্ছামত কাল্পনিক কাহিনী সৃজন করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। পুরাণকারদের কৃপাতেই বসুদেব-পুত্র মহাবীর কৃষ্ণ অবশেষে নন্দ-দুলাল ব্রজের গোপালে পরিণত হইয়াছেন।

মহাভাবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত পদাবলী-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কোনই সাদৃশ্য নাই। পদাবলীতে রাধা-চরিত্রের প্রাধান্য; রাধাব লীলার সঙ্গে কৃষ্ণের নামটা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কৃষ্ণের যে বাল্যলীলা পদাবলীতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার সহিত মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপের কোনই সামঞ্জস্য নাই। যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গের উপরে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেন, কুরুক্ষেত্র মহারণে সারথ্যের ভার নেন, শিশুপাল-জরাসন্ধ প্রভৃতি প্রতাপান্বিত রাজাদের পদানত করেন, তাঁহার সারাটা বাল্যকাল কাটে শুধু বাঁশী বাজাইয়া, ধেনু চরাইয়া, যমুনার জলে গোপীদের সাথে সাঁতার কাটিয়া, আর গোপনে গোপনে রাধার সঙ্গে গভীর প্রণয় করিয়া! বরং ভাগবতের কৃষ্ণের সহিত মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়;—কালীয়দমন, ইন্দ্রপূজা-নিবারণ, বকাসুর-

পদাবলীর কৃষ্ণ

বধ প্রভৃতি যে সমুদয় বীরত্বব্যঞ্জক অসাধারণ কর্ম তিনি বাল্যকালেই অবলীলাক্রমে সাধন করিতেছেন, তাহাতে তিনি যে অচিরে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র পরিচালনা করিবেন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার পরিণত বয়সের কর্ম-সাধনার প্রস্তুতি যেন এই ভাগবতে। তবে, ভাগবতের কৃষ্ণও গোপীদের লইয়া রাসলীলা করিয়াছেন;—এইদিক দিয়া বৈষ্ণবের কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, এইরূপ নানাকারণে আমাদের অনুমান হয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী একটা স্বতন্ত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী, উহার সহিত মহাভারতের কৃষ্ণজীবনীব কোনই সম্বন্ধ নাই।

মানুষের হৃদয়ে যতগুলি বৃত্তি আছে, সেগুলির মধ্যে প্রণয়বৃত্তির দ্বারাই মানব-জীবন সমধিক আন্দোলিত হয়। তাই মানুষের কাছে ভালবাসার মত আর কিছুই মধুর নহে। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগে প্রেমের মাধুর্য লইয়া অজস্র কাব্য, কবিতা, নাটক, গীত রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশেও সুদূর অতীতকালে এইরূপ প্রেমের কাহিনী রচিত হইয়া থাকিবে। তাহারই বর্তমানরূপ এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। প্রেমের এমনই আশ্চর্য মহিমা যে, প্রণয়ের স্রোতে লাজ-মান-ভয় সবই ভাসিয়া যায়। রাজকুলবধূ বনের রাখালের প্রেমে পড়িয়া উন্মাদিনী হয়, আঁধার নিশীথে কণ্টকময় বনে তাহাকে খুঁজিয়া ফেরে;—আবার রাখাল-বালকও সুযোগ বুঝিয়া দেয়াশিনী, মালিনী পসারিণী প্রভৃতিব ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার প্রাণপ্রিয়ার সহিত অন্তঃপুর-মধ্যেই সাক্ষাৎ করিয়া আসে। এই ধরণের কোন প্রেমের কাহিনী রাধার নামে পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে; তিনি মহাবীর ও মহাপ্রেমিক বলিয়া সর্বসাধারণে গৃহীত হইতে থাকেন। তাই এই প্রেমময় কৃষ্ণের নামের সঙ্গে অবশেষে প্রেমময়ী রাধার প্রণয়লীলা সংযুক্ত হইয়া পড়ে। আদিতে কিন্তু কৃষ্ণজীবনীর সঙ্গে রাধার প্রেমের আদৌ সম্বন্ধ ছিল না। সেই লৌকিক রাধা-কাহিনীর নায়কের প্রভাব ভাগবতের কৃষ্ণের উপরে পড়িয়াছে। পরে আবার ভাগবতের প্রভাবে সেই লৌকিক কাহিনী কোথাও কোথাও ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহারই উপরে বৈষ্ণবপদাবলী-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলার ভিত্তি সংস্থাপিত; মহাভারত বা ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণে নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহারই অবিকৃত রূপ অনেকটা যেন দেখিতে পাই। ইহার শুধুমাত্র সূচনায় 'জন্মখণ্ডে' ভাগবতের প্রভাব আছে,

রাধাকৃষ্ণ

কিন্তু ইহার অন্তর্গত তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড প্রভৃতি অপরাপর অংশে ভাগবতের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসাদির পদাবলীতে ভাগবতের কোনই প্রভাব নাই, অসুর-বধের প্রসঙ্গমাত্র নাই। অতএব, বৈষ্ণবপদাবলীর কৃষ্ণের উৎপত্তি মহাভারত বা ভাগবত হইতে নহে, তাঁহার ভিত্তি বাঙ্গালার কোন সুপ্রাচীন লৌকিক কাহিনীতে, যে-কাহিনীর সুরসিক নাগর রাখাল-বালকটি আজ কৃষ্ণ নাম ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

এইখানে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। ভাগবতাদি-বর্ণিত অবতার-লীলায় শ্রীভগবানের স্বভাবে দুইটি ভাব লক্ষিত হয়,—একটি কঠোর অপরটি কোমল। একদিকে তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও দুষ্কৃতের শাস্তিবিধান করেন; এই দিকটায় তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত মহাশক্তিশালী, এই দিকটাকে বলে "ঐশ্বর্য"। অপর দিকে তিনি প্রেমময়, তাঁহার করুণা হইতে সুরাসুর কেহই বঞ্চিত নহে, সকলেরই অন্তরের সহিত তিনি গোপনে প্রণয়লীলা করেন,—তিনি অনন্ত প্রেমময়, পরমসুন্দর, এইদিকটাকে বলে "মাধুর্য"। ভাগবতাদি পুরাণে ঐশ্বর্যের প্রাধান্য, আর বৈষ্ণবপদাবলীতে মাধুর্যের প্রকাশ। এইহেতু ভাগবতে পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত্ত, কালীয়, বকাসুর প্রভৃতি অসুর-নিধনের কথা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; বৈষ্ণবপদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীবাদন, কুসুমিত যমুনাতটে গোপবালাদের সাথে প্রণয়-বিলাস, পরমা রূপসী শ্রীরাধার সহিত সংগোপনে প্রেমের মিলন, সেই মিলনের ছলে গোষ্ঠলীলা দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি কত বিচিত্র প্রেমলালা অবিরাম বহিয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, এই উভয়ভাবেই দেবতার আরাধনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্যে দেবতা দেবতাই থাকেন, ভক্ত দূর হইতে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রণতি নিবেদন করে,—ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি এইরূপ সাধকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাধুর্যে দেবতা মানুষের স্তরে নামিয়া আসেন, হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া ভক্ত তাঁহাকে আপন করিয়া লয়,—বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ এইরূপ সাধকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বৈষ্ণবেরা এই মধুর ভাবের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন। ইহাকে রাগাত্মিকা সাধনা বলে, যাবতীয় ভজন-সাধনের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া এতদ্বিষয়ে বলাইয়াছেন—

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম ॥

রাধাকৃষ্ণলীলায় আধ্যাত্মিকতা

যে ব্যক্তি ভগবানকে নিজের পুত্র, পতি বা সখার মত ভালবাসে, তাহাকে তিনি ধরা দেন,—যে তাঁহাকে নিজের সমান গণ্য করে, তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহাকেই তিনি ভালবাসেন। তিনি জ্ঞানময়, শক্তিময় ও ঐশ্বর্যময় হইলেও, বৈষ্ণবের চক্ষে তিনি শুধু প্রেমময়। পিতা যেমন দুষ্ট সন্তানকে স্নেহ করেন, জগদীশ্বরও তেমনি সাধু-অসাধু সকলকেই ভালবাসেন। কাহাকেও বধ করিবার নিমিত্ত তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপ পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রেম-মার্গের বৈষ্ণব সাধকেরা সমর্থন করেন না। তাই, চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণাবতারের হেতু ভিন্নভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন ।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥

কৃষ্ণাবতারের এই নূতন কারণ—প্রেমাস্বাদন ও রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচার—শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে নির্দেশিত হয়। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করায় জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

দাস-সখা পিতামাতা-কান্তাগণ লয়্যা ।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়্যা ॥
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান ।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান ॥
চিরকাল নাহি করি প্রে[illegible] দান ।

ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥

... ...

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় ।

অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥

অর্থাৎ, কৃষ্ণাবতারের পর শ্রীভগবান নরলোকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার জন্য কলিকালে শ্রীচৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হন। এই প্রেমভক্তির সাধন-বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারিরস ।

চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥

দাস্যভাবে সাধক নিজেকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া মনে করে; ইহার দৃষ্টান্ত অক্রূর, উদ্ধব প্রভৃতি। সখ্যভাবে ভক্ত ভগবানকে সখা বলিয়া গণ্য করে; যথা সুবল, সুদাম, শ্রীদাম প্রভৃতি। বাৎসল্যভাবে উপাসক শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সন্তান বলিয়া মনে করে; ইহার উদাহরণ যশোদা। শৃঙ্গার বা প্রেমভাবে সাধক পরমেশ্বরকে প্রাণবল্লভরূপে আরাধনা করে, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীরাধা। এই চতুর্বিধ সাধন-পদ্ধতির মধ্যে প্রেমভাব সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রেম দ্বিবিধ—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম, তাহা স্বকীয়া বা বৈধ প্রেম; পর-পুরুষ বা পরস্ত্রীর প্রতি যে প্রেম, তাহা পরকীয়া। রসিকচূড়ামণিদের মতানুসারে,—আপনজনকে ভালবাসিয়া যত সুখ, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পরকে ভালবাসিয়া। পরের প্রতি ভালবাসাকে "পীরিতি" বলে। এই পীরিতির দ্বারা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায়। আমাদের সাংসারিক জীবন হইতে ঈশ্বরকে আমরা একেবারে পর করিয়া রাখি; স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে আমরা সর্বদা ভালবাসি, কিন্তু ভগবানকে ভালবাসিবার কথা আমাদের মনে একবারও জাগে না। কাজেই, ঈশ্বরের মত পর আর কেহই আমাদের নহে। এই পরম পরের সহিত পীরিতি করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে বৈষ্ণবসাধকেরা নির্দেশ দেন। পীরিতির লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত আছে—

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্যা নায়িকা ।

যেইভাবে হেরে তারে হয়ে রাগাত্মিকা ॥

কোন সুন্দর পুরুষ দেখিলে ভ্রষ্টা স্ত্রী যেভাবে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঈশ্বরের প্রতি সেইভাবে অনুরক্ত হইতে হয়। ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ সানুরাগ প্রেমের সাধনাকেই বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণলীলার সাহায্যে রূপায়িত করিয়া

তুলিয়াছেন। এই নিখিলবিশ্ব—জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর আকর্ষণের চিরন্তন লীলাখেলা ; তাহারই অপরূপ চিত্র বৈষ্ণবপদাবলীতে। ভগবানকে নহিলে ভক্তের চলে না, আবার ভক্ত না থাকিলে ভগবানেরও লীলাখেলা হয় না। তাই পদাবলীতে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ প্রবল অনুরাগিণী, কৃষ্ণকেও সেইরূপ রাধার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত দেখি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে, চৈতন্যদেব বৈষ্ণবপদ শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন,—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥

মহাপ্রভুর স্পর্শমণির প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হয়, মানবীয় প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলীতে এই বিশুদ্ধ প্রেমের কথাই সরসভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে চৈতন্যপরবর্তী দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর তুলনা করিলে, এই পরিবর্তন সহজেই ধরা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বাস্তব নারী, গৃহবধূ,—কৃষ্ণের সংশ্রব তিনি প্রথমে পছন্দ করেন নাই ; কৃষ্ণের বলপূর্বক আলিঙ্গনে তাঁহার বিষ খাইয়া মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু দীনচণ্ডীদাসের রাধা অনুরূপ ঘটনায় কৃষ্ণের বাহুমধ্যে নিজেকে সানন্দে সমর্পণ করেন এবং প্রেমের আবেগে গদ্‌গদ হইয়া কৃতজ্ঞতা জানান,—

আজু দান মোর হইল সফল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল
বিকি কিনি হ'ল রঙ্গ॥

কৃষ্ণকে দেখার আগে শুধু তাঁহার নাম শুনিয়াই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন।—

সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব, সই, তারে॥

ইহা সাধারণ রমণীর চিত্র নহে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, গুরু যখন শিষ্যের কানে ইষ্টমন্ত্র প্রথম জপ করেন, তখন শিষ্যের চিত্তে সহসা ঈশ্বরানুরাগ জাগিয়া উঠে, ইষ্টনাম জপিতে জপিতে তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে ;—ইহা যেন তাহারই রঙিন ছবি।

কৃষ্ণনাম-মুগ্ধা রাধা যমুনার তটে এক কুঞ্জকাননে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু শুধু নয়নে নয়নে দর্শনমাত্র, স্পর্শ বা আলাপন কিছুই হয় নাই। অথচ এই সামান্য সাক্ষাতের পরেই রাধা একেবারে মহাযোগিনী হইয়া উঠেন। তাঁহার আর গৃহকর্মে মন বসে না, বাঞ্ছিতজনকে আর একবার দেখিবার জন্য বারে বারে বাহিরে আসেন।—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥
বাম করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরই ধারা॥

রাধার এইরূপ অস্থিরতার আর একখানি আলেখ্য—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসি যাও।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চাও॥

এইরূপ আচরণ কোন "সামান্যা নায়িকার" মত নহে। ইহা ঈশ্বরদর্শনাকুল সংসারবিরাগী সাধকের অবস্থা ; যে অবস্থা গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনের পর শ্রীগৌরাঙ্গের হয়। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়াও, গয়ার সেই অনির্বচনীয় দিব্যভাব তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। সেই অপূর্ব স্মৃতি স্মরণ করিয়া তিনি সর্বদা উন্মনা হইয়া থাকিতেন, কখন কখন অস্থির হইয়া পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' তাঁহার সে-অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে।—

না লয় চন্দন মালা না পরে বসন।
নিগমে বসিয়া থাকে কান্দে সর্বক্ষণ ॥
চাঁচর কেশ না বান্ধে না শুনে কারো কথা।
ভোর দুপুর বেলা গৌর যায় যথা তথা ॥

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, গৌরাঙ্গের প্রভাবেই নায়িকা রাধা পরমা সাত্ত্বিকায় পরিণতা হইযাছে। চৈতন্যপরবর্তী রাধাচরিত্রে চৈতন্যদেবেব দিব্যভাবের ব্যঞ্জনা আছে ; রাধাচিত্রের অন্তরালে গৌরসুন্দরের অশ্রুসজলমূর্তি ভাসিয়া উঠে। আবার, গৌরাঙ্গের জীবনে রাধাভাবের জীবন্ত বিকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জীবনী-লেখকেরাও তাঁহার চরিত্র রাধার অনুরূপ করিয়া অঙ্কন করেন। এই কারণে "চরিতশাখা পদাবলীর দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে, এবং উভয়ই গৌরহরিব লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে।"[১] কৃষ্ণপ্রেমাকুলা রাধার অজ্ঞানাবস্থা বর্ণন কবিতে গিয়া দীনচণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—"তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে ॥" বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবতে' সার্বভৌমের গৃহে চৈতন্যকেও এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়,—"সূক্ষ্মতুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধবিল। ঈষৎ চলযে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল ॥" রাধা কাহারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে তাহার চরণ ধরিতেন,—"অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তাব পায় ॥" গোবিন্দদাসের "কড়চায়" চৈতন্য সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে,—"প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥" এইরূপে কৃষ্ণপ্রেমাকুল গৌরাঙ্গচরিত্রের আলোকপাতে চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে। পূর্বযুগের বিদ্যাপতির রাধা যৌনধর্মানুযায়ী কৃষ্ণরূপে বিমুগ্ধা ; আর দীনচণ্ডীদাসের রাধা নৈসর্গিক ধর্মানুসারে বিশ্বপতিব মহিমায় বিমোহিতা। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা প্রকৃতই নারী, কিন্তু দীনচণ্ডীদাসের রাধা কোন নারী নহে, উহা একটা মহাভাব, ঈশ্বরাকৃষ্ট ভক্তের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাস।

রাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গ

চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলীতে শ্রীমতী রাধার কৃষ্ণ-প্রেম-সাধনার যে বিভিন্ন অবস্থা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধানতঃ চারি স্তরে ভাগ করা যায় ;—

১। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

(১) পূর্বরাগ—কৃষ্ণের নাম শুনিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য রাধার মনে সহসা দুর্বার আকাঙ্ক্ষার উদয়। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শ্রবণে বা যে কোন কারণে মানুষের মনে ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছার প্রকাশ পূর্বরাগ।

ঈশ্বর-প্রেম-সাধনার চারি স্তর।

(২) প্রথম মিলন—বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রথম মিলন। কিন্তু এই মিলন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। গুরুর কৃপায় বা দৈববশে ভক্তের হৃদয়ে একদিন ঈশ্বরানুভূতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু এই অনুভূতি প্রথমে স্থায়ী হয় না ; তবে উহার স্মৃতি ভক্তের মনকে ব্যাকুল করিয়া রাখে। এইরূপ ঈশ্বরভাব-বিহ্বলতার অভিব্যক্তি প্রথম মিলন।

(৩) বিরহ—রাধার সঙ্গে প্রেম করিয়া কৃষ্ণ অকস্মাৎ মথুরায় চলিয়া গেলেন ; রাধা বিরহানলে পুড়িতে লাগিলেন। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগিয়াছে, অথচ ভক্ত তাঁহাকে চিরদিনের মত ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ইহার নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। তাই বিরহের জ্বালায় বিদগ্ধ হইয়া রাধা কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন।

(৪) ভাব-সম্মিলন—বিরহিণী রাধা অবশেষে স্বীয় অন্তর্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্মিলিতা হন। নিরন্তর ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়া ভক্ত তাঁহার মন হইতে বাসনা, কামনা, অহমিকা—সবই বিসর্জন দেন, একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহার সর্বস্ব হইয়া উঠে। তখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা সম্মিলিত হয়—সাধকের মুক্তি ঘটে।

বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদগুলিতে প্রেমধর্ম-সাধনার বিভিন্ন স্তর একে একে সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মের সাধন-মন্ত্রও বলা যাইতে পারে। এই সাধনার সারমর্ম বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।—

আমাদেরি কুটির-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,

কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

—আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণে যে সব সুন্দর ফুল ফোটে, সেইগুলি দিয়া মালা গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় আমরা পরাইয়া দেই। আবার সেই ফুল দিয়াই আমরা দেব-পূজার অঞ্জলি রচনা করি। আমাদের অন্তরে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে-সব হৃদয়ভাব আছে, সেগুলি এই নির্মল পুষ্পের মতই পবিত্র ও সুন্দর। এইগুলি দিয়া আমরা পত্নীকে ভালবাসি, পুত্রকে স্নেহ করি, বন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরি ; এইগুলি হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমাদের নাই। অতএব এই অন্তরের ভালবাসা দিয়াই ঈশ্বরকে আমাদের পূজা করিতে হইবে। তাঁহারই দেওয়া ভালবাসা দিযা তাঁহাকেও ভালবাসিতে হইবে, তবেই জীবনের পরিপূর্ণতা, তাহাতেই পরমানন্দ।

চৈতন্যযুগে ব্রজবুলিতে বৈষ্ণবপদ-রচনার সূচনা হয়, এবং অল্পকাল-মধ্যেই এই সুললিত ভাষায় বহু পদকর্তা সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেন। শ্রীখণ্ডের অধিবাসী বৈদ্যজাতীয় যশোরাজ খান সর্বপ্রথম ব্রজবুলি-পদ রচনা করেন।

প্রসিদ্ধ পদকর্তৃবৃন্দ

তাঁহার রচিত একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার আগ্রহে গৌরাঙ্গিনী রাধা ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহার বেশভূষা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত
আর পয়োধর গোর।
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর
কোরে মিলন জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ-পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।

নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান ॥

পদটিতে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের নামোল্লেখ আছে; তিনি ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কাজেই পদটি ঐ সময়ের মধ্যে রচিত। যশোরাজের পরে শ্রীচৈতন্যের পরম সুহৃদ রামানন্দ রায় ব্রজবুলিতে পদ-রচনা করেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার রচিত নিম্নোদ্ধৃত পদটি স্বয়ং মহাপ্রভু মহানন্দে শ্রবণ করেন; কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতে পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। "এই পদটি ১৫০৪ হইতে ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।"[১] প্রেম গভীর হইলে নায়ক-নায়িকার মধ্যে আর কোন ভেদ থাকে না; এই প্রেম-তত্ত্ব পদটিতে প্রস্ফুট হইয়াছে।—

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বৰ্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

রামানন্দ রায়ের পরে মুরারিগুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন প্রভৃতি

১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

চৈতন্যের সমসাময়িক বহু বৈষ্ণবকবি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালাভাষায় বহু সুমধুর পদ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেও বহু বৈষ্ণবকবি আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে লোচনদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, কবিরঞ্জন ও দীনচণ্ডীদাস সুবিখ্যাত। দীন-চণ্ডীদাস সকল পদকর্তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কবিরঞ্জন ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতির মত সুললিত পদরচনায় অদ্বিতীয়; তাই তিনি "ছোট বিদ্যাপতি" নামে অভিহিত হন। অপরাপর পদকর্তার মধ্যে বংশীদাস, রায়শেখর, যদুনন্দন, জগদানন্দ, শিবানন্দ, শশিশেখর, পীতাম্বর দাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

(১) নরহরিদাস সরকার

গৌরপদের সর্বপ্রথম রচয়িতা নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মমূলক রাধাকৃষ্ণ-লীলা বাঙ্গালা পদে সর্বপ্রথম রচনা করেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্বে যশোরাজ খান ও রায় রামানন্দ এই জাতীয় পদ দুই-চারিটি ব্রজবুলিতে রচনা করেন বটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের কোন লীলা তাঁহারা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন নাই। বিদ্যাপতি বড়ুচণ্ডীদাসের মানবীয় প্রেমের স্থলে ঐশ্বরিক প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা নূতনভাবে অঙ্কন করিতে তিনিই সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হন। পরে, দীন চণ্ডীদাসের প্রতিভায় উহা প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত হয়। নরহরি শুধু রাধার পূর্বরাগ বহু পদের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে বর্ণন করিয়াছেন; মিলন ও বিরহ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কতিপয় পদ রচনা করিয়াছেন।

১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পিতা নারায়ণদাস সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলজাত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ তৎকালীন গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের তন্ময় ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি নবীন বয়সে অতিশয় মুগ্ধ হন ও তাঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লইয়া আমরণ কৃষ্ণপ্রেম-সাধনা করেন; দার পরিগ্রহ করিয়া কোন দিন সংসারী হন নাই। শ্রীখণ্ডে তাঁহার বাসভবনে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহাদের পূজার্চ্চনার প্রথা প্রবর্তন করেন। 'গৌরাঙ্গাষ্টকমালিকা' নামে শ্রীচৈতন্যের পূজাবিষয়ে একটা স্তোত্র এবং 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' ও 'ভক্তামৃতশতক' নামে দুইটি ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা

করেন। তাঁহার প্রভাবে শ্রীখণ্ড-অঞ্চল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটা কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ—উভয় বিষয়েই নরহরি বহু পদ রচনা করেন। গৌরপদের সংখ্যাই বেশী এবং ঐগুলিই বেশী হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার রচিত গৌরপদের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর কোন কোনটি সুমধুর কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং উহার পরিণামে কোন কোন পদ দীনচণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে। দীনচণ্ডীদাসের মত তিনিও 'পিরীতি-'রসের সুরসিক ছিলেন। তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর সূচনাতেই পূর্ণমাসি-ঠাকুরাণী তাঁহার নবীনা নাতিনী রাধিকাকে 'পিরীতি'-র মর্ম বুঝাইয়া দিতেছেন।

শুন গো রাধিকা, পরাণ অধিকা, পিরীতি মরম কৈ।
পিরীতি হইতে এ তিন ভুবনে বাড়াধন আর নাই॥
যুবতী হইয়া, রসিক লইয়া, রস পান করে যে।
কত সুখে সে কাটায়ে কাল, তাহা বা জানিবে কে॥
ধরম করম বড়ই বিষম, অনেক যতনে হয়।
তা সঞে পিরীতি কর গো যুবতী, পাইবে রসিক রায়॥
কহে নরহরি, শুন গো সুন্দরী, পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার জীবন তার॥

পূর্ণমাসির কৌশলে রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর সাক্ষাৎ ও প্রবল অনুরাগের সঞ্চার হয়। পিরীতি-মন্ত্রমুগ্ধা কিশোরী বালা তাঁহার নবপরিচিত রসিক নাগরের সহিত মিলিত হইবার জন্য বড়ই ব্যাকুলা হইয়া পড়ে, গৃহকাজে তাহার মন আর বসে না, শয়নে ভোজনে কিছুতেই আর তৃপ্তি নাই।—

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে।
শ্যাম-অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে॥

আগমে পিরীতি মোর নিগমে অসার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িনু পাথার ॥

এই পদটিতে পূর্বরাগের তীব্র জ্বালা সরসভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদটিতে প্রণয়জাত ঈর্ষা মর্মান্তিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পদটিতে দীন চণ্ডীদাসের সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।—

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যেদিনে দেখিব আপন নয়ানে কহে কার সনে কথা।
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিলাম লোকে অপযশ কয়।
এ ধন-পরাণ লএ আন জন তা না কি আমারে সয় ॥
কহে নরহরি শুন লো সুন্দরি কারে না করিহ রোষ।
কানু গুণনিধি মিলাওল বিধি আপন করম দোষ ॥

নরহরি সরকার 'নাগরীপদের' প্রবর্তক। "ব্রজলীলায় গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগ ও অনুরাগেব যে-সকল পদ আছে, পদকর্তৃগণ তদনুকরণে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পদ বৈষ্ণব সমাজে নাগরী-পদ বা রসের পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়া-নারীগণ যেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছেন।"[১] কৃষ্ণমুগ্ধা রাধার মত নরহরিও গৌরসুন্দরের অতিশয় অনুরাগী হইয়া পড়েন। সর্বক্ষণ গৌরাঙ্গের মিলন কল্পনা করিবা তাঁহার হৃদয় রস-বিভোর হইয়া রহে। রাধার মত তিনিও স্বপ্নযোগে গৌরাঙ্গের মিলন লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া উঠেন।—

নাগরীপদ

রজনী স্বপন, শুন গো সজনি, বলি যে নিলজী হইয়া।
ধীরে ধীরে গোরা, মন্দিরে প্রবেশে, চকিত চৌদিকে চাঞা ॥
হাসিয়া হাসিয়া, রসিয়া রসিয়া, আসিয়া সিথান পাশে।
নিজ করে মোর, অধর পরশি, সুখের সায়রে ভাসে ॥

১, জগবন্ধু ভদ্র, 'গৌরপদতরঙ্গিনী'।

সুমধুর বাণী, ভণে নানাভাতি, মাতিয়া কৌতুক ছলে।
ভুজে ভুজ দিয়া, হিয়া মাঝে রাখি, ভিজয়ে আঁখির জলে॥
আপনার মনে মানে, পাইনু রতন ধনে, তিলেক ছাড়াইতে ভার।
নরহরি প্রাণ-পিয়া পীরিতের মূরতি কি কব আর॥

এইরূপ পিরীতি-রসের সহিত গৌরাঙ্গ-ভজনাকে 'নাগরী-উপাসনা' বলে। নরহরির প্রিয়শিষ্য লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে গৌরাঙ্গের চরিত্রে এইরূপ নাগরভাব অর্পণ করিয়াছেন। ত্রিলোচন প্রভৃতি কতিপয় পদকর্তাও চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মতই মনোহররূপে চিত্রিত করেন। ত্রিলোচনের রচিত একটি গৌরপদে দেখা যায়, বৃন্দাবনের গোপ-বধূদের মত নদীয়ার কুলকামিনীরাও বিবাহ-বাসরে গৌরাঙ্গের গায়ে হলুদ দিতে গিয়া মনে মনে তাঁহার মিলন কামনা করে।—

আলো সই, নাগরে দেখিয়া বাসর ঘরে।
মন উচাটন প্রাণ ছল ছল চিত যে কেমন করে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের অঙ্গেতে হলুদ দিতে সই গিয়াছিনু।
সে রূপের আগে হলুদ মলিন, রূপয়ে ঝুরিয়া মনু॥
মনু মনু মনু সখি গো, হেরিয়া গৌরাঙ্গ-রূপে।
সাধ হয় হেন কনে হই পুনঃ এ বরে দি সব সঁপে॥
অঙ্গের সৌরভে আকুল করিল, কি তার পুণ্যের জোর।
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর॥
আঁখির ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাঁকা।
পিরীতি ছানিয়া কে থুইল তাতে, চাহনি পিরীতি মাখা॥
ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি শুন, হিয়াটি কর লো দড়।
পরের নাগরে পরাণ সঁপিলে কলঙ্ক হইবে বড়॥

(২) দীনচণ্ডীদাস

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের অনতিকাল-পরবর্তী পদকর্তৃগণের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের তিনজনের পদেই ন্যূনাধিক পরিমাণে দীনচণ্ডীদাসের প্রভাব দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ "জ্ঞানদাসের কবিতায় চণ্ডীদাসের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।…পদকর্তা চণ্ডীদাস

যে জ্ঞানদাসের পূর্ববর্তী, জ্ঞানদাসের কবিতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"[১] অতএব, পার্থিব জগৎ হইতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ও বৈষ্ণবসাহিত্য-জগতে জ্ঞানদাসের আবির্ভাব,—এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তীকালে দীনচণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। ইনি এতকাল শুধু চণ্ডীদাস-নামেই বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু-চণ্ডীদাসের নাম আবিষ্কৃত হইবার পরে তাঁহার নামেব পূর্বে 'দীন' উপাধি যুক্ত কবা হয়। তাঁহার রচিত অনেক পদেব ভণিতাতেও 'দীনচণ্ডীদাস' নাম দেখা যায়।

বড়ু, দীন, দ্বিজ প্রভৃতি বিবিধ উপাধিযুক্ত বিভিন্ন চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু বৈষ্ণবপদ দেখিতে পাওযা যায়। ইহাতে অনেকে একাধিক চণ্ডীদাসেব অস্তিত্ব অনুমান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রবীণ অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশযেব মতে—একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব' পদগুলি বড়ু-চণ্ডীদাসের রচনা, চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অপর সকল পদই একমাত্র দীন-চণ্ডীদাসের; এই দুইজন ব্যতীত অপর কোন তৃতীয় চণ্ডীদাস নাই;—প্রথমজন শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী এবং দ্বিতীয়জন পববর্তী। কিন্তু বায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে—চণ্ডীদাস-নামে শুধুমাত্র একজন কবিই ছিলেন এবং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস-পদাবলীব কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি ও ভাব-গত পার্থক্য লক্ষ্য করিলে, দুইজন চণ্ডীদাসেব বিদ্যমানতা সহজেই প্রতীত হয। চণ্ডীদাসেব ভণিতাযুক্ত সকল পদেই একই সুর, একই ভাব, একই বিষয়েব ক্রমবিকাশ;—কেবলমাত্র একজন কবিব হস্তস্পর্শ সর্বত্র অনুভূত হয়। জ্ঞানদাসাদির পদে তাঁহার প্রবল প্রভাব হইতে অনুমান হয়, তিনিও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীর কবি। তিনিই এখন 'দীনচণ্ডীদাস' নামে অভিহিত।

দীনচণ্ডীদাসের জীবন-কথা বিষয়ে কোন কিছুই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী জনসাধারণে প্রচলিত আছে। দুই-চারিখানি প্রাচীন পুঁথি ও বিচ্ছিন্ন পাতায তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ আছে। 'চণ্ডীদাস-চরিত' নামে একটি পুরাতন পুঁথি শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে এত বেশী [illegible] ঘটনার সমাবেশ আছে যে, উহাকে চণ্ডীদাসের যথার্থ জীবন-চরিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, এই সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া অনুমান

১, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'পদামৃত মাধুরী'।

হয়, এই অপূর্ব প্রতিভাশালী কবি সাধারণ মানুষ হইতে অনেক বিষয়েই অতিশয় অসাধারণ ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর নামক গ্রামের এক দেবমন্দিরে তিনি বাশুলীদেবীর পূজারী ছিলেন। এই দেবালয়ের সেবিকা রামমণি বা রামী নাম্নী এক রূপসী কিশোরী ধুবনী তাঁহার অন্তরে প্রণয়ভাব জাগাইয়া দেয়। তাহারই সাহচর্য লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশ্চর্য কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। নির্মলচরিত্রা রামীর কামনাশূন্য ভালবাসা তাঁহার চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেমের অনুভূতি উৎপাদিত করে; তাহারই ফলে তিনি রাধাকৃষ্ণের কামগন্ধহীন প্রেমলীলা অনুপম কবিত্বের সহিত অঙ্কন করেন। এই নীচজাতীয়া রমণীর সংশ্রববশতঃ তিনি সমাজে পতিত হন; কিন্তু তাঁহার সুমধুর কবিত্বে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালীন গৌড়ের সুলতান-মহিষী তাঁহার ললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিমোহিতা হন এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। ইহাতে সুলতান অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিধ্বংসী কামানের গোলায় সঙ্গীত-রত চণ্ডীদাসকে তাঁহার কীর্তন-দল-সহ ধূলিসাৎ করিয়া দেন। রামীর রচিত একটা প্রাচীন কবিতা পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে কবির এই আকস্মিক মৃত্যুর কাহিনী জানা যায়। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবির জীবন-সম্বন্ধে এই প্রকার জনশ্রুতি কতদূর সত্য, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

বৈষ্ণব-কবিশ্রেষ্ঠ দীনচণ্ডীদাসের রচিত পদাবলী অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উভয় খণ্ডেই রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তিত হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। প্রথম খণ্ডে কবি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ধারাবাহিকভাবে কীর্তন করিয়াছেন। কাজেই এই খণ্ডে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ভাবের সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল মাধুর্য; উহাতে কঠোরভাব লেশমাত্র নাই, শুধু সুমধুর ভাবের অনুবর্তন।

'দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী'

প্রথম খণ্ডের প্রথম দিকে কবি নিজেই তাঁহার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক হরি।
এ কথা অনেক কহিব বিস্তার
যে লীলা যখন করি॥

এবে কহি শুন বাল্য-লীলা-রস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
যে রসে যে হয় বশ॥

কাজেই, কবি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক আখ্যায়িকা সবিস্তারে বলিয়াছেন। এই অংশে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কংসরাজের পাপাচারে পৃথিবীর দুর্দশা, পৃথিবীকে পাপভারমুক্ত করিবার জন্য শ্রীহরির বৃন্দাবনে অবতরণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুতনা-বধ, শকটাসুর-বধ, তৃণাবর্ত-বধ, ইন্দ্রপূজা-নিবারণ প্রভৃতি একে একে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড

তাহার পরে গোষ্ঠলীলা;—গোষ্ঠলীলায় শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলা, সখাগণ সঙ্গে বনভোজন, ধেনুবৎস-অন্বেষণ, যশোদার বাৎসল্য, বাই-রাখাল, অক্রুর-আগমন, গোপ-গোপীদের বিলাপ, রাধার কৃষ্ণানুরাগ, কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা-গমন, রাধার বিরহ, কৃষ্ণের সমীপে সখীর দৌত্য ও রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন অনুপম মাধুর্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই গোষ্ঠলীলা-প্রসঙ্গে কবি একে একে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কংসরাজের ধনুর্মখ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃষ্ণ-বলরামকে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রুর বৃন্দাবনে চলিযাছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস পরমভক্ত। এই উপলক্ষে আরাধ্যদেবতাব সাক্ষাৎ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে, এই অপার আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে তিনি গোকুলের দিকে চলিয়াছেন,—

আজু সে দেখব চরণ দুখানি
লোটায়ে পড়িব তায়।
প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
সে দুটি কমল-পায়॥

এখানে ভক্তহৃদয়ের দাস্যভাবটি সুন্দর উপভোগ্য হইয়াছে। ব্রজের গোষ্ঠের ধেনু চরাইতে চরাইতে সুবল, সুদাম, বলরাম, শ্রীদাম প্রভৃতি রাখাল-বালকেরা নন্দদুলালের সঙ্গে খেলা খেলিতেছে; ক্ষুধা লাগিলে, পিপাসা পাইলে, অন্ন-জল সবই কানাই-ভাই আশ্চর্যভাবে আনিয়া দিতেছে। প্রিয় সখার অপূর্ব অমানুষিক লীলা দেখিয়া তাহারা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত ও কৃষ্ণের প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।—

আজি হৈতে ভাই, সকল রাখাল
কানাই কাঁধেতে না চড়।
উচ্ছিষ্ট ভোজন মুখে মুখে দিতে
এ মেনে সবাই ছাড়॥

বৃন্দাবনের রাখাল-বালকেরা সখ্যসূত্রে কখন যে একেবারে পরমেশ্বরের ঘাড়ে চড়িয়া বসিয়াছে, তাহা টের পায় নাই। নির্মল সখ্যভাবের কি সুন্দর মহিমা! নয়নের মণি কানাইকে চোখের আড়াল করিয়া যশোদার হৃদয়ের আকুলতার মধ্য দিয়া বাৎসল্যভাব চমৎকার বর্ণিত হইয়াছে।—

তুমি মোর প্রাণ- পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ, পদের পর বহুপদে ব্যক্ত করিয়া, কবি উহাকে উত্তরোত্তর গভীর করিয়া তুলিয়াছেন ও প্রচুর মাধুর্যের পরিবেশন করিয়াছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রেম এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার এক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাস—তাহাকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের যেন আর কোথাও যাইবার উপায় নাই। তাই কৃষ্ণবলরামের মথুরা-গমনের সংবাদ শুনিয়া সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।—

হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর-মন্দিরে গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন,
কোন্ পথে বধূ পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

কিন্তু হায়, সরলা রাধা এখনও সুচতুর শ্যামের মহিমা বুঝিতে পারে নাই। তাহার মনের মত নাগরকে একেবারে অতি-বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়া সে গর্বিতা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সকল গর্ব চূর্ণ না হইলে, কৃষ্ণকে চিরকালের মত পাওয়া যায় না। তাই তিনি প্রেমগর্বিতা রাধাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকালের মত মথুরায় চলিয়া গেলেন। দেবতা—দেবতা, মানুষের মত অত সহজে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। কৃষ্ণপ্রাণা রাধা শেষে বিরহের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া প্রাণনাথের মহিমা বুঝিতে পারে;—অবশেষে একমাত্র কৃষ্ণই তাহার সর্বস্ব হইয়া উঠে—মান, অভিমান, অহঙ্কার—এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সে উদ্যত হয়,—কৃষ্ণ-বিহীন জীবন তাহার অসহ্য বোধ হয়।—

কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি, বিষ খেয়ে মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরিতে মোর পাঁজর খসে যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥

এই সময়ে কৃষ্ণবিরহিণী রাধার দুরবস্থা এক সখীর উক্তিতে নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

অকথ্য বেদনা সই কহনে না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায়॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহ নারে সখি॥"
চণ্ডীদাস কহে—কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥

এই ধূল্যবলুণ্ঠিত মুক্তকেশযুক্ত স্বর্ণকান্তিখানি যে শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদের

ছবি, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চৈতন্যচরিতাবলীতে গৌরাঙ্গের এইরূপ অবস্থা অনেক স্থলে বর্ণিত আছে। কাহারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন ও বক্তার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেন। কোন সময়ে তিনি ঈশ্বরপুরীকে জিজ্ঞাসা করেন—"কৃষ্ণ কোথায়?" তদুত্তরে সেই প্রবীণ সাধু বলেন—"কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।" এই উদ্ধৃত পদটির শেষ চরণে ঈশ্বরপুরীর কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

যাহা হউক, সুদীর্ঘ একশতবর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণ পুনবায় বৃন্দাবনে আসেন ও বিরহসন্তপ্তা রাধার সহিত পুনর্মিলিত হন। এই মিলনের চিত্রটি অসীম আনন্দরসে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলিল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ।
... ...
রসভরে দুঁহু তনু থর থর কাঁপই
কাঁপই দুঁহু দেহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি নিভায়ল আনল
পাওল বিহরক ওর॥

এই মহামিলনের আনন্দে রাধিকা আত্মহারা হয়, কৃষ্ণের চরণে নিজেকে চিরদিনের মত সমর্পণ করিয়া দেয়,—পরমাত্মার সাগরে জীবাত্মা বিলীন হইয়া যায়।—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
হইনু তোমার দাসী॥

প্রেয়সী না জুটিলে পরমানন্দেরও প্রেমলীলা চলে না। তাই রাধার ঐকান্তিক প্রীতি পাইয়া তিনিও রাধাপ্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন।—

গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নে ভোজনে গমনে নয়ানে
সদাই রাধারে দেখি॥
নয়ন মুদিলে হৃদয়ে রাধিকা
রাধিকা পরম গতি।
গানেতে রাধিকা গুণেতে রাধিকা
সদাই রাধিকা মতি॥

রাধা ও কৃষ্ণের পরিপূর্ণ মিলন ঘটাইয়া দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পদাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে দীনচণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ-লীলার মধুর ভাবের পরিবেশন করিয়াছেন। এই খণ্ডে কেবল পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, প্রেমবৈচিত্র্য প্রভৃতি সুমধুর প্রণয়-লীলার অবিরাম প্রবাহ। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণ শুধু প্রেমরস-আস্বাদনের জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ। এইরূপ অবতরণের কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত কবি এই খণ্ডের প্রারম্ভে 'পীরিতির উদ্ভব' নামে একটি অপূর্ব কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। গোলোকের কল্পবৃক্ষে একটি মনোহর প্রেমফল প্রস্তুত হয়। দেবগণ উহা আহরণ করিবার নিমিত্ত শুকপক্ষীকে প্রেরণ করেন। চঞ্চুপুটে ফলটি ধারণ করিয়া শুকপাখি সাগরের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে থাকে। কিন্তু চঞ্চুর দৃঢ় চাপে সুপক্ব ফলটি তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়; উহার এক খণ্ড সুখ-সাগরে, অপর খণ্ড রস-সাগরে এবং অবশিষ্ট খণ্ড প্রেম-সাগরে পতিত হয়। তখন দেবগণ ঐ সাগরত্রয় মন্থন করিলে, সুখ-সাগর হইতে 'পী' রসসাগর হইতে 'রি' প্রেম-সাগর হইতে 'তি'—ফলের তিন অংশই উত্থিত হয়। কিন্তু দেববৃন্দ ঐ ফল ভক্ষণ না করিয়া, গোলোকে গিয়া শ্রীহরিকে উহা প্রদান করেন। তিনি উহা প্রাপ্তিমাত্র নিজে ভক্ষণ করেন ও বিস্মিত সুরবৃন্দকে বলেন, "এই ফলের আস্বাদ জগতে প্রচার করিবার জন্য আমি বৃন্দাবনে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইব। তখন তোমরা তথায় অবতীর্ণ হইলে ইহার স্বাদ লাভ করিতে পারিবে।" অনন্তর শ্রীহরি গোকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপে ও দেবগণ গোপ-গোপীরূপে তথায় অবতীর্ণ হন।

এইরূপে প্রেম পরিবেশন করিবার জন্যই শ্রীহরি ভূতলে আবির্ভূত হন ;—কবি কাব্যারম্ভে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাই, দ্বিতীয় খণ্ডে মাথুর, রাস, পূর্বরাগ, যুগলমধুর-রস প্রভৃতি মাধুর্য্য-ভাবেরই পরিবেশ ; অসুরাদি বধের প্রসঙ্গমাত্র নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত কাহিনীগুলি যথাযথ পূর্ব-পর-ক্রমে সজ্জিত হয় নাই বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। এই খণ্ডের প্রথমেই 'মাথুর'-পালা, তাহার পর 'পূর্বরাগ,' 'রাস' ও 'যুগল মধুর রস'। কিন্তু পূর্বরাগের পূর্বে মাথুর-পালার সমাবেশ সুসঙ্গত হয় নাই। হয়তো কবি পূর্বরাগের পালা আগে গাহিয়া, মাথুরাদি পরে গাহিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় যে-পাণ্ডুলিপি দেখিয়া পদগুলি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পালাগুলি সম্ভবতঃ যথাক্রমে সজ্জিত ছিল না। যাহা হউক, এই খণ্ডের অন্তর্গত 'পূর্বরাগ'-পালাটি সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী। প্রণয়-ব্যাপারে সাধারণতঃ নারী অপেক্ষা পুরুষ প্রথমে অগ্রসর হয়। এই স্বাভাবিকতা চণ্ডীদাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, বিদ্যাপতির মত রাধাকেই তিনি প্রথমে প্রণয়-চঞ্চল করিয়া তুলেন নাই। একদিন দিবাবসান-কালে নবযৌবনপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-নগরের পথে নববধূ-বেশিনী পরম-সুন্দরী রাধিকা-কিশোরীকে সহসা সন্দর্শন করেন ও তাহার রূপে বিমুগ্ধ হন। এইরূপ রূপমুগ্ধতা হইতে মিলনাকাঙ্ক্ষা ও ক্রমে প্রেমের উন্মেষ হয়। কাজেই, কৃষ্ণের এই রাধারূপ-মুগ্ধতার ভাবটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার হৃদয়-দর্পণে রাধার যে মোহিনী মূর্তি বারংবার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কবি একে একে তাহার অনেকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কখন নগরের পথে, কখন প্রাসাদ-সম্মুখে, কখন বা যমুনার ঘাটে নানা-অবস্থায় নানা-ভঙ্গীতে রাধার চিত্র বিকশিত করিয়া, তাহার ললিত দেহের অনুপম রূপলাবণ্য তিনি ক্রমশঃ উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। আবার, শ্যাম-মুগ্ধা রাধার লজ্জানত নয়নের সম্মুখে কৃষ্ণের মনোহর রূপ বার বার প্রতিভাত করাইয়া, তাঁহার ভুবনমোহন মূর্তি তিনি পরিপূর্ণরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার চিত্রাঙ্কনে তিনি তাঁহার শিল্প-কৌশলের আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। এই রূপবর্ণনাগুলি রাধা ও কৃষ্ণের উক্তির দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায়, তাহাদের পরস্পর প্রবল আকর্ষণও উঁহাদের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ একখানি মধুর চিত্র

নিয়ে মুদ্রিত হইল ;—রাধার রূপ ও সেই রূপ দর্শনে কৃষ্ণের মনের ব্যাকুলতা উভয়ই ইহাতে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।—

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল কুল॥
আঁখি তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত ভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলী তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী জিনি কৃশ মাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা॥
গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করীকর পারা॥
চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মন্মু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায়॥

কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রমা পাইল সে ॥
চণ্ডিদাস বলে ভেবনা ভেবনা
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনি ॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা সাধারণ নায়িকা নয়, তাহার অনুভূতি অসাধারণ, তাহার প্রেমও অনেক উচ্চ স্তরের। তাহার চরিত্রে নায়িকা ও সাধিকা উভয়ের আচরণ দৃষ্ট হয়; সে যেন প্রেমোন্মাদিনী যোগিনী। কৃষ্ণের নাম তাহার কর্ণের মধ্য দিয়া একেবারে অন্তরে প্রবেশ করে ও তাহার প্রাণ আকুল করিয়া তোলে; কৃষ্ণের নাম জপিতে জপিতে তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে, তবু তাহার বদন কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারে না; কৃষ্ণকে বার বার দেখিয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না, ক্ষণে ক্ষণে শতবার গৃহের বাহিরে গিয়া কদমতলার দিকে চাহিয়া থাকে; শ্যামবর্ণ মেঘরাশি কিংবা কৃষ্ণবর্ণ ময়ূর-কণ্ঠ দেখিয়া সে ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে; আহার-বিহারে তাহার আর কোন আগ্রহ নাই, সে এখন "রাঙ্গা বাস পরে যেমতি যোগিনী পারা"। তাহার এই প্রকার আচরণ লক্ষ্য করিলে, সহজেই মনে হয়, কবি যেন মানবীয় প্রেম আশ্রয় করিয়া ঐশ্বরিক প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিতে বসিয়াছেন। ঈশ্বরের মিলন লাভের নিমিত্ত সাধু ব্যক্তি যেমন সংসার ভাসাইয়া দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কৃষ্ণানুরাগিনী রাধার মনেও তেমনি সঙ্কল্প দেখিতে পাই :—

বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে
সভার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে ॥

'মাথুর' বিষয়ে কবি একবার প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডে আবার তাহারই অবতারণা। কিন্তু এইবার ঘটনাপেক্ষা রসোদ্‌গারের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। রাধার সহিত প্রণয় করিয়া কৃষ্ণ কংসরাজের আমন্ত্রণে মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন; আর, নিদারুণ বিরহে রাধাচিত্ত বিদগ্ধ হইয়া

যাইতেছে। কিন্তু কেবল রাধাই নহে, তাহার অদর্শনে কৃষ্ণও মথুরাতে অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতেছেন। এই দীর্ঘ বিরহকালে উদ্ধব, হংস, কোকিল প্রভৃতি দূতের মুখে তাঁহারা পরস্পরের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া হৃদয়-জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেন। এই দূতবৃন্দের উক্তির মাধ্যমে কবি সুকৌশলে রাধা-কৃষ্ণের পরস্পর নিবিড় ভালবাসা এবং বিচ্ছেদ বশতঃ তাহাদের মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভাগবত-পুরাণের অন্তর্গত রাসলীলা অনুসরণ করিয়া দীন চণ্ডীদাস 'রাস-'পালা কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কতকগুলি মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন। নির্জন বনভূমি, শ্যামল অরণ্যানী, পুষ্পিত তরুলতা, কৌমুদী-রঞ্জিত নির্মল স্রোতস্বতী প্রভৃতি নয়ন-রঞ্জন নৈসর্গিক শোভার সমাবেশে এই রাসলীলা বড়ই মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। রাসপূর্ণিমার একটি দৃশ্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল-ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনলোভা
ভুলিলা নাগর রায়॥

এইরূপ জ্যোৎস্না-পুলকিত কুঞ্জকাননে এক মণিময় রত্নবেদিকায় উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লচিত্তে বংশী বাদন করিতে থাকেন। সেই সুমধুর বংশীরব শুনিয়া ব্রজনারীদের হৃদয় আকুল হয়, গৃহকর্মে তাহাদের মন বসে না, পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বংশীধারীর উদ্দেশে ধাবিত হয়। এই সামান্য ঘটনার দ্বারা কবি পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক দুর্বার আকর্ষণের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
"ঐ ঐ শুন কিবা বাজে তান
কেমন করিছে প্রাণী॥

সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।"
রজত-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে 'যুগল মধুর রস' বর্ণিত হইয়াছে। এইভাগে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কোন পালা বা আখ্যায়িকা বর্ণিত হয় নাই। কবি এক একটি বিষয় বা ভাব লইয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের কারণে রাধার অন্তরে যে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেগুলি একে একে ধরিয়া তিনি এক একটি সরস গীত বচনা করিয়াছেন;—হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবকে সুস্পষ্ট রূপ দান কবিয়াছেন। এই হেতু এই পদগুলি উচ্চস্তরের গীতিকবিতায় পরিণত হইযাছে। যমুনার ঘাটে কদম্ব-বৃক্ষ-তলে নটবর শ্যামকে দেখিয়া আসিয়া, রাধার মনোমধ্যে যে অপূর্ব অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা সে সহজে হৃদয়-মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।—

যেদিন দেখল কদম্বের তলে
চাহিয়া অকাজ কইনু।
সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর
না জানি কি ফল পানু ॥
গৃহপতিজনে বিষ সম দেখি
লোকের বচন রুঠা।
বুক দুরু দুরু কেমন করযে
এ বড়ি বিষম লেঠা ॥

কৃষ্ণের প্রতি সে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গুরুজনের ভয়ে ও আত্মীয় স্বজনের শাসনে তাঁহার সঙ্গে সে মিলিত হইতে পারিতেছে না। তাহার উপরে আবার, যাঁহার জন্য সে এত উতলা, সে-কৃষ্ণও তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে বিরহানলে বিদগ্ধ করিতেছেন;—তাঁহার দর্শন প্রায়ই মিলে না। একেই সে কৃষ্ণ-বিরহে জর্জরিত, তদুপরি পরিজনেরা তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া গঞ্জনা দেয়। হায়! কেন সে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিতে গিয়াছিল? কেন সে সাধ করিয়া হলাহল পান করিল? মনের দুঃখে সে এখন নিজের

প্রতি, কৃষ্ণের প্রতি, বিধাতার প্রতি ও সকলের প্রতি মর্মান্তিক আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে। নিম্নে এইরূপ কতিপয় নমুনা উদ্ধৃত হইল।—

*

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পীরিতি
কাহারে করিব রোষ॥

* *

সই, কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিনু
কাঁদিতে জনম গেল॥

* * *

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাত কৈলাম দিবস দিবস কৈলাম রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পীরিতি॥

ঈশ্বরের মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া, ঈশ্বরাকুল ভক্ত ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সংসারধর্ম ছাড়িয়া ও আত্মীয় পরিজনের মমতা ভুলিযা ঈশ্বর-ভজনায় নিমগ্ন হয়;—কিন্তু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সহজে পায় না। তখন দুঃসহ তপস্যায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া সে নৈরাশ্যে পতিত হয। তখন তাহার আর সংসারে ফিরিবার প্রবৃত্তি থাকে না, অথচ ঈশ্বর-মিলনও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাধকের এইরূপ নিদারুণ অবস্থা রাধার আক্ষেপের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই পালার প্রারম্ভে রাধার বিরহজনিত মর্মবেদনা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যাংশে রাধা-কৃষ্ণের মধুর প্রণয়লীলা ও শেষাংশে মানাভিমানের নয়নাভিরাম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রেমময় প্রাণবল্লভের সহিত, অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হইয়া, আনন্দময়ী রাধা মনের আনন্দে নানা ক্রীড়া করিতেছে। কুসুমিত কানন হইতে প্রফুল্ল পুষ্পনিচয় চয়ন করিয়া সে স্বহস্তে প্রিয়তমকে পুষ্পাভরণে ভূষিত করিতেছে; আবার, পুলকিত সখীবৃন্দকে লইয়া সুগন্ধ কুসুমরাশির দ্বারা বিলাস-কুঞ্জ রচনা করিতেছে,—তাহাতে ফুলের প্রাচীর, ফুলের শয্যা,

ফুলের বালিশ—সমস্তই ফুল দিয়া রচিত। কিন্তু এই প্রেমলীলা প্রতিদিন অবিরাম চলে না, নানা প্রতিবন্ধকতায় বিরহের আবর্ত আসিয়া রাধার চিত্ত বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার কুঞ্জে আসিবার কালে রসিকশেখর কৃষ্ণকে সুচতুরা চন্দ্রাবলী পাথমধ্য হইতে ধরিয়া নিজের কুটীরে লইয়া যায়, আর সে সারা-রাত্রি কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় জাগিযা রহে। আবাব কোন রাত্রে রাধাব ইঙ্গিতানুসারে কৃষ্ণ তাহার গৃহ-সন্নিকটে আগমন করেন, কিন্তু রাধা সমযমত বাহির হইতে পাবে না, সহসা বৃষ্টি নামিয়া আসে, তিনি নিরুপায়ভাবে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে থাকেন।—

সই, কি আর বলিব তোবে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুযা
বিধি মিলাযল মোরে॥
এ ঘোর রজনী মেঘ-ঘটা বঁধু
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনাব কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিযা পরাণ ফাটে॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনা-ডর
বিলম্বে বাহির হঁলু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিঁলু॥
বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিযা
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতে
জগৎ হইল সুখী॥

'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' একটি সুবৃহৎ কাব্য। উহার সম্পূর্ণ পরিচয়

স্বল্প পরিসরে দান করা অসম্ভব। ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি কাব্যের সকল অঙ্গই তাঁহার সুনিপুণ তুলিকাপাতে সুরঞ্জিত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মত সহজ ভাষায় ও সাধারণ কথায় মানব-মনের অসাধারণ ভাব ও সুগভীর অনুভূতি এমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে খুব কম কবি সক্ষম হইয়াছেন। অন্য কবি যে-ভাবটি বহু বাগাড়ম্বর ও বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারাও স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিতে পারেন না, তিনি তাহা সহজ সরল কথায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন। প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সুকোমলা রাধার দুঃখের অন্ত নাই;—তাহাব উপরে সকলেই তাহাকে 'কলঙ্কিনী' বলিয়া নিদারুণ গঞ্জনা দেয। তথাপি তাহার কৃষ্ণপ্রেম এত প্রবল যে, উহাব প্রভাবে সকল দুঃখই সে ধৈর্যের সহিত সহ্য করে, এবং উহাদের সকলকে ছাপাইযা কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য তাহার চিত্তে সর্বদা জাগিয়া উঠে। সেই সুমধুর অনুভূতিতে তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হয,—সে-আনন্দের তুলনা নাই, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায না। কিন্তু চণ্ডীদাস তাহা সহজ কথায় সুন্দর করিয়া প্রকাশ কবিয়াছেন;—

শ্রীচণ্ডীদাসের ভাষা।

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয় তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

বিরহ-বেদনা, লোক-গঞ্জনা, মানসিক যাতনা প্রভৃতি নানা জ্বালায় বিদগ্ধ হইয়া রাধা অবশেষে কৃষ্ণের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করে কিন্তু তাঁহার প্রতি দুর্বার অনুরাগবশতঃ তাহা সে পালন করিতে পারে নাই। তাহার অন্তরস্থিত সেই অনন্ত প্রেমের সুস্পষ্ট আভাস নিম্নলিখিত পদটিতে সহজ ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু-পথে যায়॥

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম নাহি লব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঁঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥
যে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

এই প্রকার উপমা-উৎপ্রেক্ষা বিহীন এক একটি সহজ কথায় কবি সমস্ত হৃদয়ের গভীরতম ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ানুভূতি এত প্রবল যে রাধা বা কৃষ্ণের মিলন বা বিরহ অবস্থার সুখ বা দুঃখের ভাব তিনি নিজের হৃদয়েও অনুভব করিয়াছেন, তাই তাঁহার হৃদয় হইতেই ঐভাব স্বতঃ নিঃসারিত হইয়া আসিয়াছে, ভাষার লালিত্য বা অলঙ্কারের পারিপাট্যের অপেক্ষা রাখে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সকল পদই একেবারে নিরলঙ্কার নহে; উপমা-অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের সমাবেশে তাঁহার বহুপদ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যথা—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥

* *

আজানু লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনকভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন গেল সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে॥

* *

তড়িৎ বরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা সে দিয়া অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন বা রাজে॥

চৈতন্যযুগের পদাবলীতে ব্রজবুলির ছড়াছড়ি; গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসাদির অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচিত। কিন্তু দীনচণ্ডীদাসের সকল পদই বাঙ্গালাভাষায় রচিত,—যদিও দুই-একটা ব্রজবুলির শব্দ কোন কোন পদে দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন গভীর ভাবের কথা ছাড়িয়া সরল কাহিনী তিনি বলিতে বসিয়াছেন, সেখানে তাঁহার ভাষা এত সহজ হইয়াছে যে একজন ক্ষুদ্র বালকেও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। যথা—

কান্দিআ আকুল দুগুণ হইল
নন্দের নন্দন হরি।
হরষে পুতুনা দেখিযা কান্দনা
মুখে স্তন দিল ভরি ॥
... ...
নন্দের নন্দন করে দুগ্ধ পান
আপন যতেক শক্তি।
তেজিল শরীব পুতুনা বাক্ষসী
তার ভেল তাএ মুক্তি ॥

দীনচণ্ডীদাস 'প্রেমের কবি' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস প্রভৃতিও প্রেমের কবি; কিন্তু চণ্ডীদাসের মত প্রেমেব উচ্চ আদর্শ তাঁহারা কেহই অঙ্কন করিতে পারেন নাই। তাঁহাব প্রেমের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত কোন লালসা নাই, রূপমোহজাত কোন কামনা-পবিতৃপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্রতা নাই, নিজের সুখশান্তির দিকে কোনরকম লক্ষ্য নাই। দৈহিক মিলনের সুখ অপেক্ষা আন্তরিক মিলনের আনন্দ যে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পদাবলীতে তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অতীন্দ্রিয় প্রেমের সাধনা সহজ কথা নহে। প্রেমের জন্য যে-ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, প্রিয়তমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, আপনার স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই যথার্থ প্রেমলাভের যোগ্য।—

দীনচণ্ডীদাসের প্রেম

পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা ॥

প্রেম এইরূপ স্বার্থশূন্য ও দুঃখময় বলিয়া, চণ্ডীদাসের প্রায় সকল পদেই একটা বেদনার সুর আছে, যাহা হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে। পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া সুকুমারী রাধা যতটুকু সুখ পাইয়াছে, তাহার শতগুণ দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে;—প্রেম করিতে গিয়া তাহাকে অবিরাম হৃদয়-যাতনায় জ্বলিতে হইয়াছে। যাহারা এইরূপ জ্বলিতে পারে, কেবলমাত্র তাহারাই প্রেমামৃতের অধিকারী।

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পীরিতি॥

অন্যত্র—

পোড়া লোকে নাহি জানে পীরিতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সমাধান দিযে ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক যাতনা যার অধিক পীরিতি॥

তাঁহার মতে, প্রেম তুচ্ছ নহে, উহা দুর্লভ অমূল্য ধন;—দুঃসহ দুঃখ সহিয়া উহা লাভ করিতে হয়। সেই দুঃখভোগের সকরুণ সুরে তাঁহার সমগ্র কাব্যখানি অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রুধারার দ্বারা বিধৌত হইয়া তাঁহার প্রেম পরম নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে; উহাতে বাসনা-কামনার বিন্দুমাত্র কালিমা নাই। তাই তাঁহার অনেক পদ বেদমন্ত্ররূপে পাঠ করা যায়; সেগুলির মত পবিত্র প্রেমের স্তোত্র ধর্মগ্রন্থেও বিরল। এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া, দীন চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ আমরা এখানে সমাপ্ত করিলাম।—

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা, না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য মম, তোমার চরণ মানি॥

(৩) জ্ঞানদাস

দীনচণ্ডীদাসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, তাঁহারই মত সুললিত সরস পদাবলী রচনা করিয়া জ্ঞানদাস অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে এক "ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন,......খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি।"[১] জ্ঞানদাস অতীব সুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন; তিনি 'মনোহরসাহী' ঢঙের কীর্তন প্রবর্তন করেন। তাঁহার জীবন-কথা বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি স্বনামধন্য কবি,—তাঁহার বংশপরিচয়াদি না জানিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। ভাবের গভীরতা, রসানুভূতির তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় তাঁহার রচিত পদাবলী সকলকেই মুগ্ধ করে। রূপানুরাগ, রসোদ্গার এবং মাথুর বিষয়ক পদগুলিতেই তাঁহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। রূপানুরাগের একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পুনি কর্যাছি মনে সেই যে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু-লহু হাসে পহু পিরীতির সার॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥

---

(১) দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলুঁ আগুনি॥

দীনচণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা সবিস্তার কীর্তন করেন নাই। পুতনাবধ, গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিলাস বা রাসলীলা জাতীয় কোন কাহিনী তিনি ধারাবাহিকভাবে বলেন নাই। ঘটনা অপেক্ষা ভাবের অভিব্যক্তি ও রসসৃষ্টি করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। তাই, পূর্বরাগ, মিলন, অভিসার, বিরহ, রসোদ্গার প্রভৃতি ভাবগত বিষয় লইয়া তিনি বহু বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করিয়াছেন। অন্তরের নিগূঢ় অস্পষ্ট অসীম ভাবরাশি শ্রুতিমধুর ভাষায় সুস্পষ্ট সুন্দররূপে অঙ্কন করিবার ক্ষমতায় তিনি অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা পদই সংখ্যায় বেশী এবং সেইগুলিই অধিক সুন্দর। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যের বিবিধ বহুমূল্য আভরণের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, অন্তরের ভাবকে মনোহররূপে প্রকাশ করিতে তিনি সুদক্ষ। অলঙ্কারের গুণে তাঁহার বক্তব্য কত অধিক পরিমাণে অথচ কতই না সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার মনে যৌবন-সুলভ অনুরাগ জাগিয়াছে। তাহার মনের এই প্রগাঢ় বিমুগ্ধ-ভাব ও অস্পষ্ট প্রেমানুভূতি শুধুমাত্র রূপক-অলঙ্কারের দ্বারা কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

যৌবনোৎফুল্লা শ্রীরাধিকার সুন্দর গমন-ভঙ্গী দেখিয়া কৃষ্ণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন;—তাহার সেই গমন-মাধুর্য উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের দ্বারা মধুররূপে চিত্রিত হইয়াছে।—

উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উঘাড়ি॥

রাধার বিরহ-দশার একখানি চিত্রে—

অঙ্গুল-অঙ্গুরী বলয়া ভেল।

এখানে হাতের বালার সহিত অঙ্গুরীর উপমা দিয়া, রাধা-শরীরের শীর্ণতা দেখান হইয়াছে। ছন্দের গুণে তাঁহার কোন কোন পদ পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করে ও বর্ণিত বিষয়টি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। যথা—

রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

জ্ঞানদাস অপেক্ষা চণ্ডীদাসের ভাবের গভীরতা থাকিলেও, ভাবকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতায় চণ্ডীদাস অপেক্ষা তিনি অধিক সুকৌশলী।

দীনচণ্ডীদাসের রাধার মত জ্ঞানদাসের রাধাও প্রেমের যোগিনী। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া, সে যোগিনী হইয়া মথুরার ঘরে ঘরে তাঁহার অন্বেষণ করিতে যাইবে,—যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ পরমেশ্বরের সন্ধানে পুরী, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন।

গিরিয়া বসন বিভূতি ভূষণ
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাইব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
ভ্রমিব যোগিনী হৈয়া।
কারু ঘরে যদি মিলে গুণনিধি
বাঁধিব বসন দিয়া॥

দীনচণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় জ্ঞানদাসের রাধাও শুধু মিলন লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, কৃষ্ণের চরণে একেবারে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

অপযশ-ঘোষণা থাক দেশে দেশে
সে মোর চন্দনচুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায় এতনু সঁপিনু
তিল-তুলসিদল দিয়া॥

চণ্ডীদাসের রাধা-চরিত্রে একটা বিষাদের ছায়া আছে, তাহার সকল কথাতেই একটা বেদনার সুর বাজিয়া উঠে। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা স্বভাবতঃ আনন্দোৎফুল্লা, মিলন-ব্যাকুলা সুরসিকা নায়িকা। তাহার পুলকিতাবস্থার একটি মধুর চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

বৃষভানু-নন্দিনী শ্যাম-সোহাগিনী
নব নব রঙ্গিনী সঙ্গে।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরশনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গে॥
সোনার নূপুর পাতামল রাঙ্গা পায়ে ঝলমল
হংসগমনে চলি যায়।
নীলমণি চুড়ি হাতে রতন কঙ্কন তাতে
নীলবসন শোভে সোনার গায়॥
কত কোটি জিনি শশী মুখে মৃদু মৃদু হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণীর আগে সোনার ঝাঁপা মাঝে মাঝে কনক চাঁপা
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে বামভুজ দিয়া তাথে
বৃন্দাবনে রাই প্রবেশিল।
রাই-অঙ্গ-কান্তি-মালা দশদিক করিল আলা
জ্ঞানদাস দেখিয়া মজিল॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধার আকর্ষণ যে কত নিবিড়, কবি তাহা নানা ইঙ্গিতে আভাসে অনেকখানি জানাইয়াছেন। এই প্রকার একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সুদীর্ঘকাল দুঃখ-যাতনা সহিবার পর বিরহিনী রাধা তাহার প্রাণ-প্রিয়কে পুনরায় সন্নিকটে পাইয়াছে। পাছে তাঁহাকে আবার হারাইতে হয়, এই ভয়ে তাহার নিজের হৃদয়-মধ্যে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সে চায়। তাহার এই প্রকার ইচ্ছার দ্বারা কৃষ্ণ যে তাহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, তাহা অকপটে ব্যক্ত হইয়াছে।—

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে তোমারে থোব॥

ও চাঁদ বদন সদা নিরখিব সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি মিলায়ল বিধি পুরিল মনের সাধ॥
প্রেম ডোর দিয়া রাখিব বাঁধিয়া দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ।

চণ্ডীদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা অবশেষে আধ্যাত্মিকতায় গিয়া উপনীত হইয়াছে। রাধাকে কৃষ্ণ যেভাবে সোহাগ করেন, মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব; একমাত্র প্রেমময় পরমেশ্বরই তাহা পাবেন।—

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে॥

বেদাদি শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মা হইতে জীব ও জগৎ সমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে, এবং জীবাত্মা অন্তিমকালে পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় আর কোন ভেদ থাকে না। জ্ঞানদাসের রাধা-কৃষ্ণও এইরূপ একাত্ম হইয়া গিয়াছেন।—

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

জ্ঞানদাসের পদাবলীতে দীনচণ্ডীদাসের প্রভাব প্রধান হইলেও, কোন কোন পদে বিদ্যাপতির প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহার মাথুর বিষয়ক পদগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত। বিদ্যাপতির রাধা মাস মাস করিয়া কত বৎসর কৃষ্ণের মিলন প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দেয়, তবু তাঁহার দর্শন না পাইয়া সে নিজের জীবন-আশা ত্যাগ করে।—

মাস মাস করি বরিখে গোঙায়ল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা।

জ্ঞানদাসের রাধাও দিন গণিয়া গণিয়া ও রাত জাগিয়া জাগিয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারে না।—

দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইলে পিয়া নিচয়ে মরিব॥

প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যের বর্ণনাতেও বিদ্যাপতির সহিত জ্ঞানদাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বসন্ত-ঋতু-বিষয়ক একটি পদে বিদ্যাপতির উক্তি—

আয়ল ঋতু-পতি রাজ বসন্ত।
ধায়ল অলিকুল মাধবি-পন্থ॥
... ...
যোলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥

ইহার প্রতিধ্বনি জ্ঞানদাসের বসন্ত-বিষয়ক একটি পদে শুনিতে পাওয়া যায়—

আওল রে রিতুরাজ বসন্ত।
খেলতি রাইকানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মহোৎসব পিককুল রাব॥

দীনচণ্ডীদাসের পদের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায়, জ্ঞানদাসের কোন কোন পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রচলিত পদটি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানদাসের রচনা।—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি হে, কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া অচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুব পিরিতি
মরণ অধিক শেল॥

জ্ঞানদাসের কোন-কোন পদে সংযত-হাস্যের মাধুরী আছে। যথা—

করে ধরি রাই লয়ে বসাইল বামে।
পীতবাসে মুছই রাই-মুখ-ঘামে॥
নিজ করকমলে চরণধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥

(৪) নরোত্তমদাস দত্ত

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কালে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য, নরহরি সরকার প্রভৃতি তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ক্রমোন্নতি ও উত্তরোত্তর প্রচার হয়। তাঁহার তিরোধানের পর বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভুর অভাব বশতঃ এক নিবিড় বিষাদের যবনিকা নামিয়া আসে এবং বৈষ্ণবধর্ম-সাধনার প্রবল উৎসাহ সহসা মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রায় একই সময়ে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্মের রুদ্ধপ্রায় প্রবাহ পুনর্ব্বর্দ্ধিত করেন। তাঁহাদের ভক্তিপূত চরিত্র-মহিমার মুগ্ধ হইয়া অনেকেই শাস্ত্রে

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। এইরূপে তাঁহাদের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা আরো প্রায় শতবর্ষ সমগ্র বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিয়া যায়। এই হেতু, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ—উভয় শতাব্দই আমরা চৈতন্য-যুগের অন্তর্গত করিয়াছি। "খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভমধ্যে এই তিনজন প্রেমবীর বৈষ্ণবসমাজে প্রাদুর্ভূত হন।"[১] ইঁহারা বিভিন্ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও, ঘটনাচক্রে তিনজনেই যৌবন বয়সে বৃন্দাবনে আসিয়া সম্মিলিত হন এবং জীবগোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন। "এই তিনজনের মিলন বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্মের নূতন বন্যা বহাইয়াছিল।"[২]

শ্রীনিবাস বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার বলিয়া সমাদৃত, আর নরোত্তম বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া গণ্য। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস,' নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস', মনোহর দাসের 'অনুরাগ-বল্লী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ইঁহাদের জীবন-কথা পরম ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত কীর্তিত হইয়াছে। এই কারণে চৈতন্যভাগবতাদির ন্যায় ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতিও বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

গঙ্গানদীর তীরবর্তী খেতুরী নামক গ্রামে "নরোত্তমের জন্ম হয় আনুমানিক ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে।"[৩] তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর পরগণার জমিদার বা রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্ত গৌড় দরবারের মহামাত্য ছিলেন। কিন্তু এইরূপ ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে লালিত পালিত হইয়াও, তিনি বাল্যাবধি বুদ্ধদেবের মত ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ ছিলেন। তৎকালে প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গদেবের তিরোধানবশতঃ সমগ্র বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ দুঃসহ শোকে মুহ্যমান,—তাঁহার অলৌকিক জীবনকথা সকলের মুখেই উচ্চারিত। বালক-নরোত্তম গুরুজনদের মুখে মহাপ্রভুর সেই সমুদয় পবিত্র স্মৃতিকথা ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিতেন;—তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয় সেই ঈশ্বর-প্রেমিকের মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তাঁহার সরল মনে ঈশ্বরের করুণা পাইবার জন্য একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিত, কি এক অনির্বচনীয় উদার ভাব তাঁহাকে সর্বদা আবেগচঞ্চল করিয়া তুলিত। তাঁহার এইরূপ বৈরাগ্যভাব

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। ২, ৩ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গৌড়রাজধানী পরিদর্শন করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু উদাসী যুবক পথিমধ্য হইতে তাঁহাব সঙ্গীদল সংগোপনে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং তথায় লোকনাথ গোস্বামীব নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। অনন্তর জীবগোস্বামীর নিকট নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দও জীবগোস্বামীর নিকট ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেছিলেন। এইরূপে বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর সন্নিকটে তিনজন চৈতন্যভক্ত যুবকের সম্মিলন হয়, এবং তিনজনেই পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন। তৎকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় 'চৈতন্য-চরিতামৃত' নামক সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-জীবনী লিখিয়া সমাপ্ত করেন। এই মহামূল্য গ্রন্থখানিব যাহাতে বঙ্গদেশে প্রচাব ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে গোস্বামীমহাশয় অপবাপর বৈষ্ণবশাস্ত্রের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রেরণেব ব্যবস্থা কবেন। একখানি গরুব গাড়ীতে গ্রন্থগুলি চাপাইয়া তিন নবীন বৈষ্ণবভক্ত বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালা-দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন; কিন্তু বাঁকুড়া-জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুব নামক স্থানে তাঁহারা উপনীত হইলে, তথাকার দস্যুপ্রকৃতি বাজা বীব হাম্বীবেব অনুচরবৃন্দ গ্রন্থপূর্ণ শকটটি ধনবত্নপূর্ণ অনুমান কবিয়া, উহা লুণ্ঠন কবিয়া লয়। ঐ গ্রন্থসমূহ উদ্ধার কবিবাব নিমিত্ত শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুবে বহিয়া যান এবং নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বাঙ্গালাদেশে যাইতে বলেন। অনন্তব তিনি বীব হাম্বীবের প্রাসাদে গমন কবিয়া অপহৃত গ্রন্থসমুদয় উদ্ধাব কবেন। তাঁহার নির্মল চরিত্র ও প্রগাঢ় ভক্তিব পরিচয় পাইয়া বীব হাম্বীব তাঁহাব নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন, এবং বনবিষ্ণুপুব অচিরে বৈষ্ণবধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। বীর হাম্বীরের রচিত কতিপয় ভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবপদে তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন ও তন্নিমিত্ত শ্রীনিবাসের প্রতি তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাব পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসও বহু সুমধুর বৈষ্ণবপদ রচনা করেন।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ

নরোত্তম যথাকালে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন বটে, কিন্তু তিনি আর সংসারী হন নাই;—খেতুরী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া তিনি ধর্মসাধনায় নিমগ্ন হন। তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষদত্ত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন, ও সাধুচরিত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতার শ্রীতিস[illegible] আনুমানিক

১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খেতুরী গ্রামে বিশাল মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাধা-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ প্রভৃতির ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উপলক্ষে শ্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানে তথায় যে বিরাট বৈষ্ণব-সম্মেলন ও বিপুল আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "খেতুরীর মহোৎসব" নামে ইতিহাস-বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। "এরূপ বিচিত্র উৎসব বৈষ্ণব জগতে উহার পূর্বে বা পরে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। গৌরনিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং তাঁহাদের পার্ষদেরা তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী ছিলেন এই উৎসবের হোত্রী, শ্রীনিবাস প্রধান পুরোহিত, নরোত্তম উদগাতা এবং রাজা সন্তোষ দত্ত যজমান।...শ্রীজাহ্নবী দেবী সকলের অলক্ষ্যে বসিলেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ ঠাকুর নরোত্তমকে গান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তমকে মাল্যচন্দন দিলেন।... নরোত্তম পালা সাজাইয়া গান করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়াছিলেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকার আরম্ভ। ঠাকুরমহাশয় যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহাই পরবর্তী গায়ক ও পদকর্তৃগণ অনুসরণ করিয়াছেন।... খেতুরীর মহোৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, যথা নরোত্তম দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি—ইহারাই গৌরগীতিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। ইহাদের রচিত অপূর্ব কাব্যরস-সমন্বিত গৌরাঙ্গ-গীতগুলি সুরতাললয়ে সংযুক্ত হইয়া কীর্তন-সঙ্গীতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল।"[১]

খেতুরীর মহোৎসব

নরোত্তম আদর্শ সাধুপুরুষ। তাঁহার মহত্ত্বে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার শিষ্য হন; এমনকি, বলরাম মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার নিকট দীক্ষা নেন। এই কারণে তিনি বৈষ্ণব-সমাজে নরোত্তম ঠাকুর নামে পরিচিত। তাঁহার রচিত বৈষ্ণবপদগুলি প্রগাঢ় ভক্তিভাবের দ্বারা অতীব সরস হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনকে তিনি ভক্তের ঈশ্বর-প্রাপ্তি-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরকে পাইলে ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি তাঁহার যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হয়,—অনাবিল আনন্দে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইতে থাকে। নিম্নোক্ত পদটিতে রাধার মিলনানন্দের মধ্য দিয়া এই ভাবটা সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।—

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন-মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥

১, শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র, 'পদামৃত মাধুরী'।

ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল-করে মোছই লোর॥
মানজনিত দুখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুঁহু কেলিবিলাস।
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস॥

রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ে নরোত্তমের পদ সংখ্যায় বেশী নহে, কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে তাঁহার ভক্তি-নিবেদন-বিষয়ে বহু পদ আছে। তাঁহার এইরূপ প্রার্থনামূলক পদগুলির তুলনা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতীব বিরল। তাঁহার একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনা-পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

হে গোবিন্দ গোপীনাথ, কৃপা করি রাখ নিজ সাথে
কামক্রোধ ছয়জনে লৈয়া ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥

অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

পুন যদি কৃপা করি এজনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

(৫) গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস-ভণিতায় বহুসংখ্যক পদ 'পদকল্পতরু'-প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং একাধিক গোবিন্দদাসের অস্তিত্ব সহজেই অনুমিত হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ—সকল বৈষ্ণবেই বিনয়বশতঃ দাস-উপাধি গ্রহণ করে; তাই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। শ্রীচৈতন্যের অনুচর গোবিন্দ চক্রবর্তী, কুলীন-গ্রামনিবাসী গোবিন্দ ঘোষ, উৎকলবাসী গোবিন্দ দাস, কড়চা-লেখক গোবিন্দ কর্মকার এবং পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ—ইঁহারা সকলেই এক 'গোবিন্দ দাস' নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কাজেই কোন গোবিন্দদাসের কথাই বিশুদ্ধ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

"১৫৩৭ খৃঃ অব্দে শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।"[১] শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদর সেন তাঁহার মাতামহ। এই মাতামহের গৃহে তিনি বাল্যকালে লালিত-পালিত হন। তাঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভুর অনুগ্রহভাজন ও নরহরি সরকারের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ সুবিখ্যাত শ্রীনিবাস আচার্যের সুহৃৎ ছিলেন। শ্রীনিবাসের কৃপায় তাঁহার বৈষ্ণবধর্মে মতি হয় এবং কালক্রমে তিনিও কতকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় গোবিন্দদাসও শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার প্রতি গুরুদেবের এই অপার কৃপার কথা তিনি একটি পদে গভীর শ্রদ্ধার সহিত গাহিয়াছেন—

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম।
দিন-হিন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥
… … …
যুগল-ভজন গুণ লীলা-আস্বাদন
গ্রন্থকল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দ দাস অনাথে ॥

---

১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

চিরঞ্জীব সেনের মৃত্যু হইলে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ—দুই ভ্রাতা মুর্শিদাবাদ জেলায় তেলিয়াবুধরী নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। "গোবিন্দদাস যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তিনি এই ইতিহাস-বিশ্রুত রাজেশ্বরের নাম তাঁহার কোন কোন ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন।"[১] প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে। এই "পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়াবুধরীতে ও বৃন্দাবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা পাচকের তত্ত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো প্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্বাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক চরিত জানি না।"[২]

দীনচণ্ডীদাসের মত ধারাবাহিকভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা গোবিন্দদাস বর্ণন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা বিষয়েই তাঁহার বহুপদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত পদাবলীর সংখ্যাও চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির কাছাকাছি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেও অবলম্বন করিয়া তিনি অনেকগুলি সরস গৌরপদ রচনা করেন। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির সুকৌশল সমাবেশের দ্বারা তাঁহার সকল পদই রূপ-রসে ও অর্থে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অতুল কবিত্বের খ্যাতি বঙ্গের বাহিরে প্রচারিত হয়;—বৃন্দাবনের শ্রীজীব-প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দ তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধি দান করিয়া যথাযোগ্য সমাদর করেন। পদ-সাহিত্যে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পরেই তাঁহার স্থান। তাঁহার সময়ে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, সুবিখ্যাত পদকর্তা বৈষ্ণবদাস তাহা সগর্বে গাহিয়া গিয়াছেন—

যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত ॥

গোবিন্দদাসের পদাবলী গভীরভাবে পাঠ করিলে অনুমান হয়, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাঁহার পূর্বগামী কবিবৃন্দের কাব্যধারা আত্মসাৎ করিয়া তিনি অপূর্ব পদমালা রচনা করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার পদগুলি পড়িতে পড়িতে, ইঁহাদের বহুপদ বারংবার স্মৃতিপথে উদিত হয়। ইঁহাদের

১, ২, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

মধ্যে বিদ্যাপতির দ্বারাই তিনি সমধিক প্রভাবিত ;—তাঁহার একটি পদেও এ-কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

বিদ্যাপতি পদ- যুগল সরোরুহ
নিস্যন্দিত-মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে ॥

"গোবিন্দ কবিরাজ ব্রজবুলি ভাষায়ই বেশীর ভাগ কবিতা রচনা করিতেন। ইহার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে, তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া ইনি হিন্দী-বাংলা-মৈথিল মিশ্রিত এক অতি সুমিষ্ট ভাষায় পদ রচনা করেন—ইহার নামই ব্রজবুলি।"[১] ব্রজবুলিতে পদ-রচনায় তাঁহার ন্যায় সুদক্ষতা আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষায় তদ্ভব অপেক্ষা তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের আধিক্য থাকায়, উহা সুকোমল শ্রুতিমনোহর ও স্পন্দনশীল হইয়া উঠিয়াছে। তাই উহাকে তিনি ইচ্ছানুযায়ী নানাছন্দে, নানাপর্বে, নানাবিধ মিলে মিলে সাজাইয়া বিচিত্র ধ্বনি-মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং এই ধ্বনি-মাধুর্যের দ্বারাই তিনি শ্রোতাকে অতি সহজে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কৃষ্ণরূপ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর আধ-আধ পদ-চলনি রসাল।
কাঞ্চনরঞ্জন বসন মনোরম অলিকুলমিলিত ললিত বনমাল ॥

এই পদটি পাঠকালে গীতগোবিন্দের একটা সুর মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে—

"চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী।"

গোবিন্দদাসের রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের মত অতিশয় অনুভূতিশীল ; পরস্পর সাক্ষাতের পর উভয়েই অপরের রূপে একেবারে বিভোর। কৃষ্ণ তো রাধার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুতের জ্যোতিঃ আর প্রতিপদক্ষেপে প্রফুল্ল পদ্মের বিকাশ দেখেন।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি ॥

১, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'পদামৃত মাধুরী'।

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥

... ...

যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল-উতপল-বন ভরই॥

এই পদটি বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদের অনুরূপ,—

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরী-তরঙ্গ॥

... ...

যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল-পরকাশ॥

যৌবনময়ী রাধাও ভুবনমোহন কৃষ্ণের রূপে মজিয়াছে, তাহার সরল মনে সহসা প্রবল অনুরাগ জাগিয়াছে,—এই অপূর্ব আকর্ষণের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া, বিধাতাকে সে গঞ্জনা দিতেছে—

আধক আধ আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুঁহু লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম।

এই পদটিতে বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদের প্রভাব পড়িয়াছে,—

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধ পরাণ পরিপীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক॥
দাহিন নয়ন পিশুনগণ-বারণ
পরিজন বাম হি আধ।

আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখলুঁ
তাহি ভেল এত পরমাদ ॥
পুর বাহির পথ করত গতাগত
কো না হেরত কান।
তোহার কুসুমশর কতিহুঁ ন সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচ বাণ ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা অত্যধিক আকৃষ্টা হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার সহিত মিলনের প্রতীক্ষায় সে দিন দিন ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতেছে, সখীদের সাহায্যে মাটি ধরিয়া কোনরূপে খাড়া হয়। তাঁহার এই নিদারুণ অবস্থার বর্ণনা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস প্রায় একরূপ দিয়াছেন।—

বিদ্যাপতি—মরমক বোল বয়ানে নাহি বোলত
তনু ভেল কুহু শশীখীনা।
অবনী উপরে ধনি উঠই না পারই
ধয়লি ভুজা ধরি দীনা ॥
গোবিন্দদাস—বিরহ বিষানলে জ্বলত কলেবর
সঘনে লুঠই মহীপঙ্কা।
তুঁহু সুপুরুখমণি তোঁহে ঢুঁড়য়ে জানি
তীবীবধ বিপুল কলঙ্কা ॥

কৃষ্ণের মিলন লাভের নিমিত্ত গোবিন্দদাসের রাধা অবশেষে চণ্ডীদাসের রাধার মত যোগিনী হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা যেমন "রাঙ্গাবাস পরে যোগিনী পারা" গোবিন্দদাসের রাধাও তেমনি শ্যামবর্ণ বসন পরিয়া সর্বদা কৃষ্ণনাম জপ করে,—তাহার নয়নে শ্যামরূপ, বদনে শ্যামনাম, কণ্ঠে শ্যাম-মণিহার, বক্ষে শ্যামকান্তমণি এবং ক্রোড়ে শ্যামবর্ণা সখী,—সর্বত্র শ্যামরূপের ছড়াছড়ি!

লোচনে শ্যামর বচন হি শ্যামর
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামব
শ্যামর সখী করু কোর ॥

যৌবনধর্মানুযায়ী শ্রীমতী রাধা নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিতা হইবার নিমিত্ত যতই আকুল হউক না কেন, নারীসুলভ লজ্জাবশতঃ প্রথম-

মিলন-কালে সে ভীতা-শঙ্কিতা হইয়া পড়ে। তাহার সঙ্গের সখী উঠিয়া গেলে, সেও তাহার আঁচল ধরিয়া সচকিতভাবে কৃষ্ণের পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া পড়ে।—

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি-পরিষঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥
পরশিতে তরসি করহিঁ কর ঠেলই।
হেবইতে বয়ন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥
শূতলি ভীত-পুতলি সম গোরি।
চীত নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপকে কূপে মগন ভেল কাম॥

এই পদটি বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদের অনুরূপ—

বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকি কিয়ে হঠ নাহি মান॥
একে ধনি পদুমিনি সভজহি ছোটী।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী॥
হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরিডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
নয়নক অঞ্চলে চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ।

প্রথম মিলনের সঙ্কোচ যখন রাধা উত্তীর্ণ হইল, তখন তাহার মিলন-পথে আর কোনই প্রতিবন্ধক রহিল না। তাহার মিলন-বাসনা এরূপ দুর্বার হইয়া উঠিল যে, ঝড়বৃষ্টি, বনজঙ্গল, রাত্রির অন্ধকার—কোন কিছুই সে আর

গ্রাহ্য করে না। এইরূপ অভিসার বর্ণনার দ্বারা রাধার কৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্য কবি অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বিপদসংকুল পথে তাহার অভিসার-যাত্রার একটি চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজগামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিশে অথির পবন তরু দোল।
জগভরি শীকর-নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহুঁ দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥

এই পদটির প্রথম চারি চরণ বিদ্যাপতির একটি পদের প্রারম্ভের অনুরূপ ;—

গগন গরজ মেঘা জামিনি ঘোর।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চরু চোর॥
এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।
অপনহুঁ ন দেখিঅ অপুনক দেহ॥

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ছন্দ-লালিত্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভাবের গভীরতায় এই পদগুলি অনুপম।

অভিসার

কৃষ্ণের কুঞ্জে রাধার অভিসার শুধুমাত্র মিলনাকুলা নায়িকার ইন্দ্রিয়বিলাসের দুর্দম আকাঙ্ক্ষা নহে, তাহা ঈশ্বরের সন্নিধানে ভক্তের উপনীত হইবার কৃচ্ছ্র সাধনাও বটে। তাহার এই দুঃসাধ্য ব্রতসাধনের কথা জনৈকা সখী শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছে—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।

দূরতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন শিখই ভুজগ-গুরু পাশে ॥
গুরুজন-বচনে বধিরসম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধিসম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

অর্থ—হে মাধব, তোমার নিকট অভিসারের জন্য রাধা কঠোর সাধনা করিতেছে।

গৃহাঙ্গনে কণ্টক গাড়িয়া এবং বস্ত্রদ্বারা নুপুর আবৃত করিয়া তাহার সুকোমল চরণ-কমলের দ্বারা উহার উপর দিয়া সে হাটিয়া যাইতেছে। কলসীর জল অঙ্গনে ঢালিয়া, সে-স্থান পিচ্ছিল করিয়া, সে অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছে। সারারাত্রি জাগিয়া স্বমন্দিরে বারবার পদ-চারণা করিয়া সে দূরপথ গমনের অভ্যাস করে। অন্ধকারে পথ-চলা শিখিবার উদ্দেশ্যে, সে দুই হস্ত দিয়া চক্ষু আবৃত করিয়া গমন করে। নিবিড় বনে সর্পদংশন যাহাতে না ঘটে, সেজন্য মণিময় কঙ্কণ দান করিয়া ওঝার নিকট সে সাপের মন্ত্র শিখে। গুরুজনের কথায় সে কর্ণপাত করে না, এক শুনিতে আর বলে এবং পরিজনের বাক্যে মুগ্ধার ন্যায় হাসিতে থাকে। স্বয়ং গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী।

বস্তুতঃ, রাধার অভিসার ঈশ্বরোপাসনার এক অভিনব পদ্ধতি। বৈধী ধর্ম-সাধনার ন্যায় এই রাগানুগার পথটিকেও বলা যাইতে পারে "ক্ষুরস্যধারা নিশিত দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ করয়ো বদন্তি"। তাই রাধা "দুর্দিনের অশ্রুজল-ধারা মস্তকে" লইয়া, ঘনান্ধকার কণ্টকিত পথে প্রেমময় কৃষ্ণের কুঞ্জের দিকে ছুটিয়া যায় "ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তরপ্রদীপ খানি"। তাহার এইরূপ দুষ্কর তপস্যা যে ভয়ঙ্কর প্রাণসংশয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়া, তাহার জনৈকা সহচরী তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কিঁ বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তাব॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচাব।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

অর্থ—শয়নমন্দিরের বহির্দ্বাব কঠিন কপাটে আবদ্ধ। কর্দমময় পথ পদে পদে আশঙ্কাপূর্ণ। তাহাব উপবে প্রবলতব বেগে ঝড়বৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছে। সূক্ষ্ম নীলশাড়ীতে কি আব মুষল-বাবি-ধারা নিবাবণ হয়? মানস সুরধুনীর পরপাবে সুদূব কৃষ্ণেব কুঞ্জে তুমি কেমন করিয়া অভিসার কবিবে? ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে, ভীষণ শব্দে অন্তব কাঁপিয়া উঠিতেছে। দশদিকে বিদ্যুৎশিখা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, উহাব আলোকে নয়নতাবা উচ্চকিত হইয়া উঠে। এমন দুর্যোগের মধ্যে তুমি ঘব ছাড়িয়া বাহিব হইয়া—শেষে কি প্রেমের জন্য প্রাণ হাবাইবে? এই প্রশ্নেব উত্তবে গোবিন্দদাস বলেন, এখন আব কিছুই বিচাব করিবাব নাই, ধনু হইতে নির্গত তীরের গতিরোধ কবিবাব যত্ন নিতান্ত বৃথা।

সখীর বাধায় রাধাও অকপটে জানায়—

যছু পদতলে হাম জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুবোধ।

—যাঁহার চবণ-তলে জীবন সমপণ কবিয়াছি, তাঁহার জন্য কি আব নিজেব শরীরের প্রতি লক্ষ্য থাকে?

মোক্ষাভিলাষী সাধক যেরূপ মনেব বাসনা-কামনা একে একে বিসর্জন দেয়, কৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধাও সেইরূপ বিপদ্-সংকুল অভিসার-পথে তাহার প্রিয় অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিতে কবিতে অগ্রসর হয়।—

রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা-কমল তেজল বরনারী॥

পরিহরি মৌলিক মালতী-মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ-ভরমে ভেল ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি॥
বেশ-শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

অর্থ—অনুরাগের প্রাবল্যে রাধা দুই-চারি পা চলিল, কিন্তু আর যেন পা চলে না, তাই হাতের লীলাকমল সে ত্যাগ করিল। ক্রমে পথ আরো কঠিন হইয়া উঠিলে সে তাহার কেশের মালতী-মালা, গলার মণিময় হার প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি একে একে পরিত্যাগ কবিল। পথগমনে বাধা জন্মাইতেছে বলিয়া সে তাহার গুরুভার কুচযুগলকে নিন্দা করিতে লাগিল। যাহা হউক, অবশেষে শুধুমাত্র গায়ের নীল শাড়ীখানি লইয়া সে কৃষ্ণের কুঞ্জে গিয়া উপনীত হইল।

অভিসার লইয়া গোবিন্দদাস অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন ; যথা—দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, গ্রাম্যাভিসার, শীতাভিসার প্রভৃতি। অভিসারের এত বৈচিত্র্য আর কাহারো পদে দেখা যায় না। এই পদগুলিতে রাধাসুন্দরীকে বিভিন্ন স্থান, কাল, অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া কবি তাহার দেহ-সৌন্দর্য ও হৃদয়মাধুর্য এবং সেই সঙ্গে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য বিচিত্ররূপে অঙ্কন করিয়াছেন। এই প্রকার তিনটি চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মেঘাচ্ছন্ন নিশীথে নিবিড় অন্ধকারে রাধা যখন অভিসারে চলিয়াছে, তখন—

চৌদিশে অথির পবন তরুদোল।
জগভরি শীকরনিকর হিলোল॥

—চারিদিকে অস্থির পবন তরুলতাসমূহ দুলাইতেছে এবং সমস্ত জগৎ জুড়িয়া জলকণারাশি হিল্লোলিত হইতেছে। এইরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদিও রাধা গ্রাহ্য করিতেছে না, তথাপি কর্দমময় পিচ্ছিল পথে তাহার যৌবনপূর্ণ দেহভার লইয়া সে বারবার আছাড় পড়িতেছে।

পঙ্ক-পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড় কত বেরি নাহি অবলম্ব॥

গ্রীষ্মকালে মাথার উপরে প্রখর সূর্য, আর পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালুকারাশি ; কিন্তু প্রেমের অনিবার গতিবশতঃ রাধা সে-সময়েও অভিসারে বাহির হয়।—

মাথহি তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
নোনিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার ॥

পৌষ মাসের রাত্রে শীতল বাতাস বয়, চারিদিকে কুয়াসা পড়িয়া চন্দ্রকিরণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, ঘরের ভিতরে থাকিয়াও মানুষের দেহ শীতে কাঁপিতে থাকে এবং সকলেই চক্ষু মুদিয়া শয্যায় শুইয়া রহে ;—কিন্তু এমন সময়েও রাধা মাত্র একখানি বসনে আবৃত হইয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়ে। তাহার এইরূপ দুঃসাহস দেখিয়া তাহার সখীরা বিস্মিত হয়।—

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নযন রহুঁ ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥

অভিসারের ন্যায় মিলন-বিষয়ক পদ-রচনাতেও গোবিন্দদাস বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইযাছেন। কুসুমিত কুঞ্জকাননে প্রফুল্লহৃদয় রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের বিপুল উল্লাস তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায ও আবেগময় ছন্দে সুন্দররূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যথাযথ সুর ও ছন্দে এই জাতীয় পদগুলি পড়িতে পারিলে, পাঠকের হৃদয় স্বতঃই আনন্দভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই প্রকার পদকে 'উল্লাসের পদ' বলে। মিলনানন্দ উপভোগের পক্ষে নয়ন-প্রীতিকর স্থান প্রশস্ত বলিয়া, এই উল্লাস-পদগুলির পটভূমিকায় বহু মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অঙ্কিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনটি উল্লাসের পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে প্রকৃতির সুন্দর শোভা দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে মিলনানন্দ-লাভের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে ; তিনি উৎফুল্ল মনে বংশীবাদন করিয়া প্রেমময়ী গোপীবৃন্দকে আকর্ষণ করিতেছেন।—

শরদ চন্দ পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যুথি
মত্ত মধুকর ভোরনী।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি,
শ্যামমোহন মদনে মাতি'
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত-চোরণী ॥

রাসোপলক্ষে রসবতী গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মহানন্দে বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে, সুমধুর কণ্ঠে গান গাহিতেছে ও কোমলচরণে ললিতভঙ্গে নৃত্য করিতেছে—তাহাদের এইরূপ প্রবল উল্লাস কবির ভাষায় স্পষ্টতঃ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

বাজত ডম্ব রবাব পাখোয়াজ
করতল-তাল তরল একু মেলি।
চলন্ত চিত্রগতি সকল কলাবতী
করে কর নয়ানে নয়ানে করু খেলি ॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ নারী।
জলদ পুঞ্জে জনু তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥

ঝুলন-পালায় রাধাকৃষ্ণ একটি মনোহর কুঞ্জকাননে এক বেদিকায় একত্র উপবেশন করিয়াছেন; তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া কবি একটি সুন্দর নৈসর্গিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

নব ঘন কানন শোভন পুঞ্জ।
বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥

এইরূপ প্রাকৃতিক চিত্র তাঁহার বহুপদেই দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের সংযোগ তিনি অনেক স্থানেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার 'বারমাস্যা'-পদটি ইহার সুন্দর নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে, রাধাকে সুদীর্ঘকাল বিরহ-যাতনা ভোগ করিতে হয়। মাসে মাসে প্রকৃতির প্রভাবে তাহার সেই বেদনা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে, বিভিন্ন ঋতুর বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে অতীতকালের কত সুখস্মৃতি জাগ্রত হয়, এবং তাহার হৃদয় উত্তরোত্তর কৃষ্ণচিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার এই বৎসরব্যাপী বিরহ-বেদনা প্রতি মাস

নিসর্গ শোভা

অনুসারে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কোন কোন পদকর্তা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে 'বারমাস্যা' বলে। গোবিন্দদাসের বারমাস্যা-পদের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন
উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগয়ে কামিনি
জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাসে বিকশিত পদুমিনি
সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥

এই পদটিতে নিম্নোদ্ধৃত বিদ্যাপতির বারমাস্যা-পদের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়—

সাওন মাস বরিস ঘন বারি।
পন্থ ন সুঝে নিসি আঁধিআরি।
চৌদিস দেখিঅ বিজুরি রেহ।
সে সখি কামিনি-জিবন সন্দেহ॥
ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সবদিস কুহু কয় দাদুল মোর॥
... ...
আশিন মাস আস ধর চীত।
নাহ নিকারুণ নৈ ভেলাহ হীত॥
সররর খেলএ চকবা হাস।
বিরহিনি-বৈরি ভেল আসিন মাস॥

রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, প্রেমবিহ্বলতা, মোহমাদকতা, বিরহ-বেদনা,

মান-ভঞ্জন, বিপ্রলব্ধা-খণ্ডিতাদি নায়িকা-প্রকৃতি, মিলন, সম্ভোগ, রাস ইত্যাকার বহু বিষয়ে গোবিন্দদাস বহুপদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী পদকর্তাদের অপেক্ষা বিশেষ কোন অভিনবত্ব এইগুলিতে তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তথাপি ছন্দের লালিত্য, ভাষার মাধুর্য ও প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যের গুণে এই পদগুলি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ, সুন্দর প্রকাশ-কৌশলের জন্যই তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা,—ভাবের গভীরতা ও মহনীয়তার জন্য নহে। কোন পদের অন্তরঙ্গ অপেক্ষা বহিরঙ্গটি পরিপাটীরূপে সাজাইবার দিকেই তাঁহার সমধিক চেষ্টা। এই হেতু তাঁহার পদগুলি ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা সুসমৃদ্ধ হইলেও, লোকোত্তর ভাবের ব্যঞ্জনা উহাদের অল্পগুলিতেই আছে। তাঁহার রাধা-বিরহের প্রসিদ্ধ পদগুলিতে কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতনা নাই এবং মাথুর-বিরহের সুরকে তিনি দেশকালের সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারেন নাই। তবে, তাঁহার অভিসার-পদগুলিতে সুগভীর আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ আছে;—তাহা পাঠকের চিত্তকে সহজেই সংসারের কণ্টকিত পথের বাহিরে উন্মুক্ত অমৃতলোকে লইয়া যায়। এই কারণে, তাঁহাকে প্রধানতঃ "অভিসারের কবি" বলা যাইতে পারে।

গোবিন্দদাস-পদাবলীর সমালোচনা

ভণিতা-রচনাতেও গোবিন্দদাস অভিনব কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক পদের বিষয়বস্তুর বর্ণনার শেষে তাঁহার নিজের নামটি তিনি এরূপ সুকৌশলে সংযোজিত করিয়াছেন, যেন তিনি দ্রষ্টার মত বিষয়টি উপভোগ করিতেছেন। যথা—১৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট'—প্রভৃতি পদটির শেষভাগে রাধার সখীরা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, প্রেমের জন্য সে নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিবে নাকি? তখন রাধার পক্ষ হইয়া কবি উত্তর দেন।—

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদটিতে প্রেমাকুলা রাধা ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অন্ধকার নিশীথে পঙ্কময় বন্ধুর পথে লীলা-কমল, মালতী-মালা প্রভৃতি অলঙ্কারাদি একে একে পরিত্যাগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল;—কবি যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা দেখিতেছেন। অবশেষে রাধা শুধু নীলশাড়ীখানি লইয়া নিকুঞ্জে উপনীত হইলে, কবির উদ্বিগ্নতা দূর হইল।—

বেশ-শেষ বহু নীলিম বাস ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

এইরূপে কবি প্রতি পদের বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার ভণিতা অত্যাশ্চর্য চাতুর্যের সহিত রচনা করিয়াছেন। "কবি সকল সময়ই শ্রীমতীর সখী-স্থানীয়, কেবল তিনি লীলার বর্ণনা করিতেছেন না—তিনি লীলা-সঙ্গিনী,—নিজের চোখে লীলারস উপভোগ করিতেছেন, তিনি শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী—সাধের সাথী—সুখে সুখী। কবি লীলার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া ও মিলাইয়া দিতেছেন। এই সখ্যভাবটি গোবিন্দদাসের পদের ভণিতা-প্রসঙ্গে যেরূপ চমৎকার ফুটিয়াছে—এমনটি আর কোন কবির পদে নয়।"[১]

গৌরপদ

গোবিন্দদাস কতিপয় গৌরপদ রচনা করিয়াছেন। যদিও তিনি চর্মচক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের পার্থিব মূর্তি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তথাপি মানস-দৃষ্টিতে তাঁহার ভাবমূর্তি তিনি স্পষ্টতঃ অবলোকন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষদর্শী বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির গৌরপদ অপেক্ষা তাঁহার রচিত গৌরপদ অনেক বেশী উজ্জ্বল ও কবিত্বময়। রাধাকৃষ্ণলীলা কীর্তন করিবার পূর্বে অনেক কীর্তনীয়া তাঁহার পদ 'গৌরচন্দ্রিকা'-রূপে গাহিয়া থাকেন। তাঁহার একটি সুপ্রসিদ্ধ 'গৌরপদ' নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর ॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল-লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর ॥

১, শ্রীকালিদাস রায় 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য'।

অবিরত প্রেম- রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাস কতকগুলি প্রার্থনার পদ রচনা করেন। এই পদগুলিতে তাঁহার ভক্তির গভীরতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। একটি প্রার্থনার পদ নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

ভজহুঁ রে মন, নন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ-জনম সত সঙ্গে, তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ, বাত বরিখণ, এদিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন, পাদ-সেবন দাস রে।
পূজন সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাস রে॥

(৬) বলরাম দাস

বলরাম দাস বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই নিঃসন্দেহে বলা যায় না;—কারণ ঐ নামে একাধিক বৈষ্ণব কবি বিদ্যমান ছিলেন। যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বলরাম দাস, সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রভৃতির সমসাময়িক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল।

বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষাতেই তিনি গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে উভয় প্রকার পদ রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাসের তুলনায় তাঁহার পদাবলীর সংখ্যা অধিক নহে; কিন্তু কবিত্বের বিচারে তিনি তাঁহাদের উভয়ের সহিত তুলনীয়।

বলরামের পদগুলি প্রচলিত সহজ ভাষায় ও সুললিত ছন্দে রচিত। গোবিন্দদাসের মত ভাষার ঐশ্বর্য ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য তাঁহার নাই বটে, কিন্তু

ধ্বনির মাধুর্য ও ভাবের গভীরতার সমাবেশে তাঁহার পদনিচয় কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় বৈষ্ণব কবির প্রসিদ্ধ পদগুলি মাধুর্য-রস লইয়া রচিত, কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্য-রস লইয়া রচিত বলরামের কতিপয় পদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার বাৎসল্য-রসের একটি উৎকৃষ্ট পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি রাখাল-বালকদের সঙ্গে স্বল্পবয়স্ক গোপালকে গোচারণে পাঠাইতে স্নেহময়ী যশোদারাণী কতই না অমূলক আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। তিনি রাখালদিগকে বারবার সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাহারা যেন বহুদূরে না যায় ও তাঁহার প্রাণের কানাইকে তাহারা যেন সর্বদা ঘিরিয়া থাকে।—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম,
মিনতি করিযে তো-সভারে।
বন কত অতি-দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিযা মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর-আগে রাঙ্গা পাযে জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য, মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিধি কৈলা গোপজাতি, গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥

রাধা ও কৃষ্ণের অনুপম রূপের সুন্দর বর্ণনা ও তাঁহাদের উভয়ের অপূর্ব প্রেমলীলার মনোহর চিত্রাঙ্কনেও তিনি সুদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কৃষ্ণের মূর্তি দেখিয়া রাধার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে; তাহার হৃদয়পটে কৃষ্ণরূপের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহার উক্তির মধ্য দিয়া তাহা বাহিরে পরিস্ফুট হইয়া

উঠিয়াছে। কৃষ্ণের মিলন পাইবার জন্ম তাহার অন্তরের ব্যাকুলতাও সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকারের একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরি চমকে তায।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায॥
মরি মরি মই ওরূপ নিছনি লইযা।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ান নাচনি
চাহনি মদন বাণে।
তেবছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাযা লোটায়া
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥

কিন্তু বলরাম দাসের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য নহেন, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগের কথা কোন সখী তাঁহাকে জানাইলে, তিনি পরস্ত্রীর প্রেম গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। তখন সেই সখী তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, তিনি সমগ্র জগতের পতি, কাজেই জগদ্বাসিনী রাধার পরপতি তিনি কিছুতেই নহেন।—

তুমি ত জগত, তোমাতেই জগত, তুমিই হে জগতপতি।
তুমি বিনা কেহ, অন্য নহে কভু, কেবা কোথা পরপতি॥

প্রেমলীলা ও রসোদ্গার লইয়া বলরামদাস অনেকগুলি মনোরম চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণ—উভয়েই উভয়ের যে কত প্রিয়, তাহা বিবিধ কৌশলে তিনি বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সুমধুর মধুমাসে প্রদীপালোকিত কুঞ্জবাসরে নবানুরাগিণী রাধা প্রেমময় কৃষ্ণের কাছে যে সোহাগযত্ন ও ভালবাসা লাভ করে, তাহা সুদুর্লভ, তাহা একেবারে অলৌকিক।—

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগি পোহাইল রাতি তিল নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণ করে উতরোলে তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে হিয়া হৈতে শেষে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া মুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে ক্ষণে করে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয় বলরাম কি কহিতে পারে॥

বলরাম দাসের কোন কোন পদে গভীর আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ আছে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন। সেই অদ্বৈত পরমাত্মাই সৃষ্টির পরে আত্মা ও জীব—এই দ্বৈতরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই, জীব ও আত্মা—ঈশ্বর ও মনুষ্য—উভয়েই পরস্পরের সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। তাই, রাধার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥

জ্ঞানদাসের কোন কোন পদেও এইরূপ দ্বৈতাদ্বৈত-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—

তোমায় আমায় একই পরাণ, ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া, কিরূপে আছিলা তুমি॥

বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস প্রভৃতি রাধার বারমাস্যা লিখিয়াছেন, কিন্তু বলরাম দাস কৃষ্ণের বারমাস্যা রচনা করিয়াছেন। প্রেমময়ী রাধাকে বৃন্দাবনে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমার কথা তিনি কখন বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। বৎসরে বিভিন্ন ঋতুর আগমনে প্রকৃতির অঙ্গে নানাবিধ শোভা-সৌন্দর্যের আবির্ভাব দেখিয়া, তাঁহার চিত্তে সুন্দরী রাধার

মিলন-সুখ-স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। বর্ষাকালে অম্বরতল নবজলধরমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং দিগদিগন্ত মেঘমন্দ্রে মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিত হইতেছে। প্রকৃতির এইরূপ মনোরম দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার অন্তরে রাধামিলন-বাসনা প্রবল হইয়া উঠিতেছে।—

নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর বরিষা নব পরবেশে।
ক্ষণে ক্ষণে জলদ মধুরময় ধ্বনি শুনি গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে॥

ফাল্গুন মাসে দোললীলা উপলক্ষে ব্রজবাসী সকলেই হুলি খেলায় আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই আনন্দলীলায় তিনি যোগদান করিতে পারিলেন না, তাঁহার সর্বাঙ্গ রাধা-বিরহে জ্বলিয়া যাইতেছে।—

ফাগুনে মধুপুর নাগরী নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গে।
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গে॥

বলরাম দাসের কোন কোন পদ অনুপ্রাসের প্রয়োগে অতিশয় শ্রুতিমধুর হইয়াছে। রাসপূর্ণিমার উজ্জ্বল রজনীতে বৃন্দাবনের মাধবী-নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া রসময়ী ব্রজনারীদের মধুর রভসকেলির যে শব্দালঙ্কারময় বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।—

মধুর সময় রজনিশেষ
শোহই মধুর কাননদেশ
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া।
মধুর মাধবী-কেলিনিকুঞ্জে
ফুটল মধুর কুসুম পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহি মাতিয়া॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতি নবকিশোর।
মধুর বরজরঙ্গিনী মেলি
করত মধুর রভসকেলি॥

... ...

৩। চরিত-কাব্য

শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় জীবন-চরিত লেখার সূচনা হয়। তাঁহার জীবৎকালেই তিনি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের দ্বারা মনুষ্যরূপী পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইলে পরম পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে ঈশ্বরভাবে বন্দনা করেন, রায় রামানন্দ তাঁহাকে দেবতাজ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে আরাধনা করেন, জগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দসহ হরিনামের পরিবর্তে চৈতন্যনাম সংকীর্তন করেন, স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতভাবের একাত্মক রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগে রাধার ভাব-কান্তি লইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ, এবং সুবিখ্যাত গৌরীদাস পণ্ডিত নিম্বকাষ্ঠে চৈতন্য-বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে ভক্তবৃন্দের দ্বারা তিনি ভগবান বলিয়া গণ্য হইলে, তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিবৃন্দ তাঁহার জীবন-কথা লইয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় গীত, নাটক, কাব্য, কবিতা প্রভৃতি রচনা করিতে থাকেন। ফলতঃ, চৈতন্য-চরিত্রের প্রভাবে বাঙ্গালা-ভাষায় এক অভিনব সাহিত্যের উদ্ভব হয়,—প্রাচীনকালের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়া এক নূতন ধরণের ভাবধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত হয়। এতকাল চণ্ডী-মনসা-শিব প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর মহিমা লইয়া বাঙ্গালার কবিবৃন্দ ব্যাপৃত ছিলেন, কোন ঐতিহাসিক মানব-চরিত্রকে সাহিত্যসৃষ্টির উপাদানরূপে তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। মঙ্গলকাব্যগুলিতে চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর, কালকেতু প্রভৃতি মনুষ্যচরিত্র অঙ্কিত হইলেও, কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা ঐগুলির উদ্দেশ্য নহে। শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই সমসাময়িক ব্যক্তির অনুপম চরিত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষায় কাব্য-কবিতা রচনার সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয়, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিধি-পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া তাঁহার জীবনী-লেখকেরা মানব-চরিত্রের পরিবর্তে দেবচরিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যকে পরমেশ্বরের অবতাররূপে দেখিয়াছেন, সাধারণ মনুষ্যরূপে দেখিবার অবকাশ তাঁহাদের কাহারও হয় নাই। আধুনিক যুগে যেরূপ

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত হয়, সেইরূপ প্রণালী তাঁহারা কেহই অবলম্বন করেন নাই। বর্তমানকালে কোন ব্যক্তির জীবনী লিখিতে গেলে, তাঁহার সমগ্র জীবনের যাবতীয় ঘটনা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে হয় এবং ঐ ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার আচরণ, ব্যবহার ও স্বভাব নির্ণয় করিতে হয়। তাঁহার প্রতি লেখকের কোনরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি আছে কিনা, তাঁহার চরিত্রের দ্বারা লেখক নিজে বিমুগ্ধ কিনা—এই প্রকার কোন কথাই বিশুদ্ধ জীবনচরিতে থাকিবে না। কিন্তু চৈতন্যের চরিতলেখকেরা তাঁহার চারিত্রিক মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধারণ মানুষী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও দৈবীলীলার বিকাশ দেখেন এবং তাঁহার চরিত্রে ইচ্ছামত দেবত্বের আরোপ করেন। এই কারণে তাঁহাদের অঙ্কিত চৈতন্যচরিত্র অনেকটা বাস্তবতাহীন হইয়া পড়ে। তথাপি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গজীবন যে এই জাতীয় চরিতকাব্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার বহিরঙ্গ-জীবনের যথাযথ বিবরণ না পাইলেও, তাঁহার অন্তরের প্রেম-প্রীতি-ভক্তি প্রভৃতির প্রচুর পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এইহেতু ইহাকে 'জীবনচরিত' না বলিয়া 'চরিত-কাব্য' বলিলেই সঙ্গত হয়। ইহার অধিকাংশ ভাগ পয়ার ছন্দে ও অবশিষ্টাংশ ত্রিপদীছন্দে রচিত। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত হওয়ায় ইহাতে স্বভাবতঃই একটা অনির্বচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে; চৈতন্যচরিত্রের যে অলৌকিক মহিমা সহজ কথায় প্রকাশ করা যায় না, তাহাই কাব্যের ভাষায় প্রোজ্জ্বলরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে হরিনাম কীর্তন করার সৌভাগ্য যাঁহারা পান, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় গৌরপদ রচনা করিয়া তাঁহার জীবনকথা বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেন। মুরারী গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে চৈতন্যজীবনী লেখেন, উহার নাম 'কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত', কিন্তু 'মুরারিগুপ্তের করচা' নামে উহা পরিচিত। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর আনুমানিক ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই করচাখানি সমাপ্ত হয়। মুরারির পরে 'কবিকর্ণপুর' উপাধি-প্রাপ্ত পরমানন্দ সেন চৈতন্যের জীবনকথা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটক রচনা করেন। বৃন্দাবনের রূপ-সনাতন-প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দও চৈতন্যতত্ত্ব-বিষয়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লেখেন।

মুরারিগুপ্ত ও কবিকর্ণপূরের প্রদত্ত চৈতন্য-জীবন-কাহিনী প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী লেখকেরা বাঙ্গলা ভাষায় চৈতন্যচরিত রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম চৈতন্যচরিত রচনা করেন বৃন্দাবনদাস; ইহা 'চৈতন্যভাগবত' নামে সুবিখ্যাত; আনুমানিক ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত। তৎপরে আরো অনেকে বাঙ্গালা পদ্যে চৈতন্যচরিত লেখেন; তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ মিশ্র ও লোচনদাস সমধিক প্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের কাহারো কাহারো জীবনকথা লইয়া কতিপয় বৈষ্ণবকবি কতকগুলি চরিতকাব্য রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের লীলা লইয়া ঈশান নাগর কর্তৃক রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' ও হরিচরণ দাস কর্তৃক রচিত 'অদ্বৈতমঙ্গল' এবং অদ্বৈতের পত্নী সীতাদেবীর চরিত্র লইয়া লোকনাথ দাস কর্তৃক রচিত 'সীতাচরিত্র' ও বিষ্ণুদাস কর্তৃক রচিত 'সীতাগুণকদম্ব' উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় চরিতকাব্যের মধ্যে আর এক খানা উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'প্রেমবিলাস', আনুমানিক ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ দাস (বা বলরাম দাস) ইহা রচনা করেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, রূপ, সনাতন, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি বহু চৈতন্যভক্তের সম্বন্ধে বহু কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যচরিত-কাব্যের তুলনায় তাঁহার ভক্তবৃন্দের বিষয়ক চরিতকাব্যগুলি অনেক নিকৃষ্ট, তাই উহাদের আলোচনায় আমরা নিবৃত্ত রহিলাম।

(১) বৃন্দাবন দাস

আনুমানিক ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী। তাঁহার জননী নারায়ণী দেবী সুবিখ্যাত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীবাসের গৃহাঙ্গণে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বৈষ্ণব ভক্তদের লইয়া পরমানন্দে সারারাত্রি হরিনাম সংকীর্তন করিতেন। মাত্র চারি বৎসর বয়স হইতে নারায়ণী মহাপ্রভুর সেই সুমধুর হরিনাম কীর্তন শুনিবার এবং তাঁহার সেই ভক্তিভাব-বিহ্বল উদ্দাম নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। স্বয়ং মহাপ্রভুই তাঁহার নির্মল শিশুমুখে কৃষ্ণনাম দান করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে তিনি যেদিন প্রথম প্রকট হন সেদিনও তাঁহার ভোজনা-বশিষ্ট প্রসাদ বালিকা নারায়ণীকে দান করেন। চৈতন্যভাগবতাদি চরিত-

কাব্যে নারায়ণীর নামোল্লেখ আছে। এই নারায়ণীর গর্ভ হইতে বৃন্দাবন দাস শ্রীবাসের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তখন শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, আর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। "১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর হয়। ঐ বয়সের বালকের পক্ষে পুরীতে যাইয়া শ্রীচৈতন্য দর্শন সম্ভব নহে।"[১] তাঁহার রচিত চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব লীলাপ্রসঙ্গে তিনি বারংবার আক্ষেপ করিয়াছেন—

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে
হইয়াও বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥

তাঁহার গুরুদেব নিত্যানন্দ-প্রভুর উৎসাহে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন,—একথার উল্লেখ চৈতন্য ভাগবতে পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের নিকট হইতেই চৈতন্য-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হন, এবং অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি অপরাপর চৈতন্য-পারিষদের নিকট হইতে অন্যান্য সংবাদ তিনি লাভ করেন। চৈতন্য ভাগবতের একাধিক স্থানে এতদ্বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ স্বীকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ-প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি।

"১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।"[২] ইহার নাম প্রথমে ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ঐ নামেই ইহার উল্লেখ আছে। বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ বলিয়া, বৃন্দাবন দাস তাঁহার জীবন-কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণ-লীলার অনুরূপভাবে অঙ্কিত করেন। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ ইহাকে 'চৈতন্যভাগবত' নামে আখ্যাত করেন; তদবধি ইহা এই পরবর্তী নামেই সুপরিচিত।

চৈতন্য-ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥ (প্রেমবিলাস)

১, ২, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'।

বৃন্দাবন দাস শেষবয়সে বর্দ্ধমান জেলায় দেনুড় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় একটি মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আমরণ কৌমার্য পালন করিয়া দীর্ঘকাল জীবন যাপন করেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খেতুরীর মহোৎসবে (১৫৮৪ খ্রীঃ) তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লেখিত আছে।

চৈতন্য ভাগবত

"বাঙ্গলার বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্যভাগবত অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও আদরণীয় গ্রন্থ আর নাই।"[১] সেকালে সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম ব্যাপিয়া সহস্র-সহস্র ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালাদেশের প্রায় সর্বত্র চৈতন্যভাগবত প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। "শ্রীচৈতন্যভাগবতের যত অধিক সংখ্যক হাতে-লেখা পুঁথি পাওয়া যায়, এত আর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থের পাওয়া যায় না।"[২] শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরভক্তি ইহাতে এমন সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জনসাধারণ ইহা পাঠ করিয়া অতি সহজেই ভক্তিরসে বিভোর হইয়া পড়ে,—মহাপ্রভুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে। "শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়"—বলিয়া কবি তাঁহার কাব্যসম্বন্ধে যে-প্রশস্তি বার বার গাহিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন খণ্ডে ইহা বিভক্ত, প্রথম খণ্ডে পনেরো, দ্বিতীয় খণ্ডে সাতাশ ও তৃতীয় খণ্ডে দশ—মোট বাযান্ন অধ্যায়ে এই গ্রন্থটি পরিপুষ্ট। কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা, রচনার সরলতা ও লেখকের আন্তরিকতার গুণে এই বৃহৎ গ্রন্থখানি অতিশয় আগ্রহের সহিত পড়িয়া সহজেই শেষ করা যায়। ইহার ভাষা পদ্য হইলেও, গদ্যের কাছাকাছি,—সাধারণ লোকের মুখের কথার অনুরূপ, কাজেই অতিশয় সহজবোধ্য।

শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বর্ণনা করা বৃন্দাবন দাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার কথাও তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, তাহারও সুস্পষ্ট চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। এইরূপে গৌরাঙ্গলীলার পটভূমিকাটি পরিপাটিরূপে অঙ্কন করিয়া, তদুপরি তিনি বিবিধ বর্ণক্ষেপে চরিত্রচিত্র প্রোজ্জলরূপে চিত্রিত

১, শ্রীসুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। ২, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

করিয়াছেন। তখন বঙ্গদেশ মুসলমান-শাসনের অধিকারে, শাহ্‌জাদা বারবগ (১৪৮৬), সৈফ্‌উদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ (১৪৮৬-৮৯), নাসির উদ্দীন মহ্‌মুদ শাহ্‌ (১৪৯০-৯৩), আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং নাসিরউদ্দীন নস্‌রৎ শাহ্‌ (১৫১৯-৩২) একের পর একে বাঙ্গালার সুলতান হইয়া, কেহ স্বল্প-কাল—কেহ বা দীর্ঘকাল দোর্দণ্ড প্রতাপে হিন্দুদিগকে শাসন করেন;—"মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।" এইরূপ দুর্দান্ত যবন নরপতির ভয়ে নবদ্বীপ-বাসী হিন্দুরা নিঃসঙ্কোচে ধর্মকর্ম করিতে পারিত না। হিন্দু সমাজেও তখন ধর্মানুশীলনের ঘোর দুর্দশা; সকলেই আহার-বিহার ও বিলাস-ব্যসন লইয়া প্রমত্ত, কেবল ধনীলোকেরা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর সাড়ম্বরে পূজা করিত, কিন্তু সে-পূজাতে ঈশ্বরভক্তির লেশমাত্রও থাকিত না।

ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
... ...
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

ধর্মের এই নিবিড় গ্লানি দূর করিবার জন্য তখন একে একে কতিপয় ঈশ্বরভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হইতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপের অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি, রাঢ়ের অন্তর্গত একচাকা-গ্রামের নিত্যানন্দ, বূঢ়নের হরিদাস, চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং ত্রিহুতের পরমানন্দ পুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থায় নবদ্বীপ তখন সমৃদ্ধ,—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের নিমিত্ত যেন "বিধাতা সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা"। নবদ্বীপ লোকে

লোকারণ্য,—গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ হিন্দুজাতি গঙ্গার তীরে বাস করে, টোল-চতুষ্পাঠী খুলিয়া বড় বড় পণ্ডিত সগর্বে বিদ্যাদান করে, নানাদেশ হইতে দলে দলে শিক্ষার্থীরা নবদ্বীপে আগমন করে, এবং নবদ্বীপের নবীন বালকেও প্রখর পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া প্রবীণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সমকক্ষতা করে। কিন্তু কাহারো অন্তরে ঈশ্বরভক্তি নাই, ধর্মশাস্ত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা কেহই করে না।—

গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

সমগ্র জগৎ-সংসার এই প্রকার ভক্তিশূন্য দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ বড়ই বিষণ্ণ মনে দিন যাপন করেন, শ্রীবাসের গৃহে আসিয়া তাঁহারা হরিনাম গাহেন এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় মর্ত্যে অবতরণ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানান। অদ্বৈতপ্রভু প্রতিদিন

তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবি কৃষ্ণ মহা কুতূহলে
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।

কিন্তু নবদ্বীপের অবৈষ্ণব হিন্দুরা তাঁহাদের এই প্রকার উচ্চকণ্ঠে হরিনাম-কীর্তন পছন্দ করিত না, উহা হইতে তাঁহাদের নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইত, কারণ তাহাদের মনে আশঙ্কা হইত যে, বিধর্মী অধিপতি ইহা শুনিতে পাইলে ভয়ঙ্কর রুষ্ট হইবেন এবং নদীয়াবাসীদের উপর নিদারুণ নির্য্যাতন করিবেন।—

শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ।
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন্ ব্যবহার॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাই যাই ভাই ভোজন করিয়া॥

... .

মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে এথা॥

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা বলিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস এই প্রকার বহু ঐতিহাসিক সংবাদ দান করিয়াছেন। এইরূপ "নানাকারণে আমরা চৈতন্যভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি।"[১]

শ্রীচৈতন্য মাত্র আটচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন;—তাঁহার এই জীবন-কাল তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়,—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। শৈশব লীলা হইতে যৌবনের প্রারম্ভকালে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়া শত শত ছাত্রকে শিক্ষাদান পর্যন্ত তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ও দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ এবং মাতাপত্নীসহ স্বাচ্ছন্দ্যে পারিবারিক জীবন যাপন এই প্রথম খণ্ডেরই অন্তর্গত। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তিনি বেশীদিন গৃহবাস করেন নাই। কিছুকাল পরে তিনি গয়াতীর্থে গমন করেন; তথায় পরমেশ্বর শ্রীশ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সহসা প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তির উদয় হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর-পুরীর নিকট তিনি তখন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয়ভাগের সূচনা। গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া মাত্র বৎসরেক কাল ভক্তবৃন্দসহ অহোরাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্তন করিয়া তিনি সহসা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার জীবনের তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভ হয়। নবীন সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের নানাতীর্থ তিনি পর্যটন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন পুরীর জগন্নাথ

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

মন্দিরে কৃষ্ণবিরহ-ভাববিহ্বল অবস্থায় অতিবাহিত করেন। এ-সমস্তই তাঁহার জীবনের অন্ত্য-খণ্ডের অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ যে অভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের ঘটনাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুরূপ করিয়া আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নিমাইয়ের শৈশব-লীলা ও বাল্যক্রীড়ায় এবং ভগবতবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁহার গ্রন্থের সূচনায় তিনি গীতা হইতে পরমেশ্বরের মর্ত্যে অবতরণ-বিষয়ক "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি" প্রভৃতি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, —কলিকালে হরিনাম-প্রচার করিবার জন্য এই চৈতন্যাবতার।—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

কিন্তু বাল্যের পর ছাত্রজীবন হইতে শেষজীবন অবধি চৈতন্য-চরিতের উপর ভাগবতের প্রভাব আর বড় বেশী পড়ে নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কোন ঘটনায় অলৌকিকতা আরোপিত হইলেও, তাঁহার জীবনের বাস্তবতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ঐশ্বরিক মহিমা দেখাইতে না পারিলে, কোন মহামানবকেই সর্বসাধারণ দেবতা বলিয়া স্বীকার করে না। তাই তিনি সুযোগমত চৈতন্যের ক্রিয়াকলাপে দেবালীলার সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রক্ষেপ ধরা পড়িবার আশঙ্কায় একাধিক স্থানে তিনি পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

এসব বচনে যার নাস্তিক প্রতীত।
সত্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা ও চন্দ্রগ্রহণ দুই-ই একসঙ্গে পড়ে। হিন্দুদের নিকট দিনটি পরম শুভ। নবদ্বীপবাসী হিন্দুরা সেদিন দলে দলে গঙ্গাস্নানে যায়, তাহাদের মুখে অবিরাম হরিনাম উচ্চারিত হয় এবং আবাল-বৃদ্ধ-নর-নারী সকলেই চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া হরিনাম-সংকীর্তন করে,—নবদ্বীপের দশদিক হরি-ধ্বনিতে মুখরিত হয়। এইরূপ শুভক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হন। সেই নবজাত শিশুর অপূর্ব দেহকান্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাধারণ লক্ষণাদি দেখিয়া শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য করেন এবং তাঁহার নাম রাখেন 'বিশ্বম্ভর'। কিন্তু প্রতিবেশিনী মহিলারা তাঁহাকে 'নিমাই' নামে

অভিহিত করে। নিমাইয়ের শৈশবলীলা দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা দিন দিন বিস্ময়াভিভূত হইতে থাকেন। ক্ষুদ্র শিশু শয্যায় শুইয়া হাত-পা নাড়িয়া ক্রীড়ারত, কিন্তু গৃহতলে ভগ্ন ভাণ্ডের সহিত দধি-দুগ্ধ-ঘৃত প্রভৃতি নানাদ্রব্য চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত,—ইহা দেখিয়া তাঁহারা অপার রহস্যে নিমগ্ন হন। শিশুটি কখন কখন অবিরাম রোদন করে, তখন কোন উপায়েই তাহাকে শান্ত করা যায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য। হরিনাম-কীর্ত্তন শুনিলেই সে নীরব হয় ও সুমধুর হাসি হাসে।—

প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরি-সংকীর্ত্তন॥

... .

হরি বলি নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী॥

বৃন্দাবনদাসের মতানুসারে হরিনাম প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। তাই শৈশবকাল হইতেই গৌরাঙ্গের স্বভাবে হরিনামের প্রতি প্রবল অনুরাগের বিকাশ দেখাইতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্তের করচায় উল্লেখিত হইয়াছে, গয়াগমনের পূর্বে গৌরাঙ্গের চিত্তে কোনদিন হরিভক্তির উদয় হয় নাই, বরং তৎকালে তিনি বৈষ্ণবদের ঘোর উপহাস করিতেন। যাহা হউক, কালক্রমে বালক নিমাই দুই মৃণালবাহু ও কোমল চরণে ভর দিয়া শচীমাতার সারা আঙ্গিনায় নন্দদুলালের মত পরমানন্দে ছুটা-ছুটি করে, সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই ধরিয়া ফেলে, কোন কিছুতেই ভয় পায় না।—

জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাই ধরে॥
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া॥

এই সর্পকাহিনী শুনিয়া বিষ্ণুর অনন্তনাগশয্যায় শয়ন কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কালীয় সর্প-শিরে নৃত্যের কথা মনে পড়ে। বৃন্দাবনের দুরন্ত কানুর মত নিমাইও প্রতিবেশীর গৃহ হইতে ননীমাখন চুরি করিয়া খায়।—

কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥

একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। যথাকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি সযত্নে নানাদ্রব্য রন্ধন করেন ও উহার দ্বারা নৈবেদ্য সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানে বসেন। তন্মুহূর্তে কোথা হইতে চঞ্চল নিমাই তাঁহার সম্মুখে ছুটিয়া আসে।—

ধুলায় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখি বিপ্রবরে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্যলীলায় অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। একদিন মহামুনি গর্গদেব নন্দের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার আহার্য অন্নব্যঞ্জন তিনি শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিলে, বালক কৃষ্ণ অতর্কিতে আসিয়া উহা উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলে। লীলাচঞ্চল নন্দদুলালের গোপীবৃন্দ সহ যমুনায় জলকেলি ও শচীনন্দন নিমাইয়ের সখাবৃন্দ লইয়া গঙ্গাস্নানে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার দুরন্তপনায় গঙ্গাঘাটের সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। কেহ চক্ষু বুজিয়া শিবের মন্ত্র জপ করে, তিনি তাহার সম্মুখস্থ শিবলিঙ্গটি লইয়া পলায়ন করেন, বালিকারা দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গেলে, তিনি তাহাদের হাত হইতে তাহা কাড়িয়া নেন, এমন কি, কোন কোন স্নানরতা রমণীর অঙ্গ হইতে তিনি বসনও হরণ করেন। তাহারা অতিশয় রাগান্বিত হইয়া শচীদেবীর গৃহে আসিয়া নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়—

পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥
... .

নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥

কিন্তু এই চপল-প্রকৃতির বালকটি যেদিন পুরন্দর মিশ্রের নিকট হাতে-খড়ি নেন, সেদিন হইতে লেখাপড়ায় তাঁহার অখণ্ড মনোযোগ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়।—

খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
'একবার যে সূত্র প্রভু পড়িয়া যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥

এই ছাত্রজীবন হইতে তাঁহার পরবর্তী চরিত্র বৃন্দাবনদাস যথাসম্ভব বাস্তবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন :—শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য ছাড়িয়া তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিস্ফুট হইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করেন। বিশ্বরূপ যথারীতি পড়াশুনা করিয়া পরম পণ্ডিত হইয়া উঠেন। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় এই সুগভীর পাণ্ডিত্য তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ অহঙ্কারের সৃষ্টি না করিয়া, উঁহাকে ঈশ্বরভক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। তিনি সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইবার নির্দেশ দেখিতে পান ; তাই তিনি একমাত্র ঈশ্বরভক্তির দ্বারা যাবতীয় ধর্ম-গ্রন্থের ব্যাখ্যান করেন। কিন্তু নবদ্বীপের কাহারো মনে ভক্তিভাব নাই, কেহই কখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে না। একমাত্র অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে কতিপয় বৈষ্ণব একত্র হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করেন। তিনি প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া এখানে আসেন ও এই ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসভায় শ্রীকৃষ্ণমহিমা আলোচনা করেন। একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিমাই জননীর আজ্ঞায় তাঁহাকে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিতে সেখানে আসেন। এই বালকের মনোহর রূপ ও অনুপম লাবণ্যজ্যোতিঃ দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য বিমুগ্ধ হন ও তাঁহার অন্তরে সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে—"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।" বিশ্বরূপও সাধারণ যুবকের মত নন ; সংসারের প্রতি একেবারে উদাসীন ; সর্বদা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ বৈরাগ্যভাব লক্ষ্য করিয়া জগন্নাথ মিশ্র যথাশীঘ্র তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু বিশ্বরূপ সংসার-বন্ধন

এড়াইয়া সহসা সন্ন্যাসী হইয়া চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হন। ইহাতে জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগে ও তাঁহার মনে সংশয় জাগে—মানুষ বেশী বিদ্বান হইলে সংসার-বিরাগী হয়। তাই নিমাইয়ের প্রবল বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আশঙ্কা হয়—

এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিব পয়ান॥
… … …
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥

কিন্তু পড়াশুনা বন্ধ হওয়ায় নিমাইয়ের অত্যাচার বড়ই বাড়িয়া যায়; দিবারাত্র বন্ধুদের লইয়া ক্রীড়ামোদে মত্ত; কাহারো কথায় কর্ণপাত করেন না। একদিন তিনি বাড়ীর এক অশুচি স্থানে এক পরিত্যক্ত ভাতের-হাঁড়ীর উপরে আসন করিয়া বসেন। শচীদেবী ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করিবার জন্য অনুরোধ করেন; এবং তাঁহার শুচি-অশুচি-বোধ নাই বলিয়া তাঁহাকে কঠোর তিরস্কার করেন। তাহাতে তিনি মনের ক্ষোভে প্রত্যুত্তর দেন—

…তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে॥

তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও প্রবল বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাইয়া জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাকে পুনরায় সুবিখ্যাত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দেন। মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী; কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নন;—তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কে সকল মেধাবী পড়ুয়াই পরাজিত হন। কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে, তাঁহাকে তিনি "ফাঁকি" জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়া ফেলেন ও তাঁহাকে তীব্র উপহাস করিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু মুরারিগুপ্তকে অপদস্থ করিতে তিনি বড়ই আমোদ বোধ করেন।—

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিয়া রোগী কর দড়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই তাঁহার পুণ্যবান পিতা জগন্নাথ মিশ্র পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার লেখাপড়ার কোনই ব্যাঘাত জন্মায় নাই; শিষ্যসেবকেরা যাহা দেয়, তাহা দিয়াই অনাথা শচীদেবী কোনরূপে সংসার-নির্বাহ করেন। তিনি যথাকালে বিদ্যাধ্যয়ন সমাপন করিয়া, ধনাঢ্য মুকুন্দ সঞ্জয়ের আলযে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে শুরু করেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম জ্ঞান ও অপূর্ব শিক্ষাদান-কৌশলের প্রভাবে শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করে। ক্রমে তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেই সদ্যবিধবা শচীদেবী নিদারুণ পতিশোক অপনোদন করিবার মানসে পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। বল্লভ আচার্যের পরমা সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহাব বিবাহ মহাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয়। এইস্থানে বৃন্দাবন-দাস নববিবাহিত নিমাই পণ্ডিতের একটি মনোহর চিত্র সুচারুরূপে অঙ্কন করিয়াছেন।—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী রূপ মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
অধরে তাম্বুল দিব্য বাস পরিধান॥
সর্ব্বদায় পরিহাস মূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমে নবদ্বীপ-পতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥

তাঁহার জ্ঞানোজ্জ্বল যৌবনশ্রী দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ, কিন্তু বৈষ্ণবেরা তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণভক্তি দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিমর্ষ হয়।—

হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কালবশ॥

নবদ্বীপ-চূড়ামণি তখন বিদ্যানন্দে তঃ সতত উৎফুল্ল; নিজের অপরাজেয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট; পথিমধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাইলে ন্যায়ের ফাঁকি ব্যাখ্যা করিতে বলেন।—

যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে॥

একদিন মুকুন্দপণ্ডিত তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ভিন্নপথে পলাইয়া যান। মুকুন্দ অতিশয় কৃষ্ণভক্ত; অদ্বৈতপ্রভুর সভায় সুমধুর কীর্তন করিয়া সকলকেই বিমুগ্ধ করেন; কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা শুনিতে ভালবাসেন না। কিন্তু তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম নাই,—তিনি শুধু "পাঁজি বৃত্তিটীকার" ব্যাখ্যান লইয়াই প্রমত্ত। তাই মুকুন্দ তাঁহার সঙ্গ বিরক্ত বোধ করেন। মুকুন্দের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হন, এবং তিনিও শীঘ্র পরম বৈষ্ণব হইবেন বলিয়া সংকল্প করেন।—

এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভজ আসিবেক আমার দুয়ারে॥

এই সময় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণোপাসক ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আগমন করেন। একদিন দৈবযোগে তাঁহার সহিত নিমাইপণ্ডিতের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার ভক্তিমধুর বিনয়নম্র আচরণে গৌরাঙ্গদেব অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। তদবধি তাঁহার মনে বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের উদয় হয়, এবং গদাধর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণবদের সহিত সম্মিলিত হন। অতঃপর একদিন মুকুন্দ সঞ্জয়ের টোলে শিষ্যবৃন্দের সম্মুখে শাস্ত্রীয় সূত্রের ব্যাখ্যান, খণ্ডন, স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে তিনি সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, তাঁহার সর্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে থাকে, তিনি বারবার বজ্রকণ্ঠে হুংকার করিয়া উঠেন—

… … মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধর মোর নাম বিশ্বম্ভর॥

কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার এই দৈববিকার [বা সোঽহং ভাব] বুঝিতে না পারিয়া, ইহাকে বায়ুরোগ বলিয়া মনে করে ও তাঁহার শিরে বিষ্ণু-তৈলাদি মর্দন করিতে থাকে। যাহা হউক, এতদিন পরে চৈতন্যদেব বায়ুরোগের ছল করিয়া তাঁহার দেবত্ব এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্র আত্ম-সংবরণ করেন ও পুনরায় যথারীতি অধ্যাপনাদি কার্যে ব্রতী হন। এই সময়ে এক মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসেন, কিন্তু নিমাইপণ্ডিতের নিকট তাঁহার পাণ্ডিত্যের দম্ভ বিচূর্ণ হইয়া যায়। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শিষ্যবর্গ-সহ পূর্ববঙ্গভ্রমণে বহির্গত হন ও তথায় বহুস্থানে বহুশিষ্যকে অমূল্য বিদ্যাদান

করিয়া সগৌরবে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইত্যবসরে তাঁহার অনুপস্থিত কালে লক্ষ্মীদেবীর সহসা গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। তখন তিনি নবদ্বীপবাসী সনাতন পণ্ডিতের সুশীলা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিয়ৎকাল পরে তিনি গয়াতীর্থে গমন করেন ও তথায় বামনাবতার শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদচিহ্ন দর্শন করিয়া স্বয়ং পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়েন।—

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
… … … …
চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণদর্শনে॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥

সৌভাগ্যক্রমে সেইক্ষণে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সেখানে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার কৃপায় তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। গুরু-প্রদত্ত দশাক্ষর মন্ত্র জপিতে জপিতে তিনি নদীয়ার পথে ফিরিয়া যান, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারেন না।—

পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে॥

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের আর সাংসারিক

কর্মে বা টোলের অধ্যাপনায় মন বসে না। গয়াতীর্থে যে অলৌকিক ঈশ্বরানুভূতি তিনি লাভ করেন, তাহাই নিভৃতে বসিয়া ভাবেন ও অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করেন।—

পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥

সরলা জননী শচীদেবী তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্রের এই প্রকার ভাবান্তর বুঝিতে না পারিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন ও তাঁহার মঙ্গলার্থে গঙ্গা-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করেন। কিন্তু দিব্যভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর তাহাতে কোনই পরিবর্তন হয় না;—এখন হইতে তাঁহার জীবনের মধ্যখণ্ডের সূচনা হয়, এখন হইতে তিনি সকল বিষয়েই সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দেখিতে পান।—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকল হরিনাম॥
... .
শুন ভাইসব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন॥
... ...
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে॥
... ...
যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যাবসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥

কালক্রমে মহাপ্রভু আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারেন না। একদিন তিনি ঐশ্বরিকভাবে আবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্যের আলয়ে আগমন করেন ও 'হরি-হরি' বলিয়া "মহামত্ত সিংহের" ন্যায় গর্জন করিতে থাকেন। যাঁহার আবির্ভাবের নিমিত্ত অদ্বৈতপ্রভু এতকাল গঙ্গা-তুলসী দিয়া ব্যাকুল প্রাণে পূজা করিয়াছেন, তিনিই আজ তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইয়াছেন, তাহা তিনি

নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার ইষ্ট দেবতার যাবতীয় পূজার সামগ্রী আনিয়া শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম পূজা করেন।

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করি॥

তথাহি

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায গোব্রাহ্মণহিতায চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অনন্তর তিনি সবেগে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহাভিমুখে ধাবিত হন ও তাঁহার নৃসিংহ-মন্দিরের দ্বার পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পূজারত পণ্ডিতের সম্মুখে গর্জন করিয়া উঠেন—

মুঞি সেই মুঞি সেই.........
যাহারে পূজহ তারে দেখ বিদ্যমান।

ধ্যানভগ্ন শ্রীবাস আতঙ্কিতভাবে নয়ন উন্মীলন করিয়া সবিস্ময়ে দেখেন—

বীবাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধর॥

শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং পরমেশ্বরের রূপে দেখিয়া ঈশ্বরভক্ত শ্রীবাসের সর্বাঙ্গ অপার আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে; তিনি তখন মহোল্লাসে সপরিবারে ধূপ-দীপ-পুষ্পের দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণযুগল অর্চনা করেন। প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর তাঁহাকে বন্ধুবান্ধবসহ নির্ভয়ে হরিনাম-সংকীর্তন করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে যদি দেশের যবন রাজা, বা নবদ্বীপের কাজি সাহেব, বা অন্য কেহ প্রতিবন্ধকতা করে, তবে তিনি প্রেমভক্তির দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিবেন—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের নাম গাহিয়া সকলকেই অশ্রুজলে ভাসাইবেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার উদ্দেশ্যে তখনই তিনি শ্রীবাসের ভ্রাতষ্পুত্রী নারায়ণীকে কৃষ্ণনাম বলিতে বলেন।—

চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত॥

অতঃপর তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগকে লইয়া হরিনাম-সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হন; তাঁহার অভয় সাহচর্য লাভ করিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তন করে ;— এই কীর্তনের আনন্দ লইয়াই তিনি এখন সর্বদা প্রমত্ত। কীর্তনের সময় তিনি কখন অবিরাম হাসিতে থাকেন, কখন কাঁদিতে কাঁদিতে অবিরল অশ্রুধারার দ্বারা ধরাতল প্লাবিত করেন, কখন বা দৈবভাবে উন্মত্ত হইয়া নানা দেবতার মূর্তি ধারণ করেন। একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনিয়া তিনি হুংকার করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের পূজামণ্ডপে প্রবেশ করেন ও তাঁহাকে বরাহমূর্তি দেখান। এইরূপে তিনি অচিরে সাধারণ মানুষের অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অসাধারণ দিব্যভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। তাঁহার নিবিড় ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণবভক্তেরা দলে দলে নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত নাম-কীর্তনে যোগদান করেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ, হরিদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবেরাও আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন।—

ছাড়ি ধন পুত্র সর্ব্ব ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥

শ্রীচৈতন্যের হরিনাম-প্রচারের সর্বপ্রধান সহায় ছিলেন নিত্যানন্দ। গৌরাঙ্গ যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, নিত্যানন্দ তেমনি বলরামের অবতার বলিয়া গণ্য। এই হেতু 'গৌর-নিতাই'—যুগল মূর্তির পূজা বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত হয়। গৌরাঙ্গের জন্মের কতিপয় বৎসর পূর্বে, রাঢ়ের অন্তর্গত একচাকা-নামক গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার সহচরদের লইয়া তিনি পুতনা-বধ, যমুনা-বিহার, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি কৃষ্ণ-লীলা খেলা করিতেন। তাঁহার পিতা হাড়ো ওঝা ও মাতা পদ্মাবতী—উভয়েই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি যখন বার বৎসরের বালক, তখন এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী ওঝার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার তীর্থ-পর্যটনের সাথী হইবার জন্য নিত্যানন্দকে তিনি ওঝার নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সদাশয় সন্ন্যাসীর সহিত ভক্তিভাব-প্রবণ নবীন নিত্যানন্দ সুদীর্ঘ বিশ বৎসর গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি যখন

বৃন্দাবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতার রূপে প্রকট হন,—এবং তিনিও নদীয়ায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

শ্রীচৈতন্যের একজন পরম ভক্ত ছিলেন যবন-হরিদাস। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শুদ্ধাচারী ও নির্মল-চরিত্র। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষবার কৃষ্ণ-নাম জপ করিতেন। কিন্তু নিজের জাতীয় ধর্ম ত্যাগ করার জন্য যবন রাজা ও মুসলমান কাজীরা তাঁহার উপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে—তাঁহাকে একে একে বাবটা বাজারে লইয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গে প্রকাশ্যভাবে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করে,—তাহাতে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেও তাঁহার মুখ হইতে হরিনাম কেহই দূর করিতে পারে নাই। তাঁহার এই প্রকার অসীম সহ্য-শক্তি দেখিয়া যবনেরা অবশেষে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেয়। তিনিও নিজের জন্মভূমি যশোহরের বূঢ়ণ-গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া যান ও তথায় পরম কৃষ্ণভক্ত অদ্বৈতপ্রভুর সহিত হরিনাম-কীর্তন করিয়া নিশিদিন যাপন করেন। গৌরাঙ্গদেবের দৈবীভাবের উন্মেষ হইলে, তিনি তাঁহার সহিত গিয়া সম্মিলিত হন।

এইরূপে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চল হইতে বহু বৈষ্ণবভক্ত ক্রমাগত নদীয়ায় আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইতে থাকেন। তখন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, জগদানন্দ, বাসুদেব, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীধর, পুরুষোত্তম প্রভৃতি শত শত সাধুব্যক্তির সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ঐশ্বর্য-ভাব-বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর পরমোল্লাসে সর্বক্ষণ হরিনাম-সংকীর্তনে নিমগ্ন হন। কিন্তু তখনও নদীয়ার জনসাধারণ নিমাইপণ্ডিতের মাহাত্ম্য জ্ঞাত হয় নাই,—কীর্তনের মহিমা বুঝিতে পারে নাই। তাই গৌরাঙ্গদেব তাহাদের দ্বারা ব্যাহত হইবার আশঙ্কায় শ্রীবাসপণ্ডিতের সুরক্ষিত গৃহাঙ্গনে তাঁহার ভক্তবৃন্দসহ রাত্রিকালে হরিনাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেন। সেই সুবিশাল ভবনের সুদৃঢ় প্রাচীর-দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা মহানন্দে সংকীর্তন জুড়িয়া দেন। তাঁহাদের দলের লোক ছাড়া আর কাহারও তথায় প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের খোল-মৃদঙ্গ-করতালের উচ্চ-রোল, তাঁহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের গগনভেদী হরি-বোল ও তাঁহাদের ভাবোন্মত্ত নৃত্যের গুরুপদধ্বনিতে প্রতিবেশীরা রজনীকালে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের

নৃত্য-গীতের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করিতে থাকে। ধূর্ত বৈষ্ণবেরা রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে শ্রীবাসের প্রাচীরের অন্তরালে সমবেত হইয়া সুন্দরী নারী ও প্রচুর মদ লইয়া অদ্ভুত বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ত হয়,—এইরূপ গুজব অনেকেই রটাইতে থাকে। নিমাইপণ্ডিতের মত পরমজ্ঞানী ব্যক্তিও যে এই সমস্ত ভাব-বিকার-গ্রস্ত উন্মত্ত বৈষ্ণবদলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন,—ইহাতে অনেকেই ক্ষোভ করে—

পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এগুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥
.. ..
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে॥

দেখিতে দেখিতে গৌরাঙ্গ-দলের বিরুদ্ধে একটা বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দল বাড়িয়া উঠে। কিন্তু মহাপ্রভু বা তাঁহার দলের কাহারও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। গৌররূপী স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় ভক্তদের লইয়া প্রতি রাত্রেই শ্রীবাসের অঙ্গনে মহানন্দে কীর্তন করিতে থাকেন। একদিন তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে তদগতপ্রাণ বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন। পবিত্র গঙ্গানদী হইতে সহস্র সহস্র ঘট সুশীতল জল আনিয়া তাঁহারা গৌর সুন্দরের উন্নত মস্তকে মহানন্দে ঢালেন, অদ্বৈতাদি প্রধান বৈষ্ণবেরা অভিষেক-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্নান করাইতে থাকেন, মুকুন্দাদি গায়কবৃন্দ আনন্দপ্লুত কণ্ঠে মঙ্গল-গীত গাহেন; পতিব্রতা কুলবধূগণ পুলকিতচিত্তে জয়-জয় ধ্বনি দেন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মার্জন করিয়া তাঁহাকে নূতন বসন পরাইয়া দেন. তাঁহার পবিত্রদেহে সুগন্ধি চন্দন লেপন করেন ও বিষ্ণু-খট্টা পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি তাঁহাকে সশ্রদ্ধভাবে উপবেশন করান। নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকের উপরে ছত্র ধরেন ও কোন ভাগ্যবন্ত চামর ঢুলান এবং অপর ভক্তেরা পাদ্য-অর্ঘ্য, পুষ্প-পত্র, প্রদীপ-নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া পরমভক্তির সহিত তাঁহার শ্রীচরণ-কমল পূজা করেন। অতঃপর ভক্তবৃন্দ একে একে তাঁহাকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিবার জন্য নিবেদন করিতে থাকেন। কী আশ্চর্য! তিনিও সানন্দে সেই পর্বত-প্রমাণ আহার্য সামগ্রী নিঃশেষে ভোজন করিয়া ফেলেন—

সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ॥
কতেক বা সন্দেশ কতেক ফলমূল।
কতেক সহস্র বাটী কর্পূর তাম্বুল॥
কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমতে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥

এইরূপ অপূর্ব লীলা-সহকারে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে হইতে সুদীর্ঘ দিবাবসান হইয়া সন্ধ্যাকাল সমাগত হয়। তখন ভক্তবৃন্দ ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া ও শঙ্খ-মৃদঙ্গ বাজাইয়া তাঁহার অর্চনা করিতে থাকেন। তৎপর তিনি একে একে "খোলা-বেচা" শ্রীধর, অদ্বৈত, মুরারি, হরিদাস, মুকুন্দ ও শ্রীবাসকে তাঁহার সন্নিকটে আসিতে বলেন এবং তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করিয়া দেন;—উহার সর্বশেষ অংশটুকু পান বালিকা নারায়ণী। এই সৌভাগ্যের ফলে বৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী দেবী অদ্যাপি বৈষ্ণবসমাজে পূজিতা হইতেছেন।

অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করেন, তাঁহারা উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে বাহির হইয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিবেন ও সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের কার্যের ফলাফল তাঁহাকে জানাইবেন। তাঁহার আজ্ঞামত তাঁহারা উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া বহু গৃহস্থের বাড়ীতে যান ও সুমধুর সুরে কৃষ্ণনাম গাহিতে গাহিতে তাহাদিগকেও কৃষ্ণনাম লইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করেন।—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥

সুজন লোকেরা তাঁহাদের ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ হইয়া গদ্গদকণ্ঠে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদের গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। একদিন দৈবক্রমে ইতিহাস-বিখ্যাত পরম দুর্দান্ত জগাই ও মাধাইয়ের সন্নিকটে

তাঁহারা কৃষ্ণনাম গাহিতে যান। পাপিষ্ঠদ্বয় তখন প্রচুর মদ্য পান করিয়া প্রচণ্ড নেশায় ঝিমাইতেছে। কীর্তনের শব্দে তাহাদের সেই নেশার আবেশ বিনষ্ট হওয়ায় তাহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীদ্বয়কে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। তখন হরিদাস নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া অন্তর্ধান হন। কিন্তু তাঁহাদের নাগাল না পাইয়া মদ্যপদ্বয় ঘোরতর রুষ্ট হয় ও তাঁহাদের শাস্তি দিবার নিমিত্ত সুযোগ খুঁজিতে থাকে। একদিন রাত্রিতে মহাপ্রভুর বাড়ীতে যাইবার পথে নিত্যানন্দকে তাহারা ধরিয়া ফেলে ও মাধাই তাহার হাতের শূন্য মদের কলস দিয়া তাঁহার মস্তকে সজোরে আঘাত করে। ভগ্ন কলসের তীক্ষ্ণ খণ্ডগুলি তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া পড়ে ও ক্ষতস্থানসমূহ হইতে উৎস-ধারায় শোণিত-প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে। এই সকরুণ দৃশ্য দেখিয়া পাষণ্ড জগাইয়ের হৃদয় বিগলিত হয় ও তাহার সহচরকে এই নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু ততক্ষণে মহাপ্রভু লোক-মুখে এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া, "চক্র, চক্র" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অগ্নিমূর্তিতে তথায় উপস্থিত হন; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর সুদর্শন চক্রও গগনভেদী গর্জন করিতে করিতে সেইদিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে। ইহা দেখিয়া কোমলহৃদয় নিত্যানন্দ সবিনয়ে মহাপ্রভুকে নিরস্ত করেন। তাঁহার এই প্রকার উদারতা দর্শন করিয়া পাপাত্মা মদ্যপদ্বয়ের দুর্মতি দূর হইয়া যায়, তাহারা অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাঁহারাও তাহাদের দুইজনকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুমধুর হরিনাম দান করেন। তদবধি জগাই-মাধাই গৌর-নিতাইয়ের পরম ভক্ত হইয়া উঠে ও কালক্রমে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজে চিরস্থায়ী সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে মহাপ্রভুর মহিমা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। একদিন নিশাকালে তিনি ভক্তবৃন্দসহ আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্বৈত—বিদূষক, শ্রীবাস—নারদ, নিত্যানন্দ—বড়াই এবং গৌরাঙ্গ—রুক্মিণী ও রাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই অভিনয় এত সুন্দর ও মনোহর হয় যে, রাত্রি কোথায় দিয়া অবসান হইয়া যায় তাহা কেহই টের পায় না।—

> পোহাইল নিশি সবে কাঁদে উভরায়।
> কোটি পুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নয়॥

জগাই-মাধাইয়ের মত অবৈষ্ণব নদীয়াবাসীরাও এক্ষণে দলে দলে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে গমন করে। তাহাদের প্রত্যেককেই তিনি কৃষ্ণনাম জপ করিতে বলেন। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বৈরাগ্য প্রভৃতির কোনই প্রয়োজন নাই ;—একান্তমনে কৃষ্ণনাম জপ করিলেই, অথবা কতিপয় ভক্ত একত্র হইয়া খোল-করতাল বাজাইয়া—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্রটি সানন্দে কীর্তন করিলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি সর্ববিধ সিদ্ধিলাভ হয়। তখন নদীয়া-নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিনাম-সংকীর্তনের ধূম পড়িয়া যায়। এই সময়ে একদিন নবদ্বীপের কাজী-সাহেব নগর-পরিদর্শন-কালে বহুস্থানে বহু লোককে বাদ্যধ্বনি সহকারে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-সংকীর্তন করিতে দেখিতে পান। মুসলমানের অধিকৃত রাজ্যে এই প্রকার "হিন্দুয়ানি"র প্রাবল্য দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কীর্তনীয়াদের যাহাকে যাহাকে তিনি হাতের কাছে পান, তাহাদের পৃষ্ঠে কিল-চাপড় মারেন ও খোল-মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় উত্তেজিত হন ও পরদিবস সদলবলে নগর-সংকীর্তনে বাহির হইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন ;—কে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে সাহস করে, তাহা তিনি দেখিয়া লইবেন।—

সঙ্কীর্তন আরম্ভে আমার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥

পরদিবস প্রভাত হইতে না হইতেই নগরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক আসিয়া মহাপ্রভুর বাসভবনের চতুর্দিকে সমবেত হয়। তাঁহার দেবত্বপ্রকাশের কথা অনেকে শুনিয়া থাকিলেও, তাঁহার পবিত্র দর্শনলাভ অনেকেরই ভাগ্যে তখনও ঘটে নাই। কাজেই কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াও বহু লোক তাঁহার এই নগর-সংকীর্তনে যোগদান করে। নদীয়ার পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য, প্রতি গৃহের দ্বারদেশ মঙ্গল-কলস-সহ কদলীবৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত, গৃহের অলিন্দপুঞ্জ অসংখ্য অন্তঃপুরচারিণীর আনন্দ-কলরবে মুখরিত, ও ভক্তিভাব-বিহ্বল বিশাল জনতার মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে অনন্ত

গগনমণ্ডল প্রকম্পিত হইতে থাকে। মহাপ্রভুর গৃহাঙ্গনে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের প্রাণের দেবতা গৌর-সুন্দরকে ঘিরিয়া সংকীর্তন জুড়িয়া দেন। সেই সুমধুর কীর্তনে সকলেই অতীব উৎফুল্ল হইয়া উঠে;—দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়া গোধূলি-সময় সমাগত হয়। তখন ঈশ্বরাবতার শ্রীচৈতন্যদেব অসংখ্য ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া ললিত-ভঙ্গিমায় মনোহর নৃত্য করিতে করিতে নগর-সংকীর্তনে বাহির হন। তাঁহার চতুর্দিকে কোটি কোটি লোক সোল্লাসে হরিধ্বনি করিতে থাকে; লক্ষ লক্ষ লোক প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার গমন-পথ আলোকিত করে; প্রতি গৃহের সম্মুখে সহস্র সহস্র দীপশিখা নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভা বিস্তার করে। কীর্তনের দল অগ্রসর হইতে থাকিলে উহার উভয় পার্শ্ববর্তী বিশাল ভবনশ্রেণীর গবাক্ষসমূহ হইতে রাশি রাশি খই-কড়ি বর্ষিত হয়।

ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে হরি বলি সর্ব্ব লোকে ধায়॥

গঙ্গানদীর তীরে তীরে সেই সুবিশাল সংকীর্তনের দল মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোনার ঘাট প্রভৃতি একে একে অতিক্রম করিয়া ক্রমে কাজীর বাড়ীর পথ ধরে। দুর্দান্ত কাজীসাহেব দূর হইতে গৌরাঙ্গদেবের চতুর্দিকে এইরূপ বিপুল জনতার সমাবেশ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য সমগ্র নদীয়া-নগরের অপূর্ব উৎসব-সজ্জা দেখিয়া, অতিশয় বিস্মিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন।—

এই মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে॥

তিনি তন্মুহূর্তে তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া গৃহের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করেন। তখন সেই উত্তেজনাপূর্ণ জনসমুদ্র তাঁহার শূন্য বাসভবন লণ্ডভণ্ড করিয়া, শঙ্খবণিক-নগরের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর নদীয়া-নগরে বৈষ্ণব-দিগের সংকীর্তনে আর কেহই বাধা প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য এইরূপে নবদ্বীপের সর্বত্র হরিনাম-কীর্তন-প্রথা প্রচলিত করেন। অতঃপর, নদীয়ার বাহিরে—সমগ্র ভারতবর্ষে এই হরিনাম-মহামন্ত্র প্রচার করিতে তিনি সংকল্প করেন ও তদুদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করেন; ভক্তবৃন্দকে কিছুই জানিতে দেন না।

সৌভাগ্যশালী শ্রীবাসপণ্ডিতের সুবিশাল অন্তঃপুরে তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্তবৃন্দ লইয়া দিবানিশি হরিনাম-কীর্তনে মগ্ন রহেন। একদিন গভীর নিশীথে একটি গৃহকক্ষ হইতে শোকার্ত রমণীর সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনি নিঃসৃত হইয়া তাঁহাদের কীর্তনের ব্যাঘাত ঘটায়। মহাপ্রভু অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, শ্রীবাসের একটি অসুস্থ পুত্রের তখন মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার কীর্তনের আনন্দ ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়—এই দুঃসংবাদ তাঁহাকে শ্রীবাস জানিতে দেন নাই। তাঁহার প্রতি শ্রীবাসের এইরূপ প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় পাইয়া, তিনি সহসা বিচ্ছেদ-বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন।—

পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥

তাঁহার এই বাক্যে ভক্তবৃন্দও, তাঁহার সন্ন্যাস লইবার সংকল্পের আভাস পাইয়া, অতিশয় শোকার্ত হন। অতঃপর তিনি আর বেশীদিন গৃহবাস করেন নাই;—একদিন রাত্রিশেষে বৃদ্ধা জননী ও তরুণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি সংগোপনে নদীয়া ছাড়িয়া সংসারের বাহিরে চলিয়া যান।

গৌতম বুদ্ধের ন্যায় সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, বরং সংসারী-লোকের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি সন্ন্যাসী হন। গৃহবাসী সাধু অপেক্ষা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি জনসাধারণের সমধিক শ্রদ্ধা; সন্ন্যাসীর বাক্যে তাহাদের যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, অপর কাহারও কথায় সেরূপ নহে। তিনি গৃহবাসী বলিয়াই তাঁহার ধর্মোপদেশ কেহ কেহ অগ্রাহ্য করে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহার ধর্ম সকলেই ভক্তিভাবে গ্রহণ করিবে।—

সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব লোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার॥

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার অন্তরের এই সংগুপ্ত সংকল্প তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ক্রমে সেই সংবাদ পুত্রপ্রাণা শচীমাতার কর্ণে গিয়া প্রবেশ করে। এই নিদারুণ সংবাদের বজ্রাঘাতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতে থাকে, তাঁর চক্ষে সমস্ত বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হইয়া যায়। যে-গৌরসুন্দরের মুখচন্দ্র দেখিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের

সন্ন্যাস লইয়া অন্তর্ধান ও দেবতুল্য স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের অকালে পরলোক-গমনের মর্মান্তিক বেদনা বিস্মৃত হইয়া বাঁচিয়া আছেন, সেই প্রাণস্বরূপ পুত্রের বিরহ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মকথা প্রচার করিবার জন্যই যদি গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মাতৃ-ত্যাগের মত ঘোর অধর্ম করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন,—এই কথা বলিয়া তিনি প্রিয়পুত্রকে বারংবার অনুযোগ করেন।—

ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা এ কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥

কিন্তু স্নেহময়া জননীর অশ্রুধারা কিংবা প্রীতিপূর্ণ বন্ধুদিগের সকরুণ মিনতি—কোন কিছুতেই তিনি তাঁহার সংকল্প হইতে বিচলিত হন না। তাঁহাদিগকে তিনি স্পষ্টতঃ জানান—

এই সংক্রামণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা নামে গাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।

নির্দিষ্ট দিনে তাঁহার ভক্তবৃন্দসহ যথারীতি সংকীর্তন-রঙ্গে গভীর রজনী পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়া তিনি স্বগৃহে শয়ন করিতে যান। হরিদাস ও গদাধর তাঁহার সঙ্গে সেই গৃহে শয়ন করেন। সে-রাত্রে শচীদেবীর চক্ষে নিদ্রা আসে না,—তিনি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। "দণ্ড চারি রাত্রি" থাকিতে মহাপ্রভু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন,—গদাধর ও হরিদাসও তাঁহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হন। কিন্তু কাহাকেও তিনি সঙ্গে নেন না।—

প্রভু বলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্বরঙ্গ॥

গৃহদ্বারে রোরুদ্যমানা শচীদেবীকে দেখিয়া তিনি তাঁহার শ্রীচরণযুগলে প্রণত হন ও তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করেন। জননীর প্রাণান্ত সেবাযত্ন তিনি কোনদিন বিস্মৃত হইবেন না, তাঁহার প্রতি তিনি আমরণ কৃতজ্ঞ থাকিবেন, এবং নিকটে না থাকিলেও দুঃখিনী জননীর জীবন-ধারণের যাবতীয় ভার তিনি সর্বদা বহন করিবেন।—

ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥

অসহ্য পুত্রবিচ্ছেদ-বেদনায় বিবশা শচীমাতা তাঁহার কোন কথাই বুঝিতে পারেন না, তাঁহার কোন কথারই প্রতিবাদ করেন না,—সর্বংসহা জীবধাত্রী বসুন্ধরার ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহেন।—

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিলা সত্বরে॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা॥

সেই রাত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গানদী পাব হইয়া কণ্টক-নগরে নির্মলচরিত্র কেশবভারতীর ভবনে উপনীত হন ও পরদিবস সহস্র সহস্র নরনারীব সম্মুখে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। দীক্ষাকালে কেশবভারতী তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে অভিহিত করেন।—

যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
সর্ব্ব লোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য॥

এই অপূর্ব নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিনব মনোহর রূপ বৃন্দাবনদাস অল্প কথায় বড় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।—

পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্পসুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত।
দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেম-আনন্দে বিহ্বল॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন॥

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্তী দিবসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসের উদ্দেশ্যে পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন। কেশবভারতী, নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে যান। নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত চন্দ্রশেখর আচার্য নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বক্রেশ্বরের নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার সঙ্গীদলের চেষ্টায়, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তিনি তথা হইতে ফুলিয়া গ্রামে উপনীত হন। তথায় হরিভক্ত হরিদাসের কুটীরে এক দিবস কীর্তন-রঙ্গে অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা শান্তিপুরে শুদ্ধচিত্ত অদ্বৈতাচার্যের আশ্রমে গমন করেন। প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ নদীয়ায় গিয়া গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ-কাতরা শচীদেবী ও অপরাপর গৌরভক্তবৃন্দকে তথায় লইয়া আসেন। গৌরাঙ্গদেবের গৃহত্যাগের পর শোকাতুরা শচীদেবী দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত উপবাসী, এক্ষণে নয়ন-হারা পুত্ররত্নকে পুনরায় দর্শন করিয়া তিনি আশ্বস্ত হন। তাঁহার নিকট পুনরায় বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য এবার নীলাচল বা বর্তমান পুরী-তীর্থে গমন করেন।

গদাধর, গোবিন্দ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জগদানন্দ মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী হন। আঠিসারা, ছত্রভোগ, প্রয়াগ, জলেশ্বর, রেমুণা, জাজপুর, কটক, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি বহুস্থান একে একে পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে আঠারনালা-নামক একটি গ্রামে তাঁহারা উপনীত হন। সেস্থান হইতে নীলাচল-তীর্থের জগন্নাথ-মন্দিরের অত্যুচ্চ ধ্বজা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন ও সঙ্গীদলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে মন্দিরের দিকে ধাবিত হন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ-সুভদ্রা-বলরামের ত্রিমূর্তি দর্শন করিয়া তিনি প্রবল ভক্তিভাবে বিহ্বল হন ও ভয়ঙ্কর হুংকার দিয়া জগন্নাথকে ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত প্রচণ্ড লম্ফ দেন;—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া পার্বত্য নির্ঝরের ন্যায় অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হয়,—ভাবাতিশয্যে অচৈতন্য হইয়া মন্দিরের পাষাণ চত্বরে তিনি সজোরে পড়িয়া যান। পরম পবিত্র জগন্নাথ-বিগ্রহকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হওয়ায়, মন্দিরের প্রহরীবর্গ তাঁহাকে প্রহার করিতে আসে। সৌভাগ্যবশতঃ সুবিখ্যাত রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয় তখন তথায় উপস্থিত। মহাপ্রভুর অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তাঁহাকে প্রহার

করিতে প্রহরীদিগকে নিষেধ করেন। তিনি স্বয়ং সেই ভূলুণ্ঠিত সংজ্ঞাশূন্য নবীন সন্ন্যাসীকে সযত্নে সংরক্ষণ করেন, কিন্তু দীর্ঘকালেও সন্ন্যাসীবরের জ্ঞান-সঞ্চার হয় না দেখিয়া, তিনি প্রহরীদের সাহায্যে তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান। এমন সময়ে মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন।

বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগর-গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার ছাত্র-জীবন-কালে ন্যায়শাস্ত্র-পাঠের কেন্দ্রস্থল ছিল মিথিলা। এই ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার উদ্দেশ্যে তিনি মিথিলায় গমন করেন ও তথাকার টোলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের বৃহৎ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। তখন তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন টোল খুলিয়া সুগভীর পাণ্ডিত্যের সহিত ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অসীম বিদ্যাবুদ্ধিবলে নবদ্বীপ অচিরে সমগ্র ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্র-চর্চার নিমিত্ত সুবিখ্যাত হয়। তাঁহার প্রভূত সুখ্যাতির কথা শুনিয়া, তৎকালীন উড়িষ্যা-প্রদেশের স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপ রুদ্র গজপতি তাঁহাকে পরম সমাদরের সহিত রাজ-পণ্ডিতরূপে বরণ করেন ও নীলাচলে তাঁহার ন্যায়-পাঠের টোল খুলিয়া দেন। তদবধি তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন। ন্যায়শাস্ত্র ছাড়া বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র ও দণ্ডীদিগের উপযোগী অন্যান্য শাস্ত্রও তিনি পড়ান। তিনি পরম জ্ঞানী বলিয়া তৎকালে সমুদয় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই মহামহিম পণ্ডিত মহাশয় মহাপ্রভুকে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সুকঠোর সন্ন্যাস লইতে দেখিয়া অতিশয় করুণায় বিগলিত হন। এই পরম সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসী ধর্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শুধুমাত্র ভক্তিভাবের দ্বারা বিহ্বল হইয়া সহসা সংসার ত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন,—এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি তাঁহার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হন। তাঁহাকে যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান দান করিয়া ও তাঁহার মতিগতির পরিবর্তনসাধন করিয়া, তাঁহাকে মুক্তিলাভের সঠিক পথে পরিচালিত করিতে তিনি সংকল্প করেন। তাঁহার এই প্রকার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, শ্রীচৈতন্য একদিন তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত "আত্মারামাশ্চ······" প্রভৃতি শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা শুনিতে চাহেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার মানসে তিনি সেই শ্লোকটির ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন;—এতদ্ব্যতীত আর কোন প্রকারে ইহার

ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয় বলিয়া তিনি সাব্যস্ত করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব মৃদুহাস্য করিয়া সেই শ্লোকটির সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে আরো বহু প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা অপেক্ষা এই অনভিজ্ঞ নবীন সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা সমধিক বিশুদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ বুঝিতে পারিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হন,—তাঁহার নিকটে নিজেকে অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তখন মহাপ্রভু ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে ষড়্‌ভুজ মূর্তিতে প্রকট হন ও হুঙ্কার করিয়া বলেন,—

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুক্তি বহি নাহি আর॥

অতঃপর মহামান্য সার্বভৌম মহাশয় এই অপূর্ব তরুণ সন্ন্যাসীর শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার দেহ-মন সমস্তই সমর্পণ করেন,—তিনি মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠেন।

সার্বভৌমের মত মহাজ্ঞানী ধর্মশাস্ত্রবেত্তা তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলে, নীলাচলের সর্বসাধারণ তাঁহার শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করে ও দিবারাত্র তাঁহার সহিত হরিনাম-সংকীর্তনে প্রমত্ত হয়। তাঁহার অপূর্ব ভক্তিভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে "সচল জগন্নাথ" বলিয়া গণ্য করে,—বিশাল উড়িষ্যার বিপুল জনসাধারণ তাঁহাকে লইয়া ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হয়। তখন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী, দামোদর স্বরূপ, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, প্রেমানন্দ, রামানন্দ প্রভৃতি অপরাপর ভক্তবৃন্দ নানাস্থান হইতে নীলাচলে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন,—সমগ্র নীলাচলে অহোরাত্র অবিরাম কীর্তনের ধুম পড়িয়া যায়। কিন্তু উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র তখন স্বীয় রাজ্যে ছিলেন না,—তিনি বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিবশতঃ মহাপ্রভু এ-যাত্রায় বেশীদিন নীলাচলে থাকেন না,—কিছুকাল পরেই নিত্যানন্দ-গদাধর প্রভৃতির সহিত গঙ্গানদীর তীর ধরিয়া নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি নদীয়ায় না গিয়া নদীয়ার সন্নিহিত কুলিয়া-গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন এবং সুমধুর হরিনাম গাহিয়া তথাকার পাপীতাপীদিগকে উদ্ধার করেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী সহ গঙ্গানদীর তীরে তীরে রামকেলি-গ্রামে আসিয়া উপনীত হন।

রামকেলি তৎকালে একটি বহুজনপূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রাম। ইহার সন্নিকটে "পরম

দুর্বার যবনরাজ” হুসেন শাহ বাস করেন। হুসেন শাহ তখন সমগ্র গৌড়দেশের অধীশ্বর—হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ,—হিন্দুরাজ প্রতাপরুদ্রের উড়িষ্যা দেশ তিনি বারংবার আক্রমণ করিয়া উহার বহু দেবমূর্তি ও মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাঁহার ভয়ে হিন্দুরা সর্বদা আতঙ্কিত থাকে। কিন্তু গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া ভক্তবৃন্দ সহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হন;—চতুর্দিক হইতে দলে দলে গ্রামবাসীরা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। তখন জনৈক কোতোয়াল গিয়া গৌড়েশ্বর হুসেন শাহকে গৌরাঙ্গদেবের এই অদ্ভুত লীলার কথা জ্ঞাপন করে, কিন্তু হুসেন শাহ এই সংবাদ শুনিয়া বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ হন না, বরং মহাপ্রভু যাহাতে নির্বিঘ্নে তাঁহার ইচ্ছামত লীলাখেলা করিতে পারেন, তদনুসারে রাজজ্ঞা প্রদান করেন। তাঁহার প্রতি বাঙ্গালার বিধর্মী সুলতানের এই প্রকার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

রামকেলি-গ্রাম হইতে মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে গমন করেন। তথায় তাঁহার আগমনের কথা জানিতে পারিয়া নদীয়া হইতে মুরারিগুপ্ত-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শচীমাতাকে সঙ্গে করিয়া আচার্যের আলয়ে আসেন। দীর্ঘকাল পরে প্রাণপ্রিয় পুত্রের দর্শনলাভ করিয়া শচীমাতা আনন্দে বিহ্বল হন। তাঁহাকে সযত্নে ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বহস্তে বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। মহাপ্রভুও তাঁহার স্নেহময়ী জননীর হাতের রান্না অতিশয় তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন। ভাগ্যবান্ আচার্যের গৃহে কতিপয় দিবস মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া, তিনি কুমারহট্ট-গ্রামে শ্রীবাসের মন্দিরে গমন করেন। সেখানে পুরন্দর আচার্য, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্তদিগের সহিত কিছুদিন কীর্তনানন্দে যাপন করিয়া, তিনি পাণিহাটি-গ্রামে রাঘবপণ্ডিতের ভবনে উপনীত হন। তথায় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য প্রভৃতি শত শত বৈষ্ণবের সহিত কয়েকদিন হরিনাম-কীর্তন করিয়া, তিনি বরাহনগরে এক “মহাভাগ্যবন্ত” ব্রাহ্মণের কুটীরে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণ ভাগবতশাস্ত্রে অতিশয় পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুকে ভক্তিযোগ পাঠ করিয়া শুনান। তাঁহার ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে ভাগবতের সুমিষ্ট পাঠ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে “ভাগবতাচার্য” উপাধি দেন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্য গঙ্গানদীর তীরে তীরে বিভিন্ন গ্রামে তাঁহার ভক্তবৃন্দের গৃহে একে একে অবস্থান করিয়া, অবশেষে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। এবার তিনি কাশীমিশ্রের ভবনে উঠেন। তাঁহার পুনরাগমনে নীলাচলবাসীরা অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত হরিনাম-কীর্তনে মগ্ন হয়। উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র এবার তাঁহার রাজধানী কটকে অবস্থান করিতেছেন। প্রজাবৃন্দের মুখে মহাপ্রভুর বিষয়ে অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে ত্বরায় পুরীতীর্থে গমন করেন। কিন্তু বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীপ্রবর মহাবিষয়ী মহারাজকে দর্শন দিতে সম্মত হন না। অগত্যা মহারাজ একদিন গৌরাঙ্গদেবের অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাকে নৃত্য-গীত-মগ্ন অবস্থায় সন্দর্শন করেন ও অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কৃপালাভের নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হন। অতঃপর মহাপ্রভু একদিন যখন তাঁহার পারিষদবর্গসহ একটি পুষ্পোদ্যানে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন, তখন প্রতাপরুদ্র সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার শ্রীচরণতলে আসিয়া পতিত হন। তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় প্রীতিলাভ করেন এবং তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হউক বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। তদবধি মহাবলশালী মহারাজ প্রতাপরুদ্র নররূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমভক্তে পরিণত হন। চৈতন্যদেবও মহারাজের শাসনাধীন নীলাচলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে মনস্থ করেন।

কিন্তু তিনি নীলাচলে স্থায়িভাবে থাকিলে, তাঁহার প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সর্বত্র প্রচার হইবে না; অথচ তিনি নিজের মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেমসুখে।"—অতএব তিনি তাঁহার অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দকে নীলাচল ছাড়িয়া বঙ্গদেশে গিয়া জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে নিত্যানন্দ—রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি—তাঁহার সুহৃদ্বর্গকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গার তীরে তীরে পাণিহাটী, খড়দহ, সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে স্থানে হরিনাম গাহিতে গাহিতে নদীয়ায় আসিয়া উপনীত হন। তাঁহাকে পাইয়া নদীয়ার বৈষ্ণবেরা অতীব উৎফুল্ল হয় ও গৌরাঙ্গের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া দিবানিশি হরিনাম লইয়া নৃত্যগীত করিতে থাকে। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী

বড়গাছী, দোগাছিয়া প্রভৃতি অপরাপর গ্রামে গিয়া হরিনাম-কীর্তন করেন। এইরূপে তিনি বাঙ্গালাদেশের বহুস্থানে হরিনাম ও তৎসঙ্গে গৌরাঙ্গের মহিমা প্রচার করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাঙ্গালার বিশাল অনুন্নত জনসাধারণ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়।

কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গহীন হইয়া নিত্যানন্দ বেশীদিন বাঙ্গালায় থাকিতে পারেন না, তিনি পুনরায় নীলাচলের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরে রথযাত্রার তিথি আসিয়া উপস্থিত হয়। রথযাত্রার সময় নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে গৌরাঙ্গদেব অনুমতি দেন। তাই, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, পণ্ডিত গঙ্গাদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, বুদ্ধিমন্ত প্রভৃতি শত শত নদীয়াবাসী দলবদ্ধ হইয়া সানন্দে নীলাচলে যাত্রা করেন। মহাপ্রভু আঠারনালা-নামক গ্রামে আগাইয়া আসিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাদের সকলেরই নীলাচলে থাকিবার নিমিত্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এবার জগন্নাথের রথযাত্রায় খুব আমোদ হয়,—মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তপুঞ্জ লইয়া রথের চতুর্দিকে নাচিতে নাচিতে ও গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন, দলে দলে অসংখ্য গৌরভক্ত বিভিন্ন স্থানে বাদ্যধ্বনি-সহকারে হরিনাম-কীর্তন করিতেছে, সেই সুমধুর কীর্তনের সুরে অসীম জনসমুদ্র অপার্থিব আনন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রথযাত্রার পরে একদিন অদ্বৈতাচার্য ভক্তবৃন্দকে লইয়া গৌরাঙ্গদেবের নাম-কীর্তন আরম্ভ করেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গকে স্বয়ং পরমেশ্বর বলিয়া গণ্য করিলেও, গৌরাঙ্গের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করেন না, কারণ বিনয়শীল মহাপ্রভু তাহাতে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু সেদিন অদ্বৈতের উৎসাহে ভক্তমণ্ডলী সাহস সঞ্চয় করিয়া সানন্দে গাহিতে থাকে—

শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥

এইরূপে মহাজ্ঞানী অদ্বৈতাচার্য সর্বপ্রথম "চৈতন্যমঙ্গল" গাহিবার সূত্রপাত করেন। মহাপ্রভু বহির্বাটীতে আসিয়া ভক্তবৃন্দকে তাঁহারই নাম লইয়া সংকীর্তন করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হন ও তৎক্ষণাৎ নিজ বাসায় প্রস্থান

করেন। তদবধি তাঁহার নাম লইয়া সংকীর্তন করিবার প্রথা কালক্রমে বাড়িয়া চলে ও চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যকে নীলাচলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও তাঁহার শেষ-জীবনের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই। কাজেই তাঁহার গ্রন্থখানিকে শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ জীবনী বলা যায় না।

(২) জয়ানন্দ মিশ্র

বর্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুরা-গ্রামে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—সুবুদ্ধি মিশ্র ও মাতার নাম—রোদনী দেবী। রোদনীর সন্তান বাঁচিত না বলিয়া, জয়ানন্দের নাম রাখা হয় 'গুইঞা'। গুইঞা যখন নিতান্ত শিশু, তখন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সুবুদ্ধির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন ও গুইঞার নাম পরিবর্তন করিয়া 'জয়ানন্দ' রাখেন। জয়ানন্দ নিজে তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—

বর্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে সে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞিব পূর্ব্ব শিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুইঞা জয়ানন্দ নাম থুইঞা
রোদনী শান্তিল তারে লঞা।
রোদনী ভোজন করি চলিলা নদীয়াপুর
বায়ড়ায় উত্তরিল গিঞা॥

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধরপণ্ডিতের আদেশে জয়ানন্দ চৈতন্য-জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং আনুমানিক ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা সমাপন করেন। কিন্তু চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবসমাজের দ্বারা আদৃত হয় নাই। তিনি শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন, এবং উহার

চৈতন্যমঙ্গল

পরিণামে তাঁহার গ্রন্থে বহু মারাত্মক ভুল খবর রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে, জগন্নাথ মিশ্রের পরলোকগমনের পরেই নিমাই গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যান এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের

পর লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ, পূর্ববঙ্গে গমন, লক্ষ্মীর দেহত্যাগ ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঘটে। কিন্তু এইরূপ ঘটনাক্রম আর কোন চৈতন্য-চরিতে নাই। চৈতন্যের সহচর মুরারি গুপ্তের কবচায় উক্ত আছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের পর নিমাইপণ্ডিত গয়ায় গমন করেন এবং তথা হইতে ফিরিবার পরে তাঁহার ঐশ্বরিক ভাবপ্রকাশের সূচনা হয়। জয়ানন্দের গ্রন্থ এইপ্রকার ভ্রান্ত সংবাদে পূর্ণ বলিয়া ইহাকে চৈতন্যদেবের জীবনকথার প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ইহাতে অনেক নূতন সংবাদ আছে, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কালে নবদ্বীপে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়,—গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ সহসা নবদ্বীপবাসীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। কোন প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা হুসেন শাহকে বলেন যে, নদীয়ার এক ব্রাহ্মণকুমারের দ্বারা গৌড়ের সিংহাসন অধিকৃত হইবে। এই সংবাদে ভীত হইয়া হুসেন শাহ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের উপর নৃশংস নির্যাতন করেন।—

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণে ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহলা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥

চৈতন্য-কথার প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ তিনি দান করিয়াছেন। "নানারূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনায় কবিত্বশক্তির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই।"[১]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' অবধান সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা মূলতঃ একটি গানের পালা। নিমাইয়ের জীবন নয়খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কবি

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

নয়টি গানের পালা রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পালা মর্ম্মস্পর্শী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি মূল ঘটনার সহিত উহার পরবর্তী আনুসঙ্গিক যাবতীয় ঘটনার সবই উল্লেখ করিয়াছেন। "তাই জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরই বিশ্বম্ভরের গয়ায় গমন বর্ণনা—কেননা মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, গয়ায় পিণ্ডদান প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট।"[১] আবার, শ্রোতৃমণ্ডলের মনোরঞ্জনের জন্য চৈতন্য-লীলার প্রসঙ্গে তিনি নানারূপ পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন,—যথা ধ্রুব-চরিত্র, জড়ভরত, কৃষ্ণলীলা, জগন্নাথক্ষেত্রের মহিমা, সত্যবতীর কাহিনী, জুয়াড়ীর আখ্যান, অজামিলের উপাখ্যান। জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে তিনি নানাস্থানে গৌরাঙ্গের মুখ দিয়া সংসারের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপে বহু বিষয়ের সমাবেশে তিনি তাঁহার মূল বক্তব্য বিষয়টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি উহাদের মধ্য হইতে শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাধুর্য সহজেই আস্বাদন করা যায়। নিমাইপণ্ডিতের ঈশ্বর-প্রেমাকুল বৈরাগ্যশ্রী তাঁহার কাব্যে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। যথা—

না লয় চন্দন মালা না পরে বসন।
নিগমে বসিয়া থাকে কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥
চাচর কেশ না বান্ধে না শুনে কারো কথা।
ভোর দুপুর বেলা গোর যায় যথা তথা॥
... ...
না করে স্নান গৌর না করে ভোজন।
না করে শ্রীঅঙ্গে বেশ তৈল উদ্বর্ত্তন॥
দূর গেল সন্ধ্যা তর্পণ দেবার্চ্চনা।
দূর গেল মন্ত্র জাপ্য তুলসী-বন্দনা॥
... ...
যে ঠাকুর দিব্যমালা পরে শত শত।
সে প্রভুর গলে নাম-ডোর-গ্রন্থ কত॥
যে অঙ্গে চন্দনাগুরু কস্তুরী সুন্দর।
সে অঙ্গ কীর্ত্তনানন্দে ধূলায় ধূসর॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল যার মুখে।
সে প্রভু হরীতকী ফল খাএ কোন্ সুখে॥

১, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে এক বিষয়ে খুবই মূল্যবান্ বলিতে হয়। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। আর কোন চৈতন্য-চরিতে মহাপ্রভুর লীলা-সংবরণ সম্বন্ধে কোনই সংবাদ পাওয়া যায় না। লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে পুরীতে জগন্নাথ-বিগ্রহের সহিত শ্রীচৈতন্যের সহসা বিলীন হইয়া যাইবার কথা উল্লেখিত আছে; কিন্তু উহা সন্দেহজনক জনশ্রুতি মাত্র। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় জয়ানন্দের সংবাদই সঠিক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। জয়ানন্দের মতে,—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন (আষাঢ়) মাসের শুক্লপক্ষে রথ-বিজয়া-উপলক্ষে পুরীতে এক বিশাল কীর্তনদলের সম্মুখভাগে হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গৌরাঙ্গদেবের চরণকমল কঠিন ইষ্টকাঘাতে আহত হয়। ঐ চরণের ক্ষত ক্রমে দূষিত হইয়া উঠে এবং ষষ্ঠীর দিনে বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি জরাক্রান্ত হন। তখন তিনি হয়তো তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন অনুমান করিয়া, নিকটবর্তী টোটাগ্রামে তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধরপণ্ডিতের আশ্রমে গমন করেন।—

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান

আষাঢ় বঞ্চিত রথ-বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
... ...
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শরণ অবশেষে॥

তথায় পরদিবস সপ্তমী তিথিতে গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের দেহাবসান ঘটে।

(৩) লোচন দাস

১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের কোগ্রামে লোচন দাস জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান ঘটে। তাঁহার রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ছিলেন বৈদ্যবংশীয় কমলাকর দাস এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল সদানন্দী। তাঁহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে তিনিই একমাত্র বংশধর বলিয়া, তিনি শৈশবে অত্যধিক আদর-যত্নে লালিত-পালিত হন এবং বাল্যকালে লেখাপড়ায় তিনি মোটেই মনোযোগ দেন না।

অবশেষে তাঁহার মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত তাঁহাকে লেখাপড়া শিখান, এবং সেই শিক্ষার বলে তিনি উত্তরকালে 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিতে সক্ষম হন।

যথাতথা যাই সে দুর্লীল করে মোরে।
দুর্লীল লাগিয়া কেহো পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥

লোচন অল্পবয়সেই শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সহচর নরহরি সরকারের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং গুরুদেবের কৃপাতেই মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। আনুমানিক ১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। কিন্তু কেবলমাত্র চৈতন্যের জীবন-কথা কীর্তন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না,—শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার গুরুদেবের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ও নরহরি-প্রবর্তিত 'নাগরীভাবের উপাসনা' প্রচার করাও তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

চৈতন্যমঙ্গল

নবদ্বীপ-লীলা প্রসঙ্গে নরহরি সরকারের নাম চৈতন্যচরিতকারদিগের কেহই উল্লেখ করেন নাই। এই ত্রুটি সংশোধন করা লোচনের অভিপ্রায় ছিল। নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-লীলার বর্ণনায় তিনি বহুস্থানে নরহরির উপস্থিতি ও তাঁহার প্রতি গৌরাঙ্গদেবের প্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণ-কাল হইতে নীলাচলগমন পর্যন্ত নরহরি বরাবর মহাপ্রভুর সহিত ছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। নিমাই গৃহত্যাগ করিলে, পুত্রহীনা শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত নরহরি নবদ্বীপেই ছিলেন, মহাপ্রভুর সহগামী হইতে পারেন নাই। স্বরূপ দামোদর 'পঞ্চতত্ত্ব'-নিরূপণে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু লোচন শ্রীবাসকে বাদ দিয়া, তাঁহার দীক্ষাগুরুকেও পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।—

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর॥

বৃন্দাবনের গোপীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে রসিক নাগররূপে ভজনা করে, নরহরিও তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গকে নদীয়ার মনোহর নাগররূপে উপাসনা করার প্রথা প্রচলন করেন। গুরুদেব-প্রবর্তিত এই নাগরীভাবের আরাধনা প্রচার করাও লোচনের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবের চরিত্রে এইরূপ নাগরভাব তিনি সুযোগমত বহুস্থানে আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বিবাহের সময় তাঁহাকে স্নান করাইবার কালে পুরনারীরা তাঁহার মনোরম রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহাকে দেহ-মন সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে—

নাগরীভাবের আরাধনা

হেরইতে পহুমুখ কি ভাব উঠিল।
মরমে মদন-জ্বরে ঢলিয়া পড়িল॥
কেহ কেহ বাহু ধরি অথির হইয়া।
কেহ রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া॥
কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা দিয়া সে বান্ধিল পদবন্ধে॥

বাসর-ঘরে কুলবধূদের—

বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ান আলসযুত কাহারো হইল॥
কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ-রঙ্গভবে।
ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বম্ভর-কোলে॥

কিন্তু এই নাগরী ভাবের উপাসনা সকল বৈষ্ণবেরই মনঃপূত ছিল না। এতৎ সম্পর্কে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে—

"—মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি করে॥

লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল'—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড—এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আদিখণ্ডে নিমাইয়ের জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিবরণ; মধ্যখণ্ডে গয়া-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের ঐশ্বরিক ভাবোন্মেষ, সন্ন্যাস-গ্রহণ, নীলাচল-যাত্রা ও সার্বভৌম-উদ্ধার-কাহিনী এবং শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর শেষ

জীবন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বহু ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে থাকিলেও, উহার সকলগুলিই সত্য নহে। মুরারি গুপ্তের কড়চাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিলেও, অপরাপর ভক্তমুখে শ্রুত বহু কাহিনী লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত জীবন চৈতন্যমঙ্গলে প্রতিভাত হয় নাই।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্য-জীবনের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত না হইলেও, ইহার অনেক স্থানে যে সুমধুর কবিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন—এই সংবাদ শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বড়ই ব্যথিত হন। তিনি ভাবেন, তাঁহার যৌবন-সৌন্দর্যের মোহিনী মায়া তাঁহার পতির ধর্ম-সাধনায় বাধা জন্মাইয়া থাকে, তাই তিনি গৃহ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন,—কণ্টকময় অরণ্যে তাঁহার স্বামীকে যাইতে দিবেন না।—

অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন স্থানে
কেমনে হাটিবে রাঙ্গা পায়॥
সুধাময় মুখইন্দু তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
অল্প আয়াসমাত্র দেখি।
শাদয়া বাদল বেলা ক্ষণে বা বিষম হবা
সন্ন্যাস করণ মহাদুঃখী॥
* * *
কি কহিব মুই ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লইয়া মরি যাব বিষ খাইয়া
সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধান বিষয়ে একটা নূতন সংবাদ আছে। কিন্তু উহা সত্য নহে। তাঁহার প্রদত্ত অনেক সংবাদের মত এই সংবাদটিও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। এই সংবাদানুসারে, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

এই কাহিনীর মধ্যে কেহ কেহ একটা গুপ্ত হত্যার সন্দেহ করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর তিরোধানের নূতন সংবাদ

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা নাকি শ্রীচৈতন্যের প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠে। কারণ রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, সামন্তরাজ রায় রামানন্দ প্রভৃতি তদ্দেশীয় মহাপ্রতাপশালী মহাশয়েরা শ্রীচৈতন্যের অতীব অনুগত হইয়া পড়েন। গৌরাঙ্গদেবের প্রভাব এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, কোন কোন চৈতন্যভক্ত চৈতন্য-দেবকে স্বয়ং জগন্নাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হয়। এই হেতু, জগন্নাথের অনুরক্ত উড়িষা-ব্রাহ্মণদের শ্রীচৈতন্যের প্রতি একটা তীব্র আক্রোশ থাকিবার কথা। সম্ভবতঃ রবিবারে তিনি যখন অসুস্থ শরীরে একাকী জগন্নাথ-দর্শনে যান ও ভাবাবেশে তথায় মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তখন সেই সুযোগে পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ গোপন করিয়া ফেলে এবং তিনি জগন্নাথ-বিগ্রহে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, এই মিথ্যা সংবাদ ঘোষণা করে। শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র অচ্যুতানন্দের উড়িয়া-ভাষায় লিখিত 'শূন্যসংহিতা'-নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলাসংবরণ সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদই প্রদত্ত হইয়াছে।—

এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি।
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ডকমণ্ডলু ধরি॥
মহাপ্রতাপ দেবরাজা ঘেণিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে।
হরিধ্বনিয়ে দেউল উছুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে॥
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে॥

(৪) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের মতানুসারে, ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিকটবর্তী কোন এক সময়ে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর-গ্রামে এক দরিদ্র বৈষ্ণববংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগীরথ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী; তাঁহার মাতার নাম সুনন্দা, শ্যামদাস তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্যামদাসকে চারি বৎসরের ও কৃষ্ণদাসকে ছয় বৎসরের বালক মাত্র রাখিয়া ভগীরথ অকালে পরলোক গমন

করেন। উহার কিঞ্চিৎকাল পরে সুনন্দাও তাঁহার স্বামীর অনুগামিনী হন। তখন অসহায় ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের পিসীমাতার বাড়ীতে অতিকষ্টে মানুষ হয়।

পৈতৃক চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদাস বাল্যকালে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পাঠ্যাবস্থাতেই শ্রীচৈতন্যের মধুর চরিত্রে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ভজনসাধনে প্রায় সর্বক্ষণ অতিবাহিত করেন। গৃহের যাবতীয় কার্যের তত্ত্বাবধান তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাস করিতেন। শ্যামদাস শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও, নিত্যানন্দকে অবতার বলিয়া গণ্য করিতেন না। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় মনোবেদনা অনুভব করিতেন। একদিন তাঁহাদের বাড়ীতে রামদাস নামে নিত্যানন্দের এক শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হন। শ্যামদাস তাঁহার সম্মুখে নিত্যানন্দের তীব্র নিন্দা করিলে, তিনি অতীব কষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিরস্কার করেন ও নিজের মনে নিদারুণ দুঃখ অনুভব করেন। সেইদিন রাত্রে নিত্যানন্দ স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুসারেই তিনি পরদিন প্রত্যূষে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তখন তিনি অবিবাহিত, প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ণ যুবক। তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার অন্তর্গত পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমলীলা করেন, এই হেতু তাঁহার নিকট বৃন্দাবন একটি পরম পবিত্র তীর্থ। কিন্তু ঐ কৃষ্ণের তিরোধানের পর বৃন্দাবনের সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায় ও নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। উহার পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্ত তিনি রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ, গোপাল প্রভৃতি তাঁহার প্রতাপশালী ভক্তদিগকে বৃন্দাবনে বাস করিতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের সযত্ন চেষ্টায় বৃন্দাবন অচিরে সমুন্নত হইয়া উঠে ও পূর্বের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নব-সংস্কৃত বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া কৃষ্ণদাস রূপ-সনাতনাদি গোস্বামীবৃন্দের শ্রীচরণতলে পতিত হন ও তাঁহাদের নিকট নানাবিধ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এই ছয়গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥

এই ছয় গুরুর মধ্যে রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। কালক্রমে তিনি পরমভক্ত ও অতিশয় শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠেন এবং সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' কাব্য ও বিল্বমঙ্গল-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-কাব্যের টীকা লেখেন। সম্ভবতঃ 'গোবিন্দলীলামৃত' রচনা করিয়া তিনি গোস্বামীদেব নিকট হইতে "কবিরাজ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার গভীব ভক্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বাঙ্গালা-পদ্যে শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। এতদ্বিষযে তাঁহার গ্রন্থের আদিলীলার অন্তর্গত অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বে যে কয়খানি চৈতন্যচরিত রচিত হয, সেগুলিব মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপূরেব শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য এবং বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এইগুলির কোনটিতেই শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনের কাহিনী নাই। এইগুলির মধ্যে চৈতন্যভাগবতই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবেরা বিশেষ প্রীতির সহিত পাঠ কবেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের গৌর-লীলা-রসাস্বাদন-পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। তাই তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করিবাব নিমিত্ত অনুরোধ কবেন। কিন্তু তিনি তখন অতিবৃদ্ধ,—লিখিতে গেলে তাঁহার হাত কাঁপে।—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগে গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥

বৈষ্ণবদের আদেশ পাইয়া, তিনি কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তিত মনে শ্রীশ্রীমদনগোপালের মন্দিরে যান ও দেবতার সম্মুখে প্রণত হইয়া মনে মনে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করেন। তন্মুহূর্তে মদনগোপালের কণ্ঠদেশ হইতে একটি পুষ্পমাল্য খসিয়া পড়ে। মন্দিরের পূজারী সেই মালা তুলিয়া লইয়া কৃষ্ণদাসের গলায় পরাইয়া দেন। তিনি উহাকে দেবতার

সম্মতিসূচক নির্দেশ জ্ঞান করিয়া পরমাহ্লাদের সহিত সেইখানেই তাঁহার গ্রন্থের সূচনা করিয়া ফেলেন।—

আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপদামোদরের কড়চা, কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ও চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য এবং রূপ-সনাতন প্রভৃতি চৈতন্য-পার্ষদদের মৌখিক উক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস সযত্নে গৌরাঙ্গের সম্পূর্ণ জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থই তিনি প্রধানতঃ অনুসরণ করেন। গৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ-লীলা বৃন্দাবনদাস সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেন, কিন্তু নীলাচল-লীলার কথা তিনি অতি সামান্যই বলেন। এই হেতু, কৃষ্ণদাস নবদ্বীপ-লীলা সংক্ষেপে সারিয়া, নীলাচল-লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেন।—

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
মধুর করিয়া লীলা করিল প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥

আনুমানিক ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' সমাপ্ত করেন। তখন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে অপরাপর বৈষ্ণবশাস্ত্রের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে প্রচারের নিমিত্ত প্রেরিত হয়। তাঁহারা যখন পথ-পরিক্রমণ-কালে বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হন, তখন তথাকার রাজা বীর হাম্বীরের নিযুক্ত একদল দস্যু ঐ গ্রন্থনিচয় হরণ করিয়া লয়। কিন্তু শ্রীনিবাস বহু চেষ্টা করিয়া গ্রন্থগুলি পুনরায় হস্তগত করিয়া বাঙ্গালাদেশে লইয়া আসেন। বলরামদাস (বা নিত্যানন্দদাস) কর্তৃক রচিত 'প্রেমবিলাস' কাব্যে উক্ত আছে যে, গ্রন্থাপহরণের সংবাদ লোকমুখে বৃন্দাবনে পৌঁছিলে, বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস উহা শ্রবণ করিয়া নিদারুণ ক্ষোভে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, আর উঠেন না।—

"রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে।
আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥

বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে ॥"

কিন্তু এই সংবাদ সত্য নয়। নরহরি চক্রবর্তী-রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' কাব্য হইতে জানা যায়,—গ্রন্থহরণের পরেও গ্রন্থবাহী শকট ও প্রহরিগণ বন-বিষ্ণুপুরেই থাকে। শ্রীনিবাস বীর হাম্বীরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ভাগবত-পাঠের দ্বারা রাজার মতিগতির পরিবর্তন সাধন করেন ও তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করিয়া আনেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিমিত্ত বীর হাম্বীর প্রচুর উপঢৌকন শ্রীনিবাসের হাতে দেন। তখন শ্রীনিবাস একটি পত্রে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া, প্রহরীদিগের সহিত সেই পত্র ও উপঢৌকন বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। 'কাজেই গ্রন্থহরণ-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ পাওয়াতে কৃষ্ণদাস বা গোস্বামীদের কেহই নিদারুণ মর্মাঘাত অনুভব করেন নাই। শ্রীনিবাসের নিকট লিখিত শ্রীজীব গোস্বামীর একটি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থাপহরণের বহুকাল পরে শ্রীনিবাস যখন বিবাহ করিয়া পুত্রকন্যাদির পিতা হইয়াছেন, তখন এই পত্র লিখিত হয়। এই পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে—

"—এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ॥"

এই উক্তি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, গ্রন্থাপহরণের পরেও কৃষ্ণদাস জীবিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথার্থই পরম বৈষ্ণব। তিনি সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শতাধিক বৎসর পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবন তিনি সাধুসঙ্গ, সদালোচনা, শাস্ত্রানুশীলন, গ্রন্থ-প্রণয়ন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অতিবাহিত করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের সর্বত্রই তিনি গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসংখ্য শাস্ত্র-অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানেই তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানের বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং তিনি যে অতিশয় নিরহঙ্কার ও বিনয়ী, তাহার পরিচয় চৈতন্য-চরিতামৃতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। যথা—

জগাই মাধাই হৈতে মুই যে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তাঁর পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগত সংসারে॥

তাঁহার ভণিতাতেও বিনয়-প্রকাশের এক অভিনব আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম॥

'চৈতন্যচরিতামৃত' একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে সর্বসমেত ৬২ পরিচ্ছেদ ও ১২০০০-এর অধিক শ্লোক আছে। শ্রীচৈতন্যের কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার ভক্তবৃন্দের বিস্তৃত পরিচয় ও বৈষ্ণবধর্মের নানাবিধ তত্ত্বকথার বিশদ ব্যাখ্যা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব ও বৃন্দাবন-বাসী গোস্বামীদের রচিত যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্রের সারাংশ ইহাতে সুচারুরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। এই হেতু, বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া সমাদৃত ও বেদবেদান্তের মত সর্বজনমান্য। ইহাকে শুধুমাত্র জীবন-চরিত বা মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনশাস্ত্র, কাহিনী বা ইতিহাস বলা যায় না,—ইহা একাধারে সবই। এই কারণে ইহাকে 'মহাগ্রন্থ' বলিলে ভাল হয়। কবিত্বের সহিত দার্শনিক তত্ত্বালোচনার এমন সুন্দর ও সরস সমাবেশ আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বহুবিধ ও বহুসংখ্যক বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটায় ইহা বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই কারণে ইহা সর্বজনপ্রিয় হইতে পারে নাই, কিন্তু সর্বকালজয়ী হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃত

আদি-লীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলা—এই তিনখণ্ডে 'চৈতন্যচরিতামৃত' বিভক্ত। আদি-লীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে পূর্ণ। প্রথম দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণব ধর্মের বিবিধ তত্ত্ব, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক কারণ, চৈতন্যভক্তদিগের শ্রেণী বিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিদের চারিত্রিক মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে। এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদকে, গ্রন্থকারের মতানুসারে, গ্রন্থটির মুখবন্ধ বলা যাইতে পারে।—

আদি-লীলা

এই সপ্তদশ আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥

এই মুখবন্ধের প্রারম্ভে শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের দ্বিতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে, পরমেশ্বরকে প্রেমের সহিত আরাধনা করার প্রথা, আর কোন ধর্মাত্মার দ্বারা উদ্ভাবিত হয় নাই; তিনিই সর্বপ্রথম, ভীতি ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে, ভক্তি ও ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরভজনের সদুপদেশ দান করেন।—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

অর্থ—পূর্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজভক্তিসম্পদ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্বদা প্রকাশিত থাকুন।

দ্বাপরযুগের শ্রীকৃষ্ণই যে কলিযুগে রাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীচৈতন্য-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, স্বরূপ-গোস্বামীর কড়চা হইতে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

অর্থ—আমার প্রতি শ্রীরাধার প্রণয়-পরিমাণ কত? আমার অদ্ভুত মাধুর্যরস, যাহা কেবল তিনিই আস্বাদন করিতে পারেন, তাহাই বা কিরূপ? আর ঐ মধুর রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার যে সুখোৎপত্তি হয়, তাহাই বা কেমন?—এই তিনটি তত্ত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব অঙ্গীকারকরতঃ শচী-গর্ভসিন্ধুতে উদয়লাভ করিলেন।

কলিকালে সকলেই জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরমহিমা উপলব্ধি করিতে চায়, এবং ঈশ্বরের মত শক্তিশালী হইবার মানসে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই প্রকার সাধনায় কোনই আনন্দ নাই। ইহাতে সাধক নিজেই ঈশ্বর হইতে চায়, ঈশ্বরকে পাইতে চায় না, ঈশ্বরের প্রেম-করুণা-ভালবাসা পাইবার জন্য সে লালায়িত হয় না। তাই, প্রেমময় পরমসুন্দর পরমেশ্বরকে পাওয়ার যে অসীম আনন্দ, তাহা হইতে সে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রিয়তম প্রভু, প্রীতিপূর্ণ বন্ধু, নিকটতম আত্মীয়—এই প্রকার ভাবের বশবর্তী হইয়া ঈশ্বরারাধনায় অনির্বচনীয় আনন্দ আছে,—সেই আনন্দে ভগবান্ ভক্তের কাছে ধরা দেন। এইরূপ সপ্রেম ঈশ্বরোপাসনা মনুষ্যসমাজে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে বিধিভজন করিযা।
বৈকুণ্ঠকে যায চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিমু নামসংকীর্ত্তন।
চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

*　　*　　*

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

জ্ঞান বা ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়।—

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

আদি-লীলার অবশিষ্ট পঞ্চ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের জন্ম হইতে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও নব-যৌবন কালের যাবতীয় ঘটনা উল্লেখিত হইযাছে মাত্র, বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই,—কারণ ঐগুলির বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্য-ভাগবতে আছে। কিন্তু নিমাই-পণ্ডিতের দ্বারা দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতের পরাজয়ের কাহিনী কৃষ্ণদাস সবিস্তারে বলিয়াছেন, কারণ বৃন্দাবনদাস উহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস-বর্ণিত ঘটনাগুলি ছাড়াও দুই-চারিটি নূতন ঘটনার উল্লেখ কৃষ্ণদাস-বর্ণিত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি ঘটনাব উল্লেখ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করি বসে শ্রমযুক্ত হৈযা॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল সভেই বিস্মিত॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥

মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য কাটোয়া-নগরে সংসার-বিরাগী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন ও নানা স্থান পর্যটন করিয়া নীলাচলে গিয়া উপনীত হন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন। তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ

করেন। এইরূপে নানাস্থানে যাতায়াতে তাঁহার সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। এই ছয় বৎসরের কাহিনী কৃষ্ণদাস তাঁহার গ্রন্থে মধ্য-লীলায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই মধ্য-লীলা অতিশয় ঘটনাবহুল;—তাই সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এই লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই লীলার অন্তর্গত অসংখ্য ঘটনার মধ্যে যেগুলি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, শুধু সেইগুলি গ্রন্থকার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, অপরগুলির উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পূর্বকালবর্তী ঘটনারাজী বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কাজেই কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে এইগুলির পুনর্বর্ণনায় বিশেষ অভিনবত্ব নাই। তবে, বাসুদেব সার্বভৌমের কাহিনী কৃষ্ণদাস অধিকতর বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন;—কারণ, সার্বভৌম ও মহাপ্রভুর ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক বাদানুবাদ বৃন্দাবনদাস উদ্ধৃত করেন নাই। মহাপ্রভুকে নিরাকার-নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান দিবার মানসে সার্বভৌম সপ্তদিবস ব্যাপিয়া তাঁহাকে বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনান এবং তিনিও তাহা অখণ্ড মনোযোগের সহিত শোনেন, কিন্তু কোনদিন ভাল-মন্দ কিছুই বলেন না। ইহাতে সার্বভৌম কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলেন,—

মধ্য-লীলা

ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা জানিতে না পারি॥

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলেন, "আপনি যখন মূল গ্রন্থখানি পড়েন, তখন তাহার সূত্রের অর্থ আমি সহজেই বুঝিতে পারি; কিন্তু আপনি যখন তাহার ব্যাখ্যা করেন, তখন উহার অর্থ আমার নিকট জটিল হইয়া পড়ে। আপনি শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া, উহার গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিতেছেন; তাই আপনার ব্যাখ্যা মূল অর্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ—যিনি নিজে বড় হন ও অপরকে বড় করেন। সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিশালী এবং সেই অসীম শক্তির বলে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন;—অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতানুযায়ী নির্বিশেষ বা শক্তিহীন তিনি নন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই ত্রিবিধ কারকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার, 'অপাণিপাদ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের হস্তপদাদি

না থাকিলেও তিনি ধরিতে, চলিতে ও নানাবিধ কার্য করিতে পারেন। অতএব ব্রহ্ম যে সাকার, এই সূত্রের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়।

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
... ...
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥

মহাপ্রভুর মন্তব্য খণ্ডন করিবার নিমিত্ত সার্বভৌম বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিবাদ উঠান, কিন্তু মহাপ্রভু তাহার সবগুলিই একে একে খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন সার্বভৌম স্বীয় ভ্রান্তি সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন।—

কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন।
নিজরূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন॥
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন।
... ...
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন॥

মহাজ্ঞানী সার্বভৌমকে কৃপা প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু মাসাধিক কাল নীলাচলে অবস্থান করেন। নীলাচল-বাসীরা তাঁহাকে "সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" গণ্য করিয়া, তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হয়। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করিবার জন্য গমন করেন। কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ সেবককে সঙ্গে লইয়া তিনি যান;—নিত্যানন্দাদি অপর কাহাকেও সঙ্গে যাইতে দেন নাই। দক্ষিণাপথের সুদূর সেতুবন্ধ পর্যন্ত অসংখ্য তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তিনি তত্রত্য বিশাল জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। সকল তীর্থস্থানের ও তথায় তাঁহার সকল কার্যের বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে; তাই আমরা কেবল প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব।

দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোক শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। তাই মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' উভয় নাম কীর্তন করিতে করিতে পথ অতিবাহন করেন।—

রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাং॥

পথিমধ্যে কোন লোকের সাক্ষাৎ পাইলে তিনি তাহাকে 'হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলেন, আর সে তখনই 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে নাচিতে নিজের গ্রামে চলিয়া যায়। সেই গ্রামের লোকেরা আবার তাহার মুখে সুমিষ্ট নাম-কীর্তন শুনিয়া, 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া নাচে ও গায়। তাহাদের মুখে অন্য গ্রামের লোকেরা ঐ সুমধুর নাম শুনিয়া, 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া গাহিতে থাকে। এইরূপে শুধুমাত্র একটি লোককে কৃপা করিয়া তিনি একাধিক গ্রামের সহস্র লোককে কৃষ্ণ-নামামৃত পান করান।

এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে॥

বাসুদেব সার্বভৌমের নির্দেশমত তিনি কতিপয় দিবসের মধ্যে গোদাবরী-তীরস্থ বিদ্যানগরে উপনীত হন। এই বিদ্যানগরে প্রতাপরুদ্রের সামন্তরাজ রামানন্দ রায় আধিপত্য করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব; গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তিনি প্রেম-মাধুর্য আস্বাদন করেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু পবিত্র গোদাবরীর সুশীতল জলে অবগাহন করিয়া, ঘাটের সন্নিকটস্থ একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রহেন। কিয়ৎকাল পরে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ সহ রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া সেই ঘাটে আসেন ও বিধিমত স্নান-তর্পণাদি সমাপন করেন। ঘাটে উঠিয়া তিনি সহসা অদূরে মহাপ্রভুকে দেখিতে পান ও তাঁহার তেজঃপূর্ণ দেহকান্তি দেখিয়া পরম বিস্মিত হন।—

রায় রামানন্দ মিলন

সূর্য্যশতসম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

তাঁহার সহিত সাধন-ভজন-বিষয়ে সুগভীর আলোচনা করিবার জন্য মহাপ্রভু কতিপয় দিবস বিদ্যানগরে অবস্থান করেন। একদিন অনাবিল অবসরমত তাঁহারা উভয়ে একত্র উপবিষ্ট হইলে, মহাপ্রভু বলেন—

"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"

রায় কহেন, "স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি হয়।"

সৎপথে থাকিয়া সাংসারিক জীবনের কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করাকে 'স্বধর্মাচরণ' বলে; ইহাকে 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম'ও বলা হয়। এই ধর্ম যথাযথ পালন করিলে, সাংসারিক ব্যক্তি ঈশ্বর-নির্ভরশীল হয় ও তাহার চিত্তে বিষ্ণুভক্তি জন্মে। এই বিষ্ণুভক্তির বলে সে দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু ঈশ্বরকে পায় না। তাই,

মহাপ্রভু বলেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রায় কহেন, "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।"

কর্ম-সাধন হইতে সংসার-বন্ধন ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তাই কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। ইহার পরিণামে সংসার-মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটে না। তাই,

মহাপ্রভু বলেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রায় কহেন, "স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার।"

বহুকর্ম করিয়াও মানুষ চিরন্তন সুখশান্তি জীবনে পায় না; তাই অবশেষে সুখভোগের বাসনা বিসর্জন দিতে হয় এবং সর্ববিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হয়। তখন ঈশ্বর যাহা দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, নিজে চেষ্টা করিয়া কোনরূপ ভোগের আয়োজন করিতে নাই। ইহাকে বলে কর্মত্যাগ। কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বরকে পাওয়ার কোনই নিশ্চয়তা নাই। তাই.

মহাপ্রভু বলেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রামানন্দ কহেন, "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।"

ঈশ্বরের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তাহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম হইলে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভক্তি জন্মে। দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের উপরে এই প্রকার ভক্তি নির্ভর করে বলিয়া, ইহাতে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই,

মহাপ্রভু বলেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

রামানন্দ কহেন, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।"

সাধু ব্যক্তির মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে আন্তরিক আসক্তি জন্মে, তাহাকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বলে। হৃদয়ের আবেগে যদি ঈশ্বর-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার ও সেবাযত্ন করিবার জন্য মানুষ স্বভাবতঃ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতাই তাহাকে ঈশ্বর-মিলনের দিকে আগাইয়া লইয়া যায়। তাই এবার মহাপ্রভু রামানন্দের মন্তব্য সমর্থন করিয়া বলেন,—

"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহেন, "প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।"

পরমেশ্বরকে প্রিয়তম জ্ঞান করা ও তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়াকে প্রেমভক্তি-সাধন বলে। ঈশ্বরকে আনন্দ দিতে গিয়া, ভক্ত নিজেই অপার আনন্দে বিভোর হয়। তখন ভগবচ্চিন্তা, ভগবন্নাম-কীর্তন ও ভগবানের পূজার্চনা লইয়া সে সর্বক্ষণ মাতিয়া থাকে ;—এবং এইরূপে সে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন অনুভব করে। এই প্রেমভক্তির আবার চারিটি বিভিন্ন স্তর আছে ; যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। মহাপ্রভুর অনুরোধে রামানন্দ এই চারি স্তর বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমই যে এই প্রকার প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তাহাও বলেন। তখন মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব জানিতে চাহেন। ইহার উত্তরে রামানন্দ 'ব্রহ্মসংহিতা'-র একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণঃ ॥"

আর রাধা-সম্বন্ধে বলেন,—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

একদিন রামানন্দ মহাপ্রভুকে সবিনয়ে বলেন, "আমার মনের মধ্যে একটা প্রবল বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে। আপনাকে আমি প্রথমে সন্ন্যাসীর রূপে দেখি, কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে শ্যামসুন্দর-মূর্তিতে দেখিতে পাই। আপনার দৈহিক গঠন শ্রীকৃষ্ণের মতন, কিন্তু আপনার সর্বাঙ্গ যেন শ্রীরাধার স্বর্ণকান্তির দ্বারা সমাবৃত। কৃপা করিয়া, আপনার স্বরূপ-পরিচয় আমায় দান করুন।" মহাপ্রভু

মৃদু হাসিয়া বলেন, "রাধাকৃষ্ণের প্রতি আপনার প্রগাঢ় প্রেম, তাই সকল মূর্তিতেই আপনি রাধাকৃষ্ণের রূপ দেখিতে পান।" কিন্তু এই উত্তরে রামানন্দ সন্তুষ্ট হন না; তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন, "আমার নিকট লুকাইলে চলিবে না। আপনি বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ; এবার রাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া প্রেমাস্বাদন করিবার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

রায় রামানন্দের সঙ্গে দশরাত্রি কৃষ্ণকথারঙ্গে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়-কালে তাঁহাকে তিনি বলিয়া যান, "আপনি বিষয়কর্ম হইতে অবসর লইয়া, নীলাচলে গিয়া বাস করুন। আমি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সমাপন করিয়া আপনার সহিত পুনরায় নীলাচলে সম্মিলিত হইব। তখন উভয়ে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া অবশিষ্ট জীবন তথায় যাপন করিব।"

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ

অনন্তর মহাপ্রভু নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বৃদ্ধকাশী নামক এক তীর্থস্থানে উপনীত হন। তথায় এক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য একদল শিষ্য লইয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু তাঁহার যাবতীয় প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের শিষ্যবর্গের সম্মুখে পরাজিত হইয়া সেই বৌদ্ধাচার্য অতিশয় লজ্জিত হন ও ইহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র করেন। একটি থালাতে অপবিত্র অন্ন আনিয়া তিনি মহাপ্রভুকে উহা ভোজন করিতে অনুরোধ করেন। তখন এক মহাকায় পক্ষী কোথা হইতে সহসা উড়িয়া আসিয়া সেই অন্নপূর্ণ থালা ছিনাইয়া লইয়া যায়। থালার অপবিত্র অন্ন পাষণ্ড বৌদ্ধদের গায়ে ছড়াইয়া পড়ে ও শূন্য থালাটা তির্যগ্‌গতিতে বৌদ্ধাচার্যের গলদেশে আসিয়া প্রচণ্ডবেগে আঘাত করে এবং উহাতে তাঁহার মস্তক ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। গুরুদেবের এইরূপ আকস্মিক অপমৃত্যুতে শিষ্যবর্গ হাহাকার করিয়া উঠে এবং সকাতরে মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার প্রাণ প্রার্থনা করে। তিনি তখন তাহাদিগকে বৌদ্ধাচার্যের ছিন্ন শির শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে বলেন। তাঁহার অপার করুণায় বৌদ্ধাচার্য পুনরায় জীবন ফিরিয়া পান।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু একজন অসাধারণ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান। সে প্রত্যহ তথাকার দেবালয়ে আসিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত অশুদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করে। তাহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া লোকে উপহাস করে, কিন্তু তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাগ্রমনে পড়িয়া যায় ও তাহার সর্বশরীর স্বেদ, কম্প ও পুলকে স্পন্দিত হইতে থাকে। মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "গীতার কোন্ অর্থ আস্বাদন করিয়া তোমার এত আনন্দ হয়?" তদুত্তরে সে বলে, "আমি মূর্খ, শব্দার্থের জ্ঞান আমার নাই; তবু আমার গুরুদেবের আদেশে আমি নিত্য গীতা পাঠ করি। যতক্ষণ গীতা পড়ি, ততক্ষণ আমার চোখের সম্মুখে আমি দেখি, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ অর্জুনের রথে বসিয়া তাঁহাকে হিতোপদেশ দিতেছেন। এই সুমধুর দৃশ্য দেখিয়া আমার হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দের আবেশ হয়, তাই আমি গীতা পড়িতে ভালবাসি।" মহাপ্রভু বলেন, "তুমি গীতার মূল অর্থ উপলব্ধি করিয়াছ, একমাত্র তোমারই গীতা-পাঠে যথার্থ অধিকার আছে।"

দক্ষিণ-মথুরা নামক তীর্থস্থানে উপনীত হইলে রামদাস নামে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষাগ্রহণের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়া গেলেও রন্ধনের কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া, তিনি তাহাকে বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে সে বলে, "আমার প্রভু এখন অরণ্যে বাস করেন। সম্প্রতি অরণ্যে আহার্য সামগ্রী পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ বন্য শাকসব্জী আহরণ করিয়া আনিলে, সীতাদেবী রন্ধন করিবেন।" তাহার উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন। যাহা হউক, বেলা তৃতীয় প্রহরে তাঁহাদের ভোজন সমাধা হয়। মহাপ্রভুর জন্যই আজ সে রন্ধন করিয়াছে, অন্যথা প্রায়ই সে উপবাস করে। ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে, "জগন্মাতা সীতাদেবীকে দুরাত্মা রাবণ স্পর্শ করিল, এই দুঃখে আমার মন সর্বদা ব্যথিত থাকে; তাই আমার ভোজনে ইচ্ছা হয় না।" তিনি বলেন, "প্রকৃত সীতাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, তাঁহার দর্শনও রাবণ পায় নাই। রাবণের আগমনে সীতাদেবী অগ্নিদেবতার শরণ নেন। অগ্নিদেবতা প্রকৃত সীতাকে গোপন করিয়া, এক মায়া-সীতাকে রাবণের সম্মুখে আগাইয়া দেন। অনন্তর অগ্নিপরীক্ষার সময় তিনি মায়া-সীতাকে গোপন করিয়া, প্রকৃত সীতাকে পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন।" তাঁহার এই কথা

বিশ্বাস করিয়া সে পুনরায় নিয়মিত ভোজন করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর তিনি রামেশ্বর গিয়া 'কূর্ম্মপুরাণ' নামে একখানা অতি প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পান। উহাতে 'পতিব্রতার উপাখ্যান' নামক একটি গল্পে মায়া-সীতার কথা উল্লেখিত আছে। পূর্বোক্ত রামদাসের প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি ঐ উপাখ্যানটি নকল করিয়া ঐ গ্রন্থে রাখিয়া দেন ও উহার জীর্ণ পত্রখানি আনিয়া তাহাকে দেখান। তখন সে তাঁহাকেই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন জ্ঞান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে।

মলয়-পর্বত অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভু বেতাপানি-নামক গ্রামে আসেন। সেখানে ভট্টমারি-নামক একদল সন্ন্যাসী তাঁহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে স্ত্রী-ধনের লোভ দেখাইয়া হস্তগত করে। তিনি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলে, ভট্টমারিরা অস্ত্র লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহাদের অস্ত্র তাহাদেরই অঙ্গে আঘাত করিতে থাকে, তাঁহার দিকে কোন অস্ত্রই চালিত হয় না। ইহাতে তাহারা মহাভীত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে প্রস্থান করে। তখন তিনি কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া পয়স্বিনী-নদীর তীরে চলিয়া যান। তথায় কেশবের মন্দিরে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন ও সুমধুর নৃত্য করেন। তাহাতে বহুলোক বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে তাঁহার সন্নিকটে আসে ও সাদরে তাঁহার সেবাযত্ন করে। তাহাদের নিকট তিনি 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্র দেখিতে পান ও সাগ্রহে উহার নকল করিয়া নেন। অনন্তর তিনি কতিপয় তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডুপুরে উপনীত হন। সেখানে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী তাঁহাকে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার পরিচয় পাইয়া শ্রীরঙ্গপুরী বলেন, "বহুপূর্বে আমি একবার নদীয়ায় যাই এবং জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। তাঁহার পত্নীর হাতের মোচা-ঘণ্টের সুমিষ্ট স্বাদ আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার এক যোগ্য পুত্র নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া যান। তিনি শঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া এই তীর্থে দেহরক্ষা করেন।" এতকাল পরে তাঁহার মুখে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হন। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তিনি কৃষ্ণবিন্না-তীরে গমন করেন। সেখানে বহু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বাস করে ও তাহারা সকলেই ভক্তিসহকারে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-বিরচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পাঠ করে। তাহাদের কাছে

কৃষ্ণকর্ণামৃত দেখিয়া তিনি অতীব উৎফুল্ল হন ও সানন্দে উহার নকল করিয়া নেন।

অতঃপর নানাতীর্থ ঘুরিয়া মহাপ্রভু দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ঋষ্যমুখ-পর্বতে আরোহণ করেন। পার্বত্য অরণ্যের মধ্যে তিনি সপ্ততালবৃক্ষ দেখিতে পান ও শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া উহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করেন। কি আশ্চর্য! তাঁহার প্রেমালিঙ্গন পাইয়া বৃক্ষগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়! ইহা দেখিয়া সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে রামাবতার বলিয়া গণ্য করে। তৎপরে পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, ও ব্রহ্মগিরি প্রভৃতি কতিপয় স্থান অতিক্রম করিয়া, প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় রামানন্দের রাজ্য বিদ্যানগরে উপনীত হন। তাঁহার আগমন-বার্তা পাইয়া, রামানন্দ রায় অতি ত্বরায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহারা উভয়ে মহানন্দে সুমধুর কৃষ্ণকথায় সাতদিন ও সাতরাত্রি একাদিক্রমে যাপন করেন। অতঃপর রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলেন, "আপনার আজ্ঞানুসারে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আমি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে পত্র লিখি। তিনি আমাকে নীলাচলে গিয়া বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমার সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, সৈন্য, লোকজন বহু গণ্ডগোল আছে। দিন দশেকের মধ্যে ইহাদের একটা সমাধান কবিয়া দিয়া, আমি আপনার পিছনে পিছনে যাত্রা করিব। আপনি আমার পূর্বেই যাত্রা করুন।" তাঁহার কথানুসারে মহাপ্রভু শীঘ্র বিদ্যানগর হইতে প্রস্থান করেন ও তাঁহার সঙ্গে একটা বিপুল জনস্রোত মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিতে থাকে।

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-অভিযান হইতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। সার্বভৌমের মুখে গৌরাঙ্গদেবের অপূর্ব মহিমার কথা শুনিয়া, তিনিও তাঁহার কৃপা পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ যাহাতে যথাশীঘ্র ঘটে, সেজন্য সার্বভৌমকে তিনি সানুনয় অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশে জগন্নাথ-মন্দিরের অদূরে কাশীমিশ্রের বিশাল ভবনে মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিষদবর্গের বসবাসের ব্যবস্থা হয়। যথাকালে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, সার্বভৌম প্রভৃতির সহিত মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কাশী মিশ্র তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া স্বীয় বাসগৃহের সহিত নিজের দেহ-মন তাঁহার সেবার জন্য

উৎসর্গ করেন। তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধায় অতিশয় প্রীত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখান। গৃহমধ্যে নিত্যানন্দাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি উপবেশন করিলে, সার্বভৌম একে একে শিখি মাহাতি, মুরারি মাহাতি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভৃতি নীলাচলের প্রধান প্রধান বৈষ্ণবের সাথে মহাপ্রভুর পরিচয় করাইয়া দেন। ইত্যবসরে রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার অপর চারিপুত্রের সহিত তথায় আগমন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যে বলেন,—

রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহিলে না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি॥

ভবানন্দ তাঁহার বাণীনাথ নামক পুত্রটিকে মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য কাশী মিশ্রের ভবনে রাখিয়া যান। ক্রমে ক্রমে পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, কাশীশ্বর গোঁসাই প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিতে থাকেন। এদিকে নদীয়াবাসীদিগকে তাঁহার নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিবার জন্য নিত্যানন্দ, তাঁহার অনুমতি লইয়া, তাঁহার দক্ষিণাপথ-ভ্রমণের সাথী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে কৃষ্ণদাসের মুখে গৌরাঙ্গের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধা শচীমাতা, শ্রীবাস, অদ্বৈত, হরিদাস, গদাধর প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হন ও নীলাচলে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। অতঃপর নদীয়া, শান্তিপুর, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ দুইশত গৌর-ভক্ত এক নির্দিষ্ট দিনে নবদ্বীপে সম্মিলিত হইয়া ও শচীমাতার আশীর্বাদ লইয়া পদব্রজে নীলাচলের দিকে যাত্রা করেন।

যেদিন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবেরা নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন, সেইদিন মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাজধানী হইতে রামানন্দ রায়কে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন। তিনি সার্বভৌমকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা তিনি কতদূর কি করিয়াছেন। তদুত্তরে সার্বভৌম বলেন, মহারাজের সংস্পর্শে আসিতে মহাপ্রভু কিছুতেই সম্মত হন

মহাপ্রভুর প্রতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ভক্তি

না ; বেশী অনুরোধ করিলে তিনি নীলাচল ছাড়িয়া যাইবেন। তবে, নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ এখানে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের লইয়া তিনি সন্ধ্যার সময় বেড়া-কীর্তন করিবেন। সেই সময় মহারাজ তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন। সেই দিবস অপরাহ্ণকালে মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া নদীয়ার বৈষ্ণবেরা জগন্নাথ-মন্দিরে গমন করেন। বিশাল মন্দিরের চতুর্দিকে সারি সারি দীপমালা প্রজ্বলিত হইলে মহাপ্রভু সংকীর্তন আরম্ভ করেন। কীর্তনীযারা চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সেই মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মহোল্লাসে কীর্তন জুড়িয়া দেন। খোল-মৃদঙ্গ-করতালের উচ্চধ্বনির সহিত তাঁহাদের উদাত্ত সুর সম্মিলিত হইয়া সমগ্র অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত করিয়া তুলে। নীলাচল-বাসীরা দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া সেই অপূর্ব সংকীর্তন শুনিতে থাকে। মহারাজ প্রতাপরুদ্র একটি উচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া সেই মহাকীর্তন সন্দর্শন করেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পান, মহাপ্রভু মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার স্বর্ণকান্তি দেহ হইতে অবিরাম ধারায় স্বেদ নির্গত হইতেছে, তাঁহার বিশাল নয়নযুগল হইতে বিপুল অশ্রুরাশি পিচ্‌কারির ধারার মত দশ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাঁহার সর্বশরীর প্রবল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এই মহদ্দৃশ্য দেখিয়া মহারাজ এক অপূর্ব মহদ্ভাব তাঁহার অন্তরে অনুভব করেন এবং মনে মনে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-তলে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেন।

অতঃপর মহারাজার আগ্রহাতিশয্যে নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি প্রধান বৈষ্ণবগণ একদিন মহাপ্রভুকে প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত সানুনয় অনুরোধ জানান। কিন্তু সংসার-ত্যাগী মহাপ্রভু বিষয়বিলাসী রাজার সংস্রবে আসিতে কিছুতেই সম্মত হন না। তবে প্রিয় ভক্তবৃন্দের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত, রাজার পরিবর্তে রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সম্মতি দান করেন। তখন রামানন্দ সানন্দে রাজপ্রাসাদে গিয়া ও মহারাজার অনুমতি লইয়া নব-কিশোর "শ্যামল-বরণ" রাজকুমারকে মহাপ্রভুর সকাশে লইয়া আসেন। মহারাজ তাঁহার সৌভাগ্যশালী প্রিয়পুত্রকে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের বেশে সাজাইয়া দেন। তাই তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-রূপে সন্দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হন ও সাদরে তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। মহাপ্রভুর দিব্যস্পর্শ লাভ করিয়া নির্মল-হৃদয় রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট

হইয়া পড়ে ও "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকে। তখন মহাপ্রভু তাহাকে সস্নেহে শান্ত করিয়া রামানন্দের সহিত রাজপ্রাসাদে পাঠাইয়া দেন। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পুত্রকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া, মহারাজাও যেন সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গদেবের পবিত্র স্পর্শ লাভ করিলেন—এইরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া পড়েন।

অনন্তর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার শুভ দিন সমাগত হয়। তাহার পূর্বদিবস মহাপ্রভু তাঁহার শত শত ভক্তবৃন্দ লইয়া স্বহস্তে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন করেন। রথযাত্রার দিন তিনি অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া, 'পাণ্ডু-বিজয়' দর্শন করিবার মানসে ভক্তবৃন্দসহ পুরীর মন্দিরে গমন করেন। সেদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডাদের সাহায্যে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সিংহাসন হইতে জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ ভূমিতলে অবতরণ করেন ও তাহাদের বাহু অবলম্বন করিয়া স্বয়ং পদব্রজে রথে গিয়া আরোহণ করেন। জগন্নাথদেবেব এই অত্যাশ্চর্য লীলা 'পাণ্ডু-বিজয়' নামে অভিহিত। পাণ্ডু-বিজয়-কালে নানা বাদ্য ঘোররোলে বাজিতে থাকে এবং স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র স্বীয়হস্তে সম্মার্জনী গ্রহণ করিয়া রথযাত্রার পথ সম্মার্জন করিতে থাকেন। তাঁহার এই প্রকার নিরহঙ্কার ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হন। যথাকালে জগন্নাথ তাঁহার সুসজ্জিত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করেন. এবং সুভদ্রা ও হলধর অপর দুই রথে উঠেন। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মহোল্লাসে রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতে থাকে। রথটি কখনও দ্রুতবেগে, কখন মন্দগতিতে চলিতে থাকে, আবার কখন বা কোথাও স্থির হইয়া পড়ে, যেন নিজের ইচ্ছাতেই রথটি চলিতেছে, অপরের শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে না। রথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম-কীর্তন করিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তদিগকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন। প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপদামোদর প্রধান গায়ক হন ও অদ্বৈতাচার্য নৃত্য জুড়িয়া দেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীবাস প্রধান গায়ক, ও কেন্দ্রস্থলে নিত্যানন্দ মহানন্দে নৃত্য করেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ে মুকুন্দ ও চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দ ঘোষ প্রধান গায়ক। অচ্যুতানন্দকে কেন্দ্র করিয়া শান্তিপুরের বৈষ্ণবদের লইয়া পঞ্চম সম্প্রদায়, নরহরিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীখণ্ডের ভক্তদের লইয়া ষষ্ঠ সম্প্রদায় এবং রামানন্দ রায়রাজকে কেন্দ্র করিয়া কুলীন

রথযাত্রা

গ্রামের বৈষ্ণবদের লইয়া সপ্তম সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রথম চারিটি রথের সম্মুখে, অপর দুইটি রথের উভয় পার্শ্বে ও সপ্তমটি রথের পশ্চাদ্ভাগে কীর্তন করিতে থাকে। তাঁহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের হরিধ্বনি ও নানা যন্ত্রের বাদ্যধ্বনিতে অনন্ত গগনমণ্ডল সঙ্গীতমুখর হইয়া উঠে,—দশদিক শুধু 'হরি হরি' রবে ঝংকৃত হইতে থাকে। ভাব-বিহ্বল কীর্তনীয়াদের নয়ন-যুগল হইতে রাশি রাশি অশ্রুধারা নির্গত হইয়া বর্ষাকালের বৃষ্টিধারার ন্যায় সেই সুবিস্তীর্ণ স্থান আর্দ্র করিয়া ফেলে।

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
বৈষ্ণবের ঘটামেঘে হইল বাদল।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্ত্তন-ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বলে প্রভু "হরি হরি" বুলি।
"জয় জয় জগন্নাথ" কহে হাত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥

মহারাজ প্রতাপরুদ্র অসংখ্য জনসাধারণের মধ্যে কাশীমিশ্রের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া মহাপ্রভুর অপার মহিমা সন্দর্শন করিতেছেন। এমন সময়ে মহাপ্রভু কীর্তনীয়াদের সাত সম্প্রদায় একত্রিত করিয়া উদ্দণ্ড-নৃত্য করিতে উদ্যত হন। তাঁহার সেই অপূর্ব নৃত্যলীলা দেখিবার জন্য স্বয়ং জগন্নাথ আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহার রথের গতি রোধ করেন। তখন তিনি সেই রথের পুরোভাগে উপনীত হইয়া, জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া যুক্তকরে প্রণতি জ্ঞাপন করেন,—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

অনন্তর তিনি উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রবৃত্ত হন। কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে অতিবেগে ঘুরাইলে, উহাকে যেমন একটা চক্রাকার অগ্নিশিখার ন্যায় দেখায়,

প্রচণ্ডবেগে নৃত্যশীল মহাপ্রভুকে সেইরূপ বোধ হয়। বিভিন্ন ভাবাবেগে তাঁহার সর্বাঙ্গ কম্পিত, রোমাঞ্চিত, কখন বা স্পন্দিত হইতে থাকে। তাঁহার সুবর্ণ-পর্বত-প্রায় বিশাল দেহের প্রচণ্ড গতি সংযত করিতে না পারিয়া তিনি বারংবার আছাড় খাইয়া পড়েন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যানন্দ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে নৃত্য করিতে থাকেন। নিত্যানন্দের পার্শ্বে অদ্বৈতাচার্য হুংকার দিয়া হরিধ্বনি দেন এবং অদ্বৈতের পার্শ্বে হরিদাস উচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে নাচিয়া চলেন। এইরূপে তাঁহারা মহাপ্রভুকে ঘিরিয়া তিনটি মণ্ডলের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের ঘিরিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পাত্রমিত্রাদি পরস্পরের হাত ধরিয়া আর একটি মণ্ডল রচনা করেন। এইরূপে চারিদিকে চারিটি মণ্ডলের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া মহাপ্রভু সেই অনন্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে পরমানন্দে নৃত্য করেন।

প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার ॥
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥

নাচিতে নাচিতে তাঁহার দেহে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এই অষ্টাবিধ সাত্ত্বিকভাবের একইকালে বিকাশ ঘটে; তাঁহার রোম-কূপগুলি রক্তবর্ণ বৃহৎ ব্রণের ন্যায় ফুলিয়া উঠে, তাঁহার সর্বশরীর শিমুলবৃক্ষের মত কণ্টকিত হয়, প্রতি লোমকূপ হইতে প্রবল ধারায় প্রস্বেদ নির্গত হইতে থাকে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে পিচ্‌কারির বারিধারার মত অবিরল অশ্রুরাশি চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া দর্শকদিগকে সিক্ত করিয়া ফেলে। ভাবাতিশয্যে তাঁহার দন্তসমূহ যখন কম্পিত হয়,—'জগন্নাথ' বলিতে গিয়া তিনি কেবল "জজ জজ গগ গগ" উচ্চারণ করেন। অবশেষে তিনি শ্বাসহীন হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সবেগে ভূতলে পড়িয়া যান। কিয়ৎকাল পরে জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, তিনি পুনরায় অন্যভাবে আবিষ্ট হইয়া কীর্তন করিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দামোদরস্বরূপ তখন উচ্চৈঃস্বরে ধুয়া ধরেন—

"সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু॥"

সেই সুমধুর সুরে সুর মিলাইয়া মহাপ্রভু সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে

অগ্রসর হইয়া যান ;—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথদেবের সুবিশাল রথও আগাইয়া চলে। কিন্তু তিনি যদি পিছাইয়া পড়েন, তবে রথ থামিয়া যায় ; আবার তিনি যেই আগাইয়া আসেন অমনি রথ চলিতে থাকে। মনে হয়, তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই যেন জগন্নাথের রথটি চালিত হইতেছে।

গৌর যদি পাছে যায় শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥
এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী।

রথের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভু যখন প্রতাপরুদ্রের সন্নিকটে আসেন তখন তিনি সহসা আছাড় খাইয়া ভূতলে পড়েন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরেন; কিন্তু মহাপ্রভু—"ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দেন। ইহাতে প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত মর্মাহত হন ও মহাপ্রভু তাঁহাকে কখনই কৃপা করিবেন না ভাবিয়া অতিশয় বিমর্ষ হইয়া পড়েন। কিন্তু সার্বভৌম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, তাঁহার ভক্তির প্রগাঢ়তা পরীক্ষা করিবার মানসেই মহাপ্রভু ঐরূপ আচরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের রথত্রয় ক্রমে বলগণ্ডি-নামক স্থানে এক পুষ্পোদ্যানের সন্নিকটে উপনীত হইয়া স্থির হয়। কারণ, তথায় একবার ভোগ লাগাইবার রীতি আছে। তখন মহাপ্রভু সংকীর্তন স্থগিত রাখিয়া কতিপয় ভক্তসহ সেই পুষ্পকাননে বিশ্রাম করিবার জন্য প্রবেশ করেন। অতিশয় শ্রান্তিবশতঃ তিনি একটি গৃহপিণ্ডার উপরে শায়িত হইয়া পড়েন ও তাঁহার ভক্তেরা এক এক বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। সেই সময় সার্বভৌমের উপদেশে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া দীন বৈষ্ণবের বেশে মহাপ্রভুর সকাশে নিঃশব্দে গমন করেন। তন্দ্রামগ্ন মহাপ্রভুর পদতলে উপবেশন করিয়া তিনি সযত্নে তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে তিনি মৃদুস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত একটি শ্লোক ভক্তিভরে গাহিতে থাকেন। সেই সুমিষ্ট গান শুনিয়া মহাপ্রভুর তন্দ্রা দূর হয়; তিনি সেই পদসেবককে পুনরায় সেই গান গাহিতে অনুরোধ করেন। সেবকটি তখন সানন্দে গাহেন,—

প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

[অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বিরহিণী গোপীর উক্তি—"তোমার কথারূপ অমৃত বিরহতপ্ত ব্যক্তিগণকে জীবিত করে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমার কথামৃতকে স্তুতি করেন, তোমার কথামৃত পাপনাশন ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং সকল হইতে উৎকৃষ্ট ও সর্বব্যাপক ; অতএব পৃথিবীমধ্যে যাঁহারা তোমার কথামৃত কীর্তন করেন, তাঁহারাই সর্বার্থদাতা।"]

এই গীতামৃত পান করিতে করিতে মহাপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠে ; সেই গায়কের কোনরূপ পরিচয় না লইয়াই তিনি "ভূরিদা ভূরিদা" বলিতে বলিতে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। ভাগ্যবান্ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া ধন্য হন।

ইতিমধ্যে জগন্নাথদেবের ভোগ সমাপন হওয়ায়, পুনরায় রথ টানিবার জন্য গৌড়ীয়েরা দড়ি ধরে। কিন্তু তাহারা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া রথটাকে নড়াইতে পারে না। তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহার পাত্রমিত্রগণ সহ ব্যগ্রভাবে রথের রজ্জু ধরেন, কিন্তু তাঁহারাও রথটাকে টানিয়া আনিতে পারেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিশালকায় হস্তীদল আনাইয়া রথ টানাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতেও রথটা একটুও নড়ে না। ততক্ষণে মহাপ্রভু পূর্বোক্ত পুষ্পোদ্যান হইতে তথায় উপনীত হন। তিনি হস্তীদল সরাইয়া দিয়া, তাঁহার ভক্তগণকে রথের রজ্জু টানিতে বলেন এবং নিজে রথের পিছনে মাথা দিয়া ঠেলিতে থাকেন। কী আশ্চর্য!—অমনি সেই সুবিশাল রথটি হড়হড় করিয়া ছুটিয়া চলে। তাঁহার এই দৈবী মহিমা দেখিয়া সেই বিপুল জনতা "জয় জয় গৌরচন্দ্র" ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। এইরূপ অপরিসীম আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া অবশেষে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও হলধরের রথত্রয় গুণ্ডিচা-মন্দিরে আসিয়া উপনীত হয়। তখন পুনরায় 'পাণ্ডু-বিজয়' উৎসবের সহিত জগন্নাথদেব সেই মন্দিরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই রথযাত্রায় মহাপ্রভু যে অলৌকিক লীলাখেলা করেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটা বিরাট ঘটনা।

গুণ্ডিচার মন্দিরে জগন্নাথ নয়দিন অবস্থান করেন। এই নয়দিন মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণসহ আইটোটা-নগরে আসিয়া বাস করেন। তথায় বহু পুষ্পোদ্যান, সরোবর, বৃক্ষ, বিহঙ্গ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বৃন্দাবনের ভাব জাগিয়া উঠে। তিনি কোনদিন সরোবরে জলকেলি, কোনদিন পুষ্পকাননে রাসলীলা, কোনদিন বৃক্ষতলে নৃত্য-গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বৃন্দাবন-

লীলায় পরমানন্দে অতিবাহিত করেন ; তৎপর নবমদিবসে উল্টা-রথের সঙ্গে সদলে কীর্তন করিতে করিতে পুরীর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

রথযাত্রার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রায় চারিমাস-কাল নীলাচলে থাকিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। কেবল গদাধর পণ্ডিত, পুরী গোস্বামী, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর, দামোদর পণ্ডিত ও কাশীশ্বর মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে রহিয়া যান। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাদের খাদ্যাদি ও বাসস্থানের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহাদের সহিত মহাপ্রভু একাদিক্রমে প্রায় দুই বৎসরকাল নীলাচলে অবস্থান করেন। অনন্তর তিনি তাঁহার পরমপূজনীয়া মাতৃদেবীর শ্রীচরণ দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন।

গৌড়যাত্রা

রাজভৃত্যগণ সহ রায় রামানন্দ তাঁহাকে রেমুনা পর্যন্ত আগাইয়া দেন। তিনি পাণিহাটি-গ্রামে উপনীত হইলে, রাঘবপণ্ডিত তাঁহাকে মহাসমাদর করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যান। তাঁহার আগমন-সংবাদ মুহূর্তমধ্যে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও দলে দলে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। লোকের ভিড়ে তাঁহার পক্ষে সেস্থানে অবস্থান করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তখন তিনি সঙ্গোপনে কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। কিন্তু সেখানেও অগণিত লোকের ভিড়ে তিনি স্বস্তি পান না। সেখান হইতে তিনি কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের বাড়ীতে চলিয়া যান। কিন্তু সেখানে গিয়াও তিনি কোটী কোটী লোকের ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়েন। হরিনাম-সংকীর্তনের দ্বারা তাহাদিগকে মজাইয়া রাখিয়া তিনি যথাশীঘ্র শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের আলয়ে গমন করেন। সেখানে তিনি দশদিন অবস্থান করেন ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে শচীমাতা সেখানে আসিয়া দীর্ঘকাল পরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শান্তিপুর হইতে তিনি রামকেলি-গ্রামে যান। সেস্থানে গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহের দুই প্রধান রাজ-কর্মচারী সনাতন ও রূপ তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন এবং তাঁহার ভক্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহারা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। রামকেলি হইতে পুনবায় শান্তিপুরে তিনি ফিরিয়া আসেন ও অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে যাত্রা করেন।

নীলাচলে কতিপয় মাস অবস্থান করিয়া তিনি বৃন্দাবন-অভিমুখে গমন করেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য নামক একজন সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণকে মাত্র তিনি সঙ্গে

নেন, আর কাহাকেও সঙ্গী হইতে দেন না। লোকের ভিড় এড়াইবার জন্য তিনি কটক ডাহিনে রাখিয়া বনপথে যান। ঝারিখণ্ডের নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া তিনি বারাণসী-ধামে আসিয়া উপনীত হন ও তপন মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান হইতে প্রয়াগ হইয়া তিনি মথুরায় আসেন ও মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যান।

বৃন্দাবন গমন

বৃন্দাবন তখন অরণ্যময় বিজন ভূমিতে পরিণত হইয়াছে; রাধাকৃষ্ণের মিলন-কুঞ্জ প্রভৃতির কোন চিহ্নই নাই। কাজেই তিনি কতিপয় মাস মথুরায় অবস্থান করিয়া ও প্রত্যহ বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিলুপ্ত স্থানগুলির পুনরুদ্ধার সাধন করেন।

বৃন্দাবন ও মথুরার অধিবাসীদের সাহায্যে বৃন্দাবনের প্রধান তীর্থগুলির পুনরায় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া মহাপ্রভু প্রয়াগে ফিরিয়া আসেন। সেই সময় সংসার-ধর্ম বিসর্জন দিয়া, শ্রীরূপ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হন। রূপের বিষয়-বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। রূপের দ্বারা স্বীয় অভীষ্টসাধন করিবার মানসে তিনি তথায় দশদিন অবস্থান করিয়া তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বৈষ্ণবতত্ত্ব সযত্নে শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে ও বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিতে নির্দেশ দেন। যদিও রূপ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও কবি-প্রতিভাশালী, তথাপি তিনি তাঁহার অন্তরে স্বীয় শক্তির সঞ্চার করিয়া দেন, যাহাতে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিশুদ্ধভাবে ও সুললিত ছন্দে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন। অনুপমকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরূপ বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন এবং মহাপ্রভু প্রয়াগ ছাড়িয়া বারাণসীতে চলিয়া যান। তথায় তিনি যখন চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন একদিন সনাতন সহসা আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণতলে পতিত হন। রূপের মত সনাতনেরও প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি ও মুক্তিলাভের নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হন। তাঁহাকেও তিনি সাদরে বৈষ্ণবধর্মের বিবিধ তত্ত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং বৃন্দাবনে বাস করিয়া প্রেমভক্তি-বিষয়ক শাস্ত্রাদি রচনা করিতে অনুজ্ঞা করেন।

সনাতনকে শিক্ষা দিতে মহাপ্রভু প্রায় দুইমাস কাশীতে অবস্থান করেন।

সেই সময় তিনি ঘটনাচক্রে কাশীর সুবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে আসেন। বাসুদেব সার্বভৌমের মত তিনিও বেদবেদান্ত-শাস্ত্রাদিতে পরম পণ্ডিত এবং শত শত সন্ন্যাসী তাঁহার অনুগত। লোকমুখে গৌরাঙ্গদেবের মহিমার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে অল্পমতি ভাবোন্মাদ যুবক বলিয়া একদা নিন্দা করেন। কিন্তু এক্ষণে ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত ধর্মশাস্ত্রীয় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহার পরমভক্ত হইয়া উঠেন। অদ্বৈত-মার্গ ছাড়িয়া তিনি তখন ভক্তিপথ অবলম্বন করেন ও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইবার মানসে দিবানিশি হরিনাম-সংকীর্তনে নিমগ্ন হন। এইরূপে কাশীধামে বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর একাদিক্রমে এই নীলাচলেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই শেষ-জীবনের কথা 'অন্ত্য-লীলা' নামে অভিহিত।

অন্ত্য-লীলা

মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পুরীভারতী, দামোদর স্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন, পণ্ডিত দামোদর, হরিদাসঠাকুর, শঙ্করপণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত আসিয়া সম্মিলিত হন। ক্রমে সার্বভৌম, রামানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, শিবানন্দ প্রভৃতি প্রধান ভক্তেরা তাঁহার সন্নিকটে আসেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা পূর্বের মতই প্রতি-বৎসর রথযাত্রার সময় যথারীতি নীলাচলে আসেন ও তাঁহার সহিত সংকীর্তন ও মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কালক্রমে রঘুনাথ দাস, বল্লভভট্ট, রঘুনাথভট্ট, নকুল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নূতন ভক্তেরা তাঁহার শ্রীচরণতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ নেন। তাঁহাদের মধ্যে রঘুনাথদাস ও রঘুনাথভট্টের প্রতি তিনি বিশেষ কৃপা করেন ও তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে গিয়া রূপ-সনাতনের সহিত বাস করিতে বলেন।

অনন্তর একদিন বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ নীলাচলে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হন। মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তির আলোকে শ্রীকৃষ্ণলীলা নূতনভাবে অঙ্কন করিবার মানসে তিনি 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নামে দুইখানি নাটক লিখিতে সুরু করিয়াছেন। উহা মহাপ্রভুর মনোমত

হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তিনি উহা পড়িয়া মহাপ্রভুকে শোনান। রামানন্দ, সার্বভৌম, অদ্বৈতাচার্য, স্বরূপদামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রভু উহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করেন। নাটকদ্বয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে তিনি উৎসাহ দান করেন ও তাঁহাকে পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে বলেন।

রূপ ও সনাতন

অতঃপর সনাতনও একদিন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের যোগ্য কোনদিন হইতে পারিবেন না ভাবিয়া সাতিশয় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন; তদুপরি তাঁহার সর্বাঙ্গ ভীষণ চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে প্রাণ বিসর্জন দিবেন বলিয়া তিনি মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে সাদরে প্রেমালিঙ্গন করিলে, তাঁহার ভয়ঙ্কর চর্মরোগ দূর হইয়া যায় ও তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হয়। মহাপ্রভু তাঁহাকে কিছুকাল নিজের কাছে রাখিয়া, তাঁহার সহিত সুমধুর ভক্তিতত্ত্ব ও অমৃতময় কৃষ্ণকথার আলোচনা করেন ও তৎপরে তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া ভজন-সাধন করিতে আদেশ দেন। এইরূপে তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। অনন্তর তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব-গোস্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন-সাধনে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের তিনজনের ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি ও কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা বৃন্দাবনের বিস্মৃত কৃষ্ণলীলা-স্থলগুলি পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সমগ্র পশ্চিমভারতে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ঘটে এবং বৈষ্ণবধর্ম ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে বহু সরস সারগর্ভ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীরূপের রচিত 'ললিত মাধব,' 'বিদগ্ধ মাধব', 'দানকেলি-কৌমুদী' ও 'রসামৃতসিন্ধু', সনাতনের রচিত 'ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তিবিলাস' ও 'সিদ্ধান্তসার' এবং জীব-গোস্বামীর রচিত 'ভাগবতসন্দর্ভ', 'গোপালচম্পূ' ও 'ষট্‌সন্দর্ভ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তনাদি লইয়া মহাপ্রভু বাহ্যতঃ প্রফুল্ল থাকিলেও, তাঁহার অন্তরে তিনি সর্বদা কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় বড়ই ব্যথিত হইয়া থাকেন। গভীর রজনীতে ভক্তগণের ভিঁড় কমিয়া গেলে, তাঁহার সেই মনোবেদনা বাড়িয়া উঠে। তখন তিনি সজল নয়নে ও আর্দ্রকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য সকরুণ আর্তি প্রকাশ করেন। রায় রামানন্দ ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া

আর স্বরূপদামোদর কর্ণামৃত-গীতগোবিন্দের গীত গাহিয়া তাঁহাকে অতিকষ্টে সান্ত্বনা দান করেন।

দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়॥
... ...
হা, হা কৃষ্ণ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও, কাঁহা পাও মুরলীবদন॥
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙান স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥

ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভুর "দিব্যোন্মাদ" দেখা দেয়। তিনি সর্বক্ষণ বিরহিণী রাধার ন্যায় কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময় হইয়া রহেন, বহির্জগতের দিকে তাঁহার আর লক্ষ্য নাই। একদিন রাত্রিতে তিনি গৃহের মধ্যে বসিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছেন, আর স্বরূপ ও গোবিন্দ সেই গৃহের দ্বারদেশে শুইয়া আছেন। ইদানীং তিনি আর ঘুমান না, সারারাত্রি বসিয়া বসিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন। মধ্যরাত্রিতে তাঁহার কীর্তনের রব শুনিতে না পাইয়া, স্বরূপ ও গোবিন্দ সেই গৃহের কবাট খোলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান না। তখন অপরাপর ভক্তদের আহ্বান করিয়া, তাঁহারা দেউটি হাতে লইয়া ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরপার্শ্বে তাঁহাকে ভূতলে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহারা দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহার দেহ তখন এরূপ অদ্ভুত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যায়।—

দিব্যোন্মাদ

পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাতে।
অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্মমাত্র আছে তাতে॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।

চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা ॥
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিয়া সকল ভক্তের ছাড়য়ে দেহে প্রাণ ॥

যাহা হউক, স্বরূপ তখন পরমভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের নাম বারংবার তাঁহার কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিলে, তিনি 'হরিবোল' বলিয়া হুংকার দিয়া উঠিয়া বসেন। তাঁহার অস্থিসন্ধিগুলি পুনরায় জোড়া লাগে ও তাঁহার দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। তিনি তখন বলেন, গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিদ্যুৎ-প্রায় দেখা দিয়া অন্তর্ধান হইলে, তিনি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে সেইস্থানে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

একদিন দ্বিপ্রহরে সমুদ্র-স্নান-গমন-কালে চটক-পর্বত দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে বৃন্দাবনের গোবর্ধন-গিরির কথা জাগিয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাগবতের গোবর্ধন-বিষয়ক একটি শ্লোক গাহিতে গাহিতে সেই পর্বতের দিকে বায়ুবেগে দৌড়াইয়া যান। স্বরূপ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি অতিকষ্টে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলেন। কিন্তু তিনি পর্বতের নিকটবর্তী হইলে, তাঁহার গতি সহসা থামিয়া যায়, তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, রোমকূপগুলি শিমুল-কাঁটার মত ফুলিয়া উঠে ও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। তখন স্বরূপাদি বহুক্ষণ ধরিয়া হরিনাম-সংকীর্তন করিলে, তিনি আচম্বিতে 'হরিবোল' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান; কিন্তু তিনি এতক্ষণ ধরিয়া গোবর্ধন-পাহাড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও গোপীবৃন্দ সহ শ্রীরাধার তথায় আগমন দেখিতেছেন; তাঁহার সেই সুখস্বপ্ন তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন।

একদিবস সমুদ্র-স্নানে যাইবার সময় একটি পুষ্পোদ্যান দেখিয়া, মহাপ্রভু উহাকে বৃন্দাবনের রাসলীলা-কুঞ্জ মনে করেন। রাসলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলে, গোপীরা যেভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করে, তিনিও সেই ভাবে ভাগবতের শ্লোক গাহিতে গাহিতে সেই উদ্যানের তরুলতাগুলি তন্নতন্ন করিয়া দেখেন। অতঃপর একদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা লইয়া আলোচনা করেন। সেদিন তিনি কৃষ্ণ-বিরহে বড়ই

ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার মনোভাবানুযায়ী শ্লোকরাশি ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে রামানন্দ পাঠ করিয়া এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের পদাবলী স্বরূপানন্দ গাহিয়া—তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। এইরূপে অর্ধরাত্রি বিলাপ করিয়া তিনি সজল নয়নে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন ও উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে থাকেন। তখন স্বরূপ ও রামানন্দ তাঁহাদের গৃহে ফিরিয়া যান এবং গোবিন্দ গৃহদ্বার-সম্মুখে শুইয়া রহেন। কিন্তু রাত্রির শেষভাগে মহাপ্রভুর কোনরূপ সাড়াশব্দ শুনিতে না পাইয়া, গোবিন্দ কবাট ঘুচাইয়া সবিস্ময়ে দেখেন, রুদ্ধ কক্ষ হইতে তিনি বহির্গত হইয়া গিয়াছেন। তখন গোবিন্দের আহ্বানে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ দেউটি জ্বালাইয়া তাঁহাকে বহুস্থানে বহুক্ষণ অন্বেষণ করেন। জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে একটি বৃহৎ গোশালা। সেই গোশালার অভ্যন্তরে বিশালকায়া তেলেঙ্গা গাভীগণের মধ্যে মহাপ্রভু কূর্মাকারে পড়িয়া আছেন, আর গাভীগুলি জিহ্বা প্রসারিত করিয়া সস্নেহে তাঁহার রোমাঞ্চিত কলেবর লেহন করিতেছে।—

পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল॥

সেই অচেতনাবস্থায় তাঁহাকে ভক্তবৃন্দ সযত্নে গৃহে লইয়া যান ও বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। তিনি তখন বলেন, গৃহমধ্যে বসিয়া তিনি সহসা শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সেই ধ্বনির পশ্চাতে ছুটিয়া বাহির হন, গৃহের দ্বার বা দেওয়াল বিষয়ে কোনই জ্ঞান তখন নাই। সেই মনোহর বংশীরবের অনুসরণ করিয়া তিনি ছুটিতে ছুটিতে একেবারে বৃন্দাবনের কুঞ্জ-কাননে গিয়া উপনীত হন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সঙ্কেতে শ্রীরাধা সখীবৃন্দসহ সেই কুঞ্জে আগমন করেন ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের লইয়া কুঞ্জকুটীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হন। তিনি তাঁহাদের আর দেখিতে পান না বটে, কিন্তু তাঁহাদের হাস্য-পরিহাস, অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি ও ভূষণাদির নিক্কণ তাঁহার কর্ণযুগলের পরম তৃপ্তিসাধন করে। কিন্তু এমন সময়ে ভক্তবৃন্দের কোলাহলে তাঁহার সেই সুমধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া তিনি অতিশয় আক্ষেপ করিতে থাকেন।

মহাপ্রভুর সমুদ্রপতন

অতঃপর শরৎকাল আসিলে একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে উজ্জ্বল-জ্যোৎস্না-রাত্রে সমুদ্রতটের দিকে ভ্রমণে বহির্গত হন। পথিপার্শ্বস্থ পুষ্পকাননগুলি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বৃন্দাবনের কথা জাগিয়া উঠে। ভাগবতের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া তিনি সেইগুলির মধ্যে মনের আনন্দে বিহার করেন। আইটোটা নামক স্থানের একটি উদ্যান হইতে সমুদ্রের জলরাশি অদূরে দেখিতে পাইয়া, তিনি উহাকে যমুনা-নদীর বারিরাশি বলিয়া ভ্রম করেন ও সহসা সেইদিকে ছুটিয়া যান। তাঁহার সঙ্গীদের কেহই তাহা লক্ষ্য করেন না, কারণ তাঁহারাও ভক্তিভাব-বিহ্বল হইয়া নৃত্য-গীতে মগ্ন। ইত্যবসরে—

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈলা মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
... ...
কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায়॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥

বহুক্ষণ পরে স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন ও তাঁহাকে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ক্রমে রজনীর অবসান হইয়া যায়, তথাপি মহাপ্রভুর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন তাঁহারা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নিদারুণ হাহাকার করিতে থাকেন। এমন সময়ে উষাকালের অস্পষ্ট আলোকে সমুদ্রতটের দিক হইতে জনৈক ধীবর উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে ও মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে থাকে। সে যখন সমুদ্রের জলে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরে, তখন একটি মৃত নরদেহ তাহার সেই জালে আবদ্ধ হয়। সেই অচেতন দেহটাকে জাল হইতে ছাড়াইতে গিয়া সে উহাকে স্পর্শ করিয়া ফেলে,—আর উহারই ফলে সে ঐরূপ উন্মাদের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ভক্তবৃন্দ স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারেন যে, ঐ মৃতব্যক্তি আর কেহ নহে,

স্বয়ং মূর্চ্ছিত মহাপ্রভু। তখন তাঁহারা দ্রুতবেগে সমুদ্রতটের সেইস্থানে গিয়া উপনীত হন। মহাপ্রভুর অর্ধশরীর সাগরজলে ও অর্ধশরীব বালুকাতটে পড়িয়া রহিয়াছে, দেহের অস্থিসন্ধিগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে, হস্তপদ দীর্ঘতর হইয়াছে, দেহের চর্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও স্থানে স্থানে কর্দম লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ঐরূপ মৃতপ্রায় দুরবস্থা দেখিযা ভক্তবৃন্দের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যায়! তাঁহারা ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে উঠাইযা আনিয়া সন্নিকটস্থ শুষ্ক স্থানে স্থাপন করেন, কারণ বেশী দূর বহন করিয়া লইলে দেহটি ছিন্নভিন্ন হইযা যাইবে বলিযা আশঙ্কা হয়। তাঁহাকে শুষ্ক বসন পরাইযা ও তাঁহার সর্বাঙ্গ সুপরিষ্কৃত করিয়া তাঁহারা ব্যাকুলভাবে হরিনাম-সংকীর্তন করিতে থাকেন। বহুক্ষণ পবে তিনি হুংকার দিযা উঠিয়া বসেন ও বিস্মিতভাবে স্বরূপাদির দিকে তাকাইয়া রহেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে বৃন্দাবনের দিব্যদৃশ্য অপসৃত হইয়া যাওয়ায় তিনি বড়ই বিমর্ষ হইযা পড়েন। তিনি নাকি এতক্ষণ বৃন্দাবনের যমুনাকূলে দাঁড়াইযা গোপীগণ-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর জলকেলি দর্শন করিতেছিলেন। ক্রমশঃ মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন; কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধার ন্যায় তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণের সন্দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন, ভাগবতাদির শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া ও উহাদের ব্যাখ্যা করিয়া করিযা তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করেন; —তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে তিনি সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণেব সন্ধান করিয়া ফেরেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, নিদারুণ ক্ষোভে-দুঃখে তিনি মন্দিরের পাষাণচত্বরে তাঁহার মুখ ঘর্ষণ করেন। স্নান-আহার প্রভৃতির কথা তিনি বিস্মৃত হইয়া যান, উপবাস ও অনিদ্রায তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া পড়ে। তাঁহার তিরোধান-কাল যে ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই চৈতন্যভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার তিরোধানের কথা ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন নাই। মহাপ্রভু তখন ইহজগতে থাকিলেও, তাঁহার মানস-বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে তিনি সর্বক্ষণ বিহার করেন,—যমুনার প্রবাহে গোপীদের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের জলকেলি দেখেন, কুঞ্জকুটিরে রাধা-কৃষ্ণের নিভৃত আলাপনের সুমিষ্ট গুঞ্জন তিনি অন্তরালে দাঁড়াইয়া শোনেন। তাঁহার সেই অপূর্ব দিব্যলোকের মানস-বিহারের বিচিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিয়া কৃষ্ণদাস তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থের সমাপন করিয়াছেন।

(৫) গোবিন্দদাসের কড়চা

'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বিষয়ক একখানি মুদ্রিত চরিতকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে অনেকেই জাল বলিয়া সন্দেহ করেন। ইহার প্রারম্ভে কবি যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি জাতিতে কর্মকার ও অর্থোপার্জনে অক্ষম। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে "নিগুর্ণ মূর্খ" বলিয়া গালি দিলে, তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহে ভৃত্যের কার্যে নিযুক্ত হন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তিনিও তাঁহার সঙ্গে নানাতীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ;—তাঁহার কথা 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' উল্লেখিত আছে। কিন্তু গোবিন্দদাসের নাম মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কাহারও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন স্থানেই তাঁহার নামোল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসকালে গোবিন্দদাস নামে এক পরিচারক সর্বদা তাঁহার সেবাযত্ন করেন। কিন্তু তিনি যে কোনকালে মহাপ্রভুর সহিত কোথাও যান, এরূপ কথা কোন চৈতন্যচরিতকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কড়চার ভাষাও অনেকটা আধুনিক। বর্তমানে ইহার কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। এই প্রকার নানাকারণে ইহার প্রামাণিকতা ও ইহার লেখকের অস্তিত্ব বিষয়ে সবিশেষ সন্দেহ জন্মে। তথাপি ইহার বহু মুদ্রিত সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় সর্বপ্রথম ইহা প্রকাশিত করেন। অতঃপর রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়দিগের দ্বারা ইহার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কাজেই ইহা জাল হইলেও, বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

গোবিন্দদাসের বিদ্যমানতা ও কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ থাকিলেও, এই গ্রন্থের রচনা যে মনোজ্ঞ ও কাব্যরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কবি তাঁহার পত্নীকর্তৃক মূর্খ বলিয়া তিরস্কৃত হইলেও, তাঁহার বক্তব্য তিনি সরল ভাষায় ও সরসভাবে ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থখানার সর্বত্র সরল ভক্তিভাবের একটি নির্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ

হইয়া রহিয়াছে। ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, মনোমধ্যে স্বভাবতঃই ঈশ্বরভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। হরিনামে মত্ত হইয়া গৌরসুন্দর পথে পথে নাচিয়া চলিয়াছেন, প্রেমের আবেগে বৃক্ষলতা জড়াইয়া ধরিতেছেন, যমুনা-ভ্রমে পথমধ্যবর্তী তটিনীতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন, প্রেমানুরাগে নারোজী, পন্থভীল প্রভৃতি দস্যুগণকে আলিঙ্গন করিতেছেন, আবার কখনও বা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন নির্ঝর-তটে যোগাসনে বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেবের এই সমুদয় লীলা ভক্তকবি আবেগময় ভাষায় প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার আরাধ্য গুরুদেবের মনোমোহন মূর্তি কাব্যের প্রায় প্রতিপত্রে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দৈবভাবময় অবস্থাগুলির যেরূপ নিখুঁত চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর!

নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে স্নানরত শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া গোবিন্দদাসের মনে যে অনির্বচনীয় মধুরভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি আবেগচঞ্চল হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন।—

ঘাটে বসি কতখানা ভাবিতেছি মনে।
হেনকালে শ্রীচৈতন্য আইলেন স্নানে॥
... ...
আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু॥
স্নান করি গোরাচাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তলরাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীল পদ্মদলসম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোলযুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট॥
... ...
ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে।
কি জানি কেমনভাব উপজিল মনে॥

কদম্বকুসুমসম অঙ্গে কাঁটা দিল।
থর থরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥
ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন।
ইচ্ছা অশ্রুজলে মুহি পাখালি চরণ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহ-পরিবার সম্বন্ধে গোবিন্দ লিখিয়াছেন—

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥
... ...
শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥
লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ।
মুঁহি হইলাম গিয়া চরণের দাস ॥
... ...
প্রতিদিন শচীদেবী করেন রন্ধন।
আনন্দে করে সবে প্রসাদ ভোজন ॥
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পাত্রে খাই বারমাস ॥
কি বলিব প্রসাদের নাহিক তুলনা।
অমৃত সমান হয় যার এক কণা ॥

কিন্তু নবদ্বীপের সুখের জীবনযাপন গোবিন্দের ভাগ্যে বেশীদিন ঘটে নাই। প্রায় বৎসরেক কাল পরে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস লইলে, গোবিন্দও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণভারতের নানা তীর্থে ঘুরিতে থাকেন। এই দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের কথাই কড়চার মূল বিষয়। বিভিন্ন স্থানে গৌরাঙ্গের নানাবিধ কার্যকলাপ ইহাতে প্রত্যক্ষপ্রায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ পর্যটনকালে মহাপ্রভুকে লইয়া কোথায় কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, সেগুলির বিবরণ ভক্ত-অনুচর তখনই যেন "নোট" করিয়া রাখিয়াছেন। সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম ধনী নবীন

সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বেঙ্কট-নগরের নিবিড় অরণ্যে তাঁহার উচ্ছ্বাসময় হরিনাম-কীর্তনের প্রভাবে পাপিষ্ঠ পন্থভীল-দস্যু সদলবলে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়। গুর্জরী-নগরে তাঁহার অলৌকিক ভাবের প্রভাবে শত শত নরনারী বিমুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহে, এবং গোবিন্দও সেদিন মহাপ্রভুর অপূর্ব মাধুরিমা পরম বিস্ময়ের সহিত দেখেন।—

প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত।
আজি কিন্তু দেহ মোর হইল পুলকিত॥
.
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া॥
. . ..
প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুহি দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥
ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে।
নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে॥
... .
এইরূপ হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে॥
এলাইল জটাজূট খসিল কৌপীন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ যেন অতি দীন॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া।
ভূমির উপরে তবে পড়ে আছাড়িয়া॥

গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের নিত্যসহচর হইলেও, ধ্যানমগ্ন নবীন সন্ন্যাসীর

অলৌকিক জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁহার মনে অনেক সময় ভীতির সঞ্চার করে। এই ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার ফলে তাঁহার বর্ণিত দৃশ্য মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।—

একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী-বনে।
ভিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন।
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥
ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিতেছে গৌরাঙ্গ সুন্দব॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হইতেছে তেজ 'রাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্তাকর্ষক ঘটনার সমাবেশে কড়চাখানি সহজেই পাঠকেব মন মুগ্ধ করে। ইহার নানাস্থানে প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যের মনোহর বর্ণনা আছে। কবির এই বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। নীলগিরি-পর্বতমালা ও তাম্রপর্ণীর নিকটস্থ বিশাল সমুদ্রের চিত্র অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। নীলগিরি-বর্ণনার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি-বন্ধন॥
ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে।
নানা জাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ধগ্ ধগি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে।
তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা-পূজা করে॥ •

নিম্নলিখিত সমুদ্র-বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহাতে অসীম সাগরের অনন্ত সৌন্দর্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।—

তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥

কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই।
পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥
হু হু শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক কথা সকলি সুন্দর॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাস নিজের কথাও কোন কোন স্থানে, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ দুই-একটি বাক্যের দ্বারা তাঁহার চরিত্রের যে সামান্য অংশ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পাঠককে মুগ্ধ করে। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় বিষয়-বিরাগী সংযতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ তিনি নহেন; কাজেই নানাস্থানের নানাবিধ বিষয় তাঁহাকে সহজেই বিচলিত করিয়াছে। স্বীয় চরিত্রের এই দুর্বলতা তিনি স্থানে স্থানে অকপটভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পূজার পূর্বেই ভোগরন্ধনের সুগন্ধে তাঁহার ক্ষুধার্ত মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও একটা পরেটা ফল বা একটা লাড্ডু দেখিয়া তাঁহার মনে খাইবার লোভ জন্মিয়াছে, আবার কোথাও ভিক্ষাব অভাবে অনাহারে থাকিতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার মন চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার অভিমানশূন্য সরল চরিত্রটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার দীনভৃত্যও চিরদিনের মত সংসার ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহার মনে কোনদিন সেজন্য কোনরূপ অহংকার জন্মে নাই। বরং দয়াময় ঈশ্বরের কৃপাতেই তাঁহার মত অধম ভক্ত যাবতীয় মায়ামোহ হইতে সহজে পরিত্রাণ পায়—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

গৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছানুক্রমে তাঁহার স্বগ্রাম কাঞ্চননগরের নিকট দিয়া যাইবার সময় তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী তাঁহাকে সজল-নয়নে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আগমন করেন; তখন তিনি মনে মনে হরিনাম জপ করিয়া মায়াময় সংসারের সুখভোগের আশা সহজেই ছিন্ন করেন।—

মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি॥
হরির স্মরণে কাটে যতেক বন্ধন।
তেকারণে মনে করি হরির চরণ॥

[৩] মঙ্গলসাহিত্য

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে যে এক নবজাগরণ ঘটে, তাহার প্রভাব কেবলমাত্র বৈষ্ণব-সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না,—বঙ্গীয় সমাজের সর্বত্রই তখন এক প্রবল সাড়া পড়িয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরা যখন সোৎসাহে গৌরপদ, চরিত-কাব্য ও রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করিতেছেন, তখন অপর কবি-বৃন্দ পূর্বকালের চণ্ডী, মনসা, শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর মহিমা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে মনোহর কাব্য-রচনায় যত্নবান হইতেছেন। একদিকে গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের লেখনীতে পূর্বযুগের রাধাকৃষ্ণলীলা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মানুসারে নবভাবে কীর্তিত হয়, অন্যদিকে মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, দ্বিজ বংশীদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির প্রতিভালোকে চণ্ডী-মনসাদি লৌকিক দেবদেবীর প্রাচীন কাহিনী নূতনরূপে সংস্কৃত হয়। যে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী অতীত যুগে কিশোর-কিশোরীর সানুরাগ প্রেমলীলারূপে বর্ণিত, চৈতন্যযুগে তাহা প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রতি পরম ভক্তের আন্তরিক আরাধনা-রূপে গৃহীত হয়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী এই যুগে দেবলীলায় পরিণত হয়; কিন্তু চণ্ডী-মনসাদির কাহিনীতে সেইরূপ বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পূর্ববর্তী কবিদিগের মঙ্গল-কাব্যে যাহা কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে, সেগুলি সংশোধন বা সম্পূর্ণ করিতেই যেন এই যুগের মঙ্গল-কবিরা অগ্রসর হন। "কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি অনুবাদলেখকগণ ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশী দাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণের হস্তে,—দ্বিজ জনার্দন, বলরাম কবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের হস্তে,—এবং কাণা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রভৃতি লেখকবর্গ কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ দাস প্রভৃতি এক গোষ্ঠী নূতন মনসার-ভাসান-রচকের হস্তে এই যুগে নবজীবন লাভ করিলেন।"[১]

এই যুগে চণ্ডী ও মনসার সহিত আর অনেকগুলি দেবদেবীর মহিমা-সূচক মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়; যথা—শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি। শ্রীমদ্ ভাগবত,

১ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বন করিয়া 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'গোবিন্দমঙ্গল' প্রভৃতি নামে কতিপয় গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু ইহারা যথার্থ 'মঙ্গল-কাব্য' নয়। কালিকামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নয়;—একমাত্র ধর্মমঙ্গল, 'মঙ্গল-কাব্যের' অন্তর্গত। রূপরাম, সীতারাম দাস, শ্যাম পণ্ডিত, রামদাস আদক প্রভৃতি এইযুগে ধর্মমঙ্গল-কাব্য-রচনার সূত্রপাত করেন, এবং পরবর্তী যুগে ঘনরাম চক্রবর্তীর দ্বারা উহা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই যুগের 'শিবায়ন'-লেখকদিগের মধ্যে দ্বিজ রতিদেব, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র ও দ্বিজ শঙ্করের নাম করা যাইতে পারে। পরবর্তীযুগে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের হস্তে ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

১। চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে চণ্ডীদেবীর মহিমা-জ্ঞাপক দুইটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়—কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী। এই দুই কাহিনীর মধ্যে পরস্পর কোনই সম্বন্ধ নাই;—তবে উভয় আখ্যান-মধ্যেই চণ্ডীদেবীর কৃপায় কল্পনাতীত সৌভাগ্যলাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতু ও ধনপতি উভয়েই চণ্ডীদেবীর অনুগ্রহে চরম দুরবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরম সুখময় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন। এইরূপে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিয়া কবিবৃন্দ মনোহর কাব্য রচনা করেন। কালকেতুর বিপুল বাহুশক্তি, ফুল্লরার অসীম সহনশীলতা ও ভাঁড়ুদত্তের অপূর্ব ধূর্ততা প্রভৃতি চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম কাহিনী রচনার উপকরণ জোগাইয়াছে। ধনপতি সদাগরের অনির্দেশ বাণিজ্য-যাত্রা, বিরহ-বিধুরা খুল্লনার মর্মান্তিক দুর্দশা, পিত্রানুসন্ধানী শ্রীমন্তের অটল তেজস্বিতা প্রভৃতি চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীটিকে মনোহর কাব্যে পরিণত করিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের অন্তর্গত কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যানের সূত্রপাত সম্ভবতঃ সুদূর অতীত কালে ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কোন উপাখ্যানই কাব্যাকার প্রাপ্ত হয় নাই। মাণিক দত্ত ও জনার্দন গৌড়ীয় যুগে এই দুই কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনাকে ব্রতকথা মাত্র বলা যাইতে পারে, উহাতে কাব্যোচিত

মনোহারিতার নিতান্ত অভাব। মাধবাচার্য ও মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভাবলে ক্রমে এই ক্ষুদ্র ব্রতকথা বৃহৎ মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়। এই দুই কবির কাব্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এবং উভয় কবিই প্রায় সমসাময়িক। তবে, মাধবাচার্যের কাব্য পূর্বে রচিত হয়; এইহেতু মুকুন্দরাম মাধবাচার্যের কাব্যের উন্নতি সাধন করিয়া অদ্বিতীয় চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিবার সুযোগ পান। এই কারণে মুকুন্দরামের যশঃপ্রভাবে মাধবাচার্য কালক্রমে অনেকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়েন।

(১) মাধবাচার্য

কবি তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মোগল-সম্রাট আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তাঁহার পিতা পরাশর আচার্য পঞ্চগৌড়ে ত্রিবেণীর সন্নিকটে গঙ্গাতটবর্তী সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। কবি আকবর বাদশাহকে বিক্রমে অর্জুন, জ্ঞানে বৃহস্পতি ও প্রজাপালনে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা পরাশর যাগযজ্ঞে ও জপতপে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পরোপকার ও অর্থদানে কল্পতরু এবং মান-মর্যাদায় সর্বজন-পূজিত মহাশয়।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন-অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধ্যে সম সুরগুরু॥
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥

মাধবাচার্য সম্ভবতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গমন করেন এবং ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনানদীর তীরে নবীনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এইহেতু, তাঁহার কাব্য একদা পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হয়। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচনা করেন ;—উহা 'দুর্গামাহাত্ম্য' নামে পরিচিত। কাব্যের কোন কোন স্থলে কবি নিজেকে 'দ্বিজ মাধব' ও তাঁহার কাব্যকে 'সারদামঙ্গল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

সারদা-মঙ্গল দ্বিজ মাধবে রস গায়।

মাধবাচার্য বাস্তব-কবি। তাঁহার কাব্যের কাহিনী তিনি অসভ্য কিরাত-পল্লী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু তাঁহার বর্ণিত বিষয়বস্তু সুসভ্য পাঠকের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

দুর্গামাহাত্ম্য

তথাপি তাঁহাব স্বাভাবিক বর্ণনাগুণে তাঁহার কাব্যখানি বসিক পাঠকেব মনোযোগ আকর্ষণ কবে। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই অবিকৃতরূপে অঙ্কন কবিয়াছেন, উহাকে কোনরূপ মার্জিত করিতে বা উহার উপরে কোনরূপ রং ফলাইতে প্রয়াস পান নাই। সাধারণতঃ প্রকৃতিব কোন বস্তুকে কাব্যে চিত্রিত করিতে গেলে, উহাতে কিঞ্চিৎ বিকৃতি স্বতঃই আসিষা পড়ে। কিন্তু মাধবের রচনায় এই প্রকাব কোন কৃত্রিমতা বা জড়তা কোথাও নাই। তাঁহার এই সহজ সরল অবিকল আলেখ্য অঙ্কনের ক্ষমতাই তাঁহার কাব্যখানিকে অমরতা দান করিয়াছে। তাঁহার কাব্যে বর্ণিত ব্যাধেরা গ্রাম ও নগরের বাহিরে নিবিড় অরণ্যে বাস করে। এই আরণ্য অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যের মনোহর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের নায়ক কালকেতু-ব্যাধ ও নায়িকা ফুল্লরা প্রকৃতির সন্তান ; তাহারা আশৈশব প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত। তাই সভ্য মানব-সমাজের কৃত্রিম পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা তাহাদের চরিত্র বিন্দুমাত্র বিকৃত হয় নাই ; তাহাদের চিত্তে প্রতারণা ও কুবুদ্ধির উদয় ঘটে নাই। এই অসভ্য ব্যাধদিগের যথাযথ চিত্র কবি স্বল্প কথায় সুন্দরভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। যথা—

ছুলি পেলি খেলী আইল ব্যাধ ঘরে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে ॥

কালকেতু-উপাখ্যান

এই বর্বর কিরাতকুলের মধ্যে ধর্মকেতুর গৃহে কালকেতু জন্মগ্রহণ করে। সে বাল্যাবধি অতিশয় বলিষ্ঠ, ধনুক-বাঁটুল প্রভৃতি চালনায় সুদক্ষ ;—তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহার সঙ্গে খেলাধূলায় বা পশু-শিকারে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। সে বায়ুবেগে দৌড়াইয়া ক্ষিপ্রগামী শশক ধরিয়া ফেলে; ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, বিশালকায় হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া টানে। কবি তাহাকে বাল্যকাল হইতেই অমিত বাহুবলশালী মহাবীররূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।—

তবে বাড়ে বীরবর জিনি মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে।
যতেক আখেটিসুত তারা সব পরাভূত
খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥
বাটুল বাঁশ লয়ে করে পশুপক্ষী চাপি ধরে
কাহার ঘরেতে নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি থাকয়ে মারয়ে পাখী
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥

একাদশ বৎসর বয়সে কালকেতু, ফুল্লরা নামে এক মনোরমা ব্যাধ-কন্যাকে বিবাহ করে। ফুল্লরা নিতান্ত সরলা, গৃহকর্মে সুনিপুণা ও দুঃখকষ্ট-সহনশীলা। কালকেতুর সংসার অভাবে ভরা, কিন্তু ফুল্লরার গুণে তাহা নিবিড় শান্তিতে পরিপূর্ণ। লোক-বিরল অরণ্য-প্রান্তরে তাহাদের ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, প্রতি বৎসর বৈশাখী ঝড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, বর্ষাকালে তাহার ভিতরে একহাঁটু জল জমে। ভোগ-বিলাসের কোন উপকরণ তাহাদের নাই, শারদীয়া পূজার নূতন বসন-ভূষণ ফুল্লরা পরিতে পায় না, দারুণ শীতের রাত্রে ধূলিময় ছিন্ন ছালা সে গায়ে দেয়। মহাবীর কালকেতু ধনুর্বাণের দ্বারা পশুকুল বধ করে; সেই পশুর মাংস, চর্ম, নখ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোনক্রমে তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হয়। তথাপি পতিপ্রাণা ফুল্লরা সরলমতি কালকেতুর অগাধ প্রেম লাভ করিয়া সানন্দে জীবন যাপন করে।

এদিকে অরণ্যের পশুগণ মহাধনুর্ধর কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতা চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হয়। তখন চণ্ডীদেবী তাহাদিগকে নিবিড়

অরণ্যে লুকাইয়া রাখেন। কালকেতু ধনুর্বাণ লইয়া সারাদিন বনে বনে ঘুরিয়াও কয়েকদিন কোনই মৃগ বধ করিতে পারে না। একেবারে অনাহারে তাহাদের দিন কাটিতে থাকে। একদিন ক্ষুধাতুর কালকেতু অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিতেই একটা স্বর্ণ গোধিকা দেখিতে পায়। ইহাতে তাহার সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া যায়, কারণ গোধিকা-দর্শন শুভজনক নয়। সেদিনও সে সারা বন অনুসন্ধান করিয়া একটা পশুরও সন্ধান পায় না। তখন সে ক্ষুব্ধ মনে সেই গোধিকাটাকেই ধনুকের গুণে বাঁধিয়া নিজগৃহে লইয়া যায়। উহার মাংস দিয়াই সে সেদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। ফুল্লরাকে কোন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে কিছু চাল ধার করিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিয়া, সে বাসি মাংসের পসরা মাথায় লইয়া হাটে চলিয়া যায়।

তাহাদের অনুপস্থিতি-কালে সেই স্বর্ণ গোধিকাটি এক পরমাসুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে। স্বয়ং চণ্ডীদেবী ঐ গোধিকার রূপ ধরিয়া তাহাদের গৃহে আসিয়াছেন। ফুল্লরা গৃহে ফিরিয়া অতীব বিস্মিত হয় ও সভয়ে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, কালকেতু তাহার গুণের দ্বারা তাঁহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে; তাহার কুটীরেই তিনি এখন বাস করিবেন। ইহা শুনিয়া ফুল্লরার মুখ শুকাইয়া যায়। এই অসামান্যা রূপসী তাহার অখণ্ড পতিপ্রেমে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে দেখিয়া সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়ে। সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও যথাসাধ্য নৈতিক উপদেশ দিয়া, সে তাঁহাকে পর-পুরুষের গৃহবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তাহাতে তিনি প্রস্থান করেন না দেখিয়া সে তাহাদের সংসারের দুরবস্থার কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে থাকে। এই স্থানে কবি ফুল্লরার মুখ দিয়া তাহাদের সম্বৎসর সংসার-যাত্রার এক সকরুণ বিবরণ দিয়াছেন। এইরূপ বিবরণকে "বারমাস্যা" বলে। ইহাতে নায়িকার বারটা মাসের প্রতিটি মাস কিভাবে কাটে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। ইহা মঙ্গলকাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য। ফুল্লরার বারমাস্যার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে স্থান নাই ঘরে হাঁটু পানি॥
... ...

ভাদ্র মাসেতে কন্থা বিদ্যুৎঝঙ্কার।
হেনকালে যাই আমি মাথাতে পসার॥
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার।
... ...
ফাল্গুন মাসেতে সাজি আইল রতিপতি।
নিজ পরিবার লয়্যা সখার সঙ্গতি॥
কামিনী করয়ে কেলি প্রভু লয়্যা পাশে।
হেন সময়ে যায় বীর অরণ্যপ্রবাসে॥

এত কথা বলিয়াও ফুল্লরা যখন সেই পরমা সুন্দরীকে দূর করিতে পারে না, তখন সে সজল নয়নে তাহার স্বামীর নিকটে ছুটিয়া যায়। কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখে সেই রূপসীর অঙ্গচ্ছটায তাহার গৃহপ্রাঙ্গণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বিনীতভাবে তাঁহাকে নিজের গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করে। পর-গৃহে বাস যে সতী-নারীর পক্ষে ঘোরতর পাপ, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু তবু তিনি নিশ্চল রহেন দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে ও ধনুকে শর জুড়িয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হয। এইবার চণ্ডীদেবী নিজ পরিচয় দান করেন ও কালকেতুর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মহিষমর্দিনী-রূপ প্রদর্শন করেন। তাহাদের দারিদ্র্য দূর করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে সাতঘড়া স্বর্ণমুদ্রা ও একটি অমূল্য হীরকাঙ্গুরী দান করেন। উহার দ্বারা কালকেতুকে গুজরাটের অরণ্যময় অঞ্চলে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিয়া, তিনি অন্তর্হিত হন।

এই স্থানে বাস্তব-কবি এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা কাব্যের বাস্তবতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মহামায়ার কৃপায ধনুর্ধারী ব্যাধ সহসা নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজ্যেশ্বর হয় বটে, কিন্তু তাহার আরণ্য জীবনের সহজ বুদ্ধি ও সরল চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই।

রাজা কালকেতু নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলে, নানা জাতীয় লোক নানান্ দেশ হইতে তথায় বাস করিবার জন্য আসিতে থাকে। এই সময়ে ভাঁড়ু দত্ত নামে এক ধূর্ত কায়স্থ সেখানে সপরিবারে বাস করিতে আসে। সে কালকেতুর নিকট একেবারে মন্ত্রী-পদ চাহিয়া বসে। এই ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র-চিত্রণে মাধবাচার্য আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাঁড়ু দত্ত জীবন্ত ধূর্তরূপে

অঙ্কিত হইয়াছে। সে ধূর্তের শিরোমণি। কাণাকড়ির থলি দেখাইয়া দোকানদার ঠকাইয়া সে নানা দ্রব্য সংগ্রহ করে, লোকের নিকট ঘোর অপমানিত হইয়া হাস্য-পরিহাস বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করে, এবং মিথ্যা কথা বলিয়া তীর্থে তীর্থে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে। তাহার চরিত্রাঙ্কনে কবি কিঞ্চিৎ অসংযম বা আতিশয্য প্রকাশ করিলেও, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্তিভাব ও ধার্মিকতার একঘেয়েমির মধ্যে তাহার প্রতারণাময় জীবন-কাহিনী বেশ উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। ভাঁড়ু দত্তের প্রার্থনা কালকেতু পূর্ণ না করায়, সে রাজাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয় এবং ভয় দেখাইয়া বলে—

পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।

তাহার এইরূপ ধৃষ্টতায় প্রহরীবৃন্দ তাহাকে ভূপাতিত করিয়া নির্মমভাবে প্রহার করে। সে কিন্তু ধূলিময় দেহে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে বলে, রাজা তাহাকে প্রিয় বন্ধুরূপে বরণ করিয়াছে। তাহারা উভয়ে পাশা খেলিতে বসিলে রাজা হারিয়া যায় ও অধৈর্য হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ফলে, উভয়ে ঘোরতর হুড়াহুড়ি হয় ;—তাই তাহার অঙ্গে ধূলা লাগিয়াছে।—

ভাঁড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তয়।
দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়॥
ভাঁড়ুএ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা।
মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটী হারি।
বসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি॥
ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস।
বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ॥
কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্ম্য।
যাহার পিরীতে বশ হইল ভাঁড়ু দত্ত॥

কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত কেবলমাত্র ধূর্ত নহে, সে ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে কলিঙ্গরাজের নিকট কালকেতুর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা সংবাদ দিয়া আসে, যাহার ফলে, কলিঙ্গরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধশেষে উভয়

নৃপতি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ভাঁড়ু দত্তের মস্তক মুড়াইয়া ও ঘোল ঢালিয়া তাহাকে গঙ্গার পরপারে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু ধূর্ত-শিরোমণি গঙ্গা পার হইয়া—

লোকের সাক্ষাতে ভাঁড় কহে মিথ্যা কথা।
গঙ্গাসাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা॥
এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে।

লোক-বিরল মহারণ্যের মহাবলশালী ব্যাধ ও তাহার ধৈর্যশালিনী জীবন-সঙ্গিনী রূপে কালকেতু-ফুল্লরার অমার্জিত আচরণ আমাদিগকে যেরূপ বিমুগ্ধ করে, বহুজনসমাগমের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্যশালী রাজা ও রাণীর রূপে তাহাদের শঙ্কিত-ভীত আড়ষ্ট আচরণ আমাদের মনকে সেরূপ আকর্ষণ করে না। কলিঙ্গ-রাজ-সৈন্যদলের প্রথমবার আক্রমণকালে কালকেতু পূর্বের মতই নির্ভীক পৌরুষের পরিচয় দিলেও, তাহাদেব দ্বিতীয়বার আক্রমণে সে পত্নীর পরামর্শে ধানের গোলার মধ্যে আত্মগোপন কবে। বাঙ্গালাব গৃহস্থের ন্যায তাহাব এইপ্রকার গৃহিণী-বশ্যতা দর্শন করিযা আমাদের মন ক্ষুব্ধ হয়, এবং ফুল্লরাকেও বঙ্গপল্লীর পতিমঙ্গলকামী শঙ্কাকুলা কুলবধূ বলিয়া ভ্রম হয়। তবে, সমাজ ও ধনেব সংস্পর্শে মনুষ্যের সজীবতা যে বিশুষ্ক হইয়া যায, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে কাব্যের নাযক-নায়িকাকে কবি অবশেষে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই রাজৈশ্বর্যই যে তাহাদের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইতেছে, কলিঙ্গ সৈন্যদলের আক্রমণকালে ফুল্লরার আক্ষেপের মধ্যেও তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে ;—“প্রভু হে কিসেরে লইলা দেবীর ধন।”

কলিঙ্গ-সৈন্যদল প্রথমবার আক্রমণ করিলে, পরাধীনা দুর্বলা বঙ্গললনার ন্যায় ফুল্লরা কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিরীহ বাঙ্গালীর মত নির্বিবাদে বাঁচিয়া থাকিতে পরামর্শ দেয়।—

আমার বচন ধর অহঙ্কার দূর কর
লও গিয়া রাজার শরণ।
তুষ্ট হলে মহাশয় কাররে নাহিক ভয়
দুয়ারে পাইবা সর্ব্বজন॥

কিন্তু সিংহতুল্য বলশালী কালকেতু ইহাতে অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।—

শুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর
করে লৈয়া শরগাণ্ডী পুজিব মঙ্গলচণ্ডী
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর।

সে অমিত বলবিক্রমে তাহার সুদৃঢ় গাণ্ডীব হইতে সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া শত্রুদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। তাহার দুর্বার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু সুচতুর ভাঁড়ু দত্তের জ্বালাময় বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তাহারা পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কালকেতুর প্রাসাদ আক্রমণ করে। এইবার ফুল্লরা স্বল্পবুদ্ধি বঙ্গবধূর ন্যায় রামায়ণ হইতে সুগ্রীবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কালকেতুকে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করে। এইরূপে স্ত্রীবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে অবশেষে বিপক্ষের হস্তে বন্দী হয়।

কলিঙ্গ রাজার বন্দীশালায় সে সকাতবে তাহার আরাধ্যা দেবী চণ্ডীমাতার স্তব করে ও তাঁহারই মহিমায় সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে সে মুক্তি পায়।

ধনপতি-উপাখ্যান

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় উপাখ্যানটিও মাধবাচার্য অক্ষুণ্ণ দক্ষতার সহিত রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক ধনপতি সদাগর বিবাহিত যুবক; তাঁহার স্ত্রীর নাম লহনা। তিনি একদিন কপোত লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে খুল্লনা নামে এক নিরুপমা সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হন ও তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু লহনা যদি ইহাতে অসন্তুষ্ট হয়,—এই আশঙ্কায় তিনি চতুরতার সহিত তাহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, তাহার সেবার জন্য একটি দাসী তিনি আনিতেছেন।—

যুক্তি যদি দেহ মনে কহিবে প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী॥
বরিষা বাদলেতে উননে পাড় ফুঁক।
কর্পূর তাম্বূল বিনা রসহীন মুখ॥

সরলমতি লহনা স্বামীর অভিপ্রায়ে কোনরূপ বাধা দেয় না। তাহার আচরণ মধুর হইলেও, তাহার বুদ্ধি অতীব স্থূল। সে অতি-সহজে অন্যের

দ্বারা চালিত হয় ও পরের প্ররোচনায় নিতান্ত গর্হিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়। বিবাহের পর খুল্লনাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ধনপতি বাণিজ্য-ব্যপদেশে দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসে গমন করেন। সে অতিশয় আদর-যত্নে তাহার তরুণী সতীনকে লালন-পালন করিতে থাকে। কিন্তু দুই সতীনে এইরূপ অসাধারণ সদ্ভাব দেখিয়া, তাহাদের দুর্বলা-নাম্নী দাসী উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি করিবার জন্য কৌশল খুঁজিতে থাকে। এই দুর্বলার চরিত্র রামায়ণ-বর্ণিত মন্থরাদাসীর অনুরূপ। সে লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে গিয়া বলে,—

ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥
কলাপী-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ-পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
... ...
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন।
খুল্লনার রূপ দেখি হইবেন অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥

এইবার সরলে গরল প্রবেশ করে। দুর্বলার কুপরামর্শে লহনা উন্মাদিনী হইয়া উঠে ও খুল্লনার উপরে কঠোর নির্যাতন আরম্ভ করে। খুল্লনা আর সদাগরের অট্টালিকায় স্থান পায় না, পশুশালায় মলিন শয্যায় তাহাকে রাত্রি যাপন করিতে হয় এবং দিনের বেলায় মাঠে মাঠে ছাগল চরাইয়া বেড়াইতে হয়। তাহার এই শোচনীয় দুর্দশার চিত্র কবি প্রত্যক্ষ-প্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

খুল্লনা বসিলা ছেলী থুইয়া অজাশালে।
মানের পাতেতে লহনায় ক্ষুদের অন্ন বাড়ে॥

অল্প অন্ন দিল ছেছা পোড়া বহুল।
পাট শাক রান্ধি দিল পাকা কলার মুল ॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বসে খুল্লনা বাণ্যানী ॥

এইরূপে সপত্নী-বিদ্বেষে সুকোমলা খুল্লনা দুঃসহ ক্লেশে পতিত হয; কিন্তু এই স্থান হইতেই তাহাব চবিত্র সমধিক বিকাশ পাইতে থাকে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা গৃহবধূ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিযা উন্মুক্ত প্রান্তবে আসিযা উপনীতা হইয়াছে। বন্যকুসুমের ন্যায় তাহার অঙ্গ-লাবণ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে। সুন্দরী যুবতী ছিন্নবাস পবিধান করিয়া, একপাল ছাগল লইয়া সুদূব মাঠে যাত্রা করিযাছে; তাহাব অপরূপ রূপ দেখিযা পথের পথিক প্রলুব্ধ হইতেছে। তাহাদেব লালসাময তীব্র দৃষ্টি হইতে সে অতিকষ্টে তাহাব দুই হাত দিয়া যৌবন-সৌন্দর্য ঢাকিয়া বাখিতেছে।—

নাগবিয়া ইতরগণে অনিমিখ দু নযনে
নিরখি খুলনার রূপ চায়।
কেহ বলে কার নারী কেন বা এমত করি
কাহার রমণী কোথা যায় ॥
বামা হেট মুণ্ডে কাঁদে কাতরে উত্তর না দে
ভুজ দিয়া কুচের উপব।
কাজলী ধবলী বলি চালায় সকলি ছেলী
এডাইল নাগরিয়া ঘর ॥

চঞ্চলস্বভাব ছাগ-পাল লইযা খুল্লনাকে অশেষ কষ্ট ভোগ কবিতে হয়। কোন্ ছাগল কোন্ দিকে পলাইযা যায়, তাহা সে ঠিক রাখিতে পারে না। ছাগলের পাল খেদাইতে গিযা সে নিজেই আছাড খাইয়া পডে। শৃগালের চীৎকার শুনিলে তাহাব অন্তর ভয়ে আকুল হইযা উঠে। বর্ষার দিনে তাহার দুঃখের সীমা নাই।—

বরিষাতে রাখে ছেলী লক্ষপতি সাধুর বালি
জলোকা বেষ্টিত সর্ব্ব গায়।
শিবা ডাকে চারিভিতে হয়ে বামা সচকিতে
সেইদিগে ধাইয়া ত যায় ॥

একদিন খুল্লনা একটা ছাগলের সন্ধান করিতে করিতে এক গভীর বনে প্রবেশ করে। তথায় কতিপয় মহিলাকে চণ্ডীদেবীর পূজা করিতে সে দেখিতে পায়। মঙ্গলময়ী চণ্ডীদেবীর পূজা করিলে ভক্তের অশেষ মঙ্গল হয়,—এইরূপ কথা তাহাদের মুখে শুনিয়া, সেও অতঃপর একদিন গভীর বনমধ্যে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত চণ্ডীদেবীর পূজা করে। তাহার সকাতর প্রার্থনায় চণ্ডীদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন ও তাহাকে পতিপুত্র লাভের বর দান করেন। তিনি স্বপ্নযোগে লহনাকে দেখা দিয়া খুল্লনার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে তাহাকে নিষেধ করেন, এবং প্রবাসী ধনপতি সদাগরকেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে স্বপ্নাদেশ দেন। তখন দৈবী-মহিমায় লহনা পুনরায় খুল্লনাকে পূর্বের ন্যায় স্নেহযত্ন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং ধনপতিও অচিরে স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। ধনপতি-উপাখ্যানের এই পর্যন্ত সুমধুর, ইহার পরবর্তী অংশ তেমন চিত্তাকর্ষক নয়।

অনন্তর ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ-কাল উপস্থিত হয়। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে কবি, রামায়ণের নায়িকার ন্যায়, তাঁহার কাব্যের নায়িকাকেও অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করাইয়াছেন। একদা খুল্লনা একাকিনী নির্জন অরণ্যে ছাগ-পাল চরাইয়া বেড়াইত, তাই তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ধনপতির স্বজাতিবর্গ সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হন। খুল্লনার পরীক্ষা অথবা এক লক্ষ টাকা দণ্ড তাঁহারা চাহিয়া বসেন। ধনপতি অকাতরে এক লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে খুল্লনা তাহাতে বাধা দেয়। সতীত্বের পরীক্ষা দিয়া সে তাহার আত্মমর্যাদা সকলের সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। তখন তাহাকে অগাধ জলে ডুবাইয়া, বিষধর সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া, জলন্ত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করিয়া ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখামধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিদারুণভাবে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়; কিন্তু সতীসাধ্বী খুল্লনা সকল পরীক্ষাতেই অক্ষত শরীরে পার হইয়া যায়। তখন সকলেই তাহার সচ্চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু হতভাগিনী খুল্লনার ভাগ্যে সুমধুর স্বামী-সহবাস দীর্ঘকাল ঘটে না। রাজভবনের জন্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত ধনপতি সদাগর অচিরে সিংহল-যাত্রা করেন। যাত্রা-কালে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া খুল্লনা ভক্তিভরে চণ্ডীদেবীর পূজা করে। ইহাতে ধনপতি অতিশয়

অসন্তুষ্ট হন। চাঁদ সদাগরের মত তিনিও পরম শৈব, "ডাকিনী দেবতা"—চণ্ডীর প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড ঘৃণা। তাই তিনি সক্রোধে চণ্ডীপূজার ঘটে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান। মনসাদেবীর মত চণ্ডীদেবীও এই ঘোর অপমানের প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করেন। উত্তাল-তরঙ্গময় অকূল সমুদ্রে ধনপতির ধনরত্নপূর্ণ ছয়টি বৃহৎ ডিঙ্গা তিনি জলমগ্ন করিয়া দেন এবং "কমলে কামিনী"-প্রপঞ্চ দেখাইয়া তাঁহার সর্বনাশের সূত্রপাত করেন। অনন্ত বারিধি-বক্ষে এক পদ্মকাননে জনৈকা পরমা সুন্দরী একটি বিশালকায় হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতেছে ও পুনরায় তাহাকে উদ্গীরণ করিতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যকে "কমলে কামিনী" বলে।

সিংহলে উপনীত হইয়া, তথাকার রাজাকে ধনপতি "কমলে কামিনী"র কথা বলেন। কিন্তু রাজা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তখন রাজা বাজী রাখেন—কমলে-কামিনী দেখাইতে পারিলে ধনপতি অর্ধরাজ্য পুরস্কার পাইবেন, কিন্তু দেখাইতে না পারিলে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবেন। রাজাকে লইয়া ধনপতি তরণীতে আরোহণ করিয়া, সমুদ্রের যেখানে তিনি কমলে-কামিনী দেখেন, সেইখানে গমন করেন। কিন্তু চণ্ডীদেবীর ছলনায় তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে সিংহলের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হয়।

এদিকে চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করে। সে ক্রমে বড় হইয়া পাঠশালায় পড়িতে থাকে। একদিন গুরুমহাশয়, তাহার পিতার সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া, তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন। তাহাতে সে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া, পিতার অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র-পথে সিংহল-যাত্রা করে। চণ্ডীদেবীর ছলনায় সেও তাহার পিতার ন্যায় অনন্ত লবণাম্বু-মধ্যে কমলে-কামিনী দেখিতে পায়। সিংহলে পৌঁছিয়া, তথাকার রাজাকে সেও কমলে-কামিনীর কথা বলে। রাজা তাহার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তিনি তাহার সহিত বাজী রাখেন—ঐ দৃশ্য দেখাইতে পারিলে তিনি তাহাকে অর্ধরাজ্য ও রাজকন্যা দান করিবেন, কিন্তু দেখাইতে না পারিলে দক্ষিণ মশানে তাহার মুণ্ডপাত করা হইবে। কিন্তু চণ্ডীদেবী তাহাকেও নিরাশ করেন; সে রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারে না। রাজার ঘাতকেরা তাহাকে বাঁধিয়া

শ্মশানে লইয়া যায় ও তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হয়। তখন সে একান্ত মনে চণ্ডীদেবীর স্তব করিতে থাকে। তাহার আন্তরিক প্রার্থনায় করুণাময়ী চণ্ডীদেবী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ভূতপ্রেত সেই মশানে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের দ্বারা নিদারুণভাবে প্রহৃত হইয়া রাজঘাতকেরা সিংহল-রাজার নিকট পলাইয়া যায়। অনন্তর চণ্ডীদেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইয়া অর্ধরাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করেন। সিংহল-রাজও সানন্দে তাহার পিতা ধনপতিকে কারামুক্ত করিয়া দেন। সুদীর্ঘকাল পরে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে, ও ধনপতি তাঁহার প্রিয় পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে করুণাময়ী চণ্ডীদেবীর পূজা করিয়া খুল্লনা অবশেষে পতিপুত্র ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য লইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করে।

(২) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

সমুদয় মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের অন্যতম। বৈষ্ণব-পদাবলী ও চরিত-কাব্যগুলির কথা বাদ দিলে ষোড়শ-শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে মুকুন্দরামের কাব্য।"[১] কাব্যের প্রারম্ভে কবি সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পূর্বতন ছয় সাত পুরুষ রত্নাম্বু-নদের তীরে বর্ধমান জেলার দামুন্যা-গ্রামে বাস করেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র এবং রামানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার মাতার নাম দৈবকী। শিবরাম নামে তাঁহার এক পুত্র ও যশোদা নামে এক কন্যা। তাঁহার পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা এবং জামাতার নাম মহেশ। তাঁহার বর্তমান বংশধরেরা বর্ধমানের রায়না-থানার অন্তর্গত ছোটবৈনান-গ্রামে বাস করিতেছেন।

মুকুন্দরামের কালে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল রাজা মানসিংহের শাসনাধীন ছিল। তৎকালে মামুদ সরিফ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে দামুন্যার প্রজাবৃন্দ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহার নির্যাতন সহ্য করিতে না

১ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

পাবিয়া মুকুন্দরাম সপরিবাবে জন্মভূমি পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য হন। অর্থাভাবে তাঁহাব দুঃস্থ পবিবার পথিমধ্যে দুঃসহ কষ্টে পতিত হয়। চণ্ডীমঙ্গলের পূর্বভাগে তাঁহার এই দুঃসময়েব কিঞ্চিৎ বিবরণ তিনি বাখিয়া গিয়াছেন।—

তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান কবিলুঁ উদক পান
শিশু কান্দে ওদনেব তবে।

যাহা হউক, তিনি অবশেষে মেদিনীপুব জেলাব অন্তঃপাতী আড়বা-গ্রামে উপনীত হন ও তথাকাব জমিদাব বাজা বাঁকুড়া বায়েব আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া বায তাঁহাকে তদীয় পুত্র রঘুনাথেব গৃহশিক্ষক-পদে নিযুক্ত কবেন। পরে রঘুনাথ বাজা হইলে, তিনি তাঁহাব আশ্রয়ে থাকিযা চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য বচনা কবিতে আবম্ভ কবেন, এবং আনুমানিক ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা সমাপন কবেন। তিনি তাঁহাব কাব্যখানিকে 'অভয়ামঙ্গল' নামে অভিহিত কবেন। কিন্তু তাঁহাব কবিত্বেব জন্য তিনি 'কবি-কঙ্কণ' উপাধি লাভ কবায়, তাঁহাব কাব্যখানিকে লোকে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' বলিয়া থাকে।

অভয়া-মঙ্গল

মুকুন্দবাম-বচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' একটা বিবাট কাব্য ;—ইহাতে কবি অক্লান্ত প্রতিভার পবিচয দিয়াছেন। তাঁহাব কাব্যেব কোন অংশই তিনি সংক্ষেপে বর্ণন কবেন নাই,—তাঁহাব সূক্ষ্ম দৃষ্টি ঘটনাবলীব সকল দিকেই নিপতিত হইয়াছে। নৈসর্গিক শোভা, বাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক আচবণ, জীবনযাপনের সুনীতি, পাবিবাবিক কলহ প্রভৃতি কোন কিছুই তিনি এডাইয়া যান নাই। কিন্তু বহু ঘটনাব সমাবেশ ঘটায কাব্যেব মূল আখ্যানটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবাব অবকাশ পায় নাই। তাঁহাব বর্ণন-কৌশল নাটকীয় ;—নানা ঘটনাব সম্পর্কে বিবিধ পাত্র-পাত্রীব উক্তির মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত কবিয়াছেন। মাধবাচার্যের মত তিনিও বাস্তব-কবি ;—মনুষ্য-সমাজে যাহা প্রকৃতই ঘটিতেছে, তাহাবই প্রতিচ্ছবি তিনি অঙ্কন করিযাছেন। মার্জিত ভাষা, ললিত ছন্দ, সংযত কল্পনা, সুযোগ্য অলঙ্কাব, সুন্দব রূপায়ণ ও সবস বর্ণন-ভঙ্গিমাব দ্বাবা বাস্তব ঘটনাকে তিনি নয়নরঞ্জনরূপে চিত্রিত করিযাছেন। এই আশ্চর্য মণ্ডন-ক্ষমতাব বলেই তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী মাধবাচার্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাব কাব্যে প্রায় সকল রসেরই সমাবেশ আছে ও উহাদের মধ্যে করুণরস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরাম অনেকাংশে মাধবাচার্যের অনুসরণ করিয়াছেন। মাধবের কাব্যের সহিত তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মাধবের কাব্যে যেখানে যে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহার কাব্যে তাহা সম্পূর্ণ, সুশোভন ও সরসভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মাধবের মুখরা ফুল্লরা ও নির্ভীক কালকেতু তাঁহার লেখনীতে যথাক্রমে লজ্জানতা ও ভীরুস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। ভাঁড়ু দত্তকেও তিনি মাধবের ন্যায় জীবন্ত ধূর্তরূপে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। মাধবের কালকেতুর ন্যায় তাঁহার কাব্য-নায়কও ব্যাধপল্লীতে লালিত-পালিত হইতেছে ও শৈশবকাল হইতেই অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। তৎকর্তৃক কালকেতুর বাল্যবর্ণনা মাধবের অনুরূপ হইলেও, তাঁহার বর্ণনা মাধবের বর্ণনাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয়।—

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি
সবার লোচন-সুখ হেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপ গুণ শীল নোড়া বাড়ে যেন হাতী কড়া
যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপালতটী গলায় জালের কাটী
কর জোড়া লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা
কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান রাঙ্গা ধুতি মস্তকে জালের দড়ি
শিশু মাঝে যেন মণ্ডল।

কালকেতুর বাল্যরূপ-পাঠে মনে হয়, মুকুন্দরাম যেন প্রকৃত ব্যাধশিশুকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার ফুল্লরা কৃষ্ণবর্ণা ব্যাধ-কন্যা ও ব্যাধের গৃহিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্তা।—

এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।

কালকেতু যৌবন প্রাপ্ত হইলে এই বুদ্ধিমতী ফুল্লরাকে বিবাহ করে। এই নবীন ব্যাধ-দম্পতির সাংসারিক জীবন কবি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কালকেতু একাধিক ভাণ্ড অন্নমাংস ভোজন করিয়া, তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া গৃহিণীকে বলে,—

রন্ধন করেছ ভাল, আর কিছু আছে ?

কালকেতুর বিক্রমে অরণ্যের পশুকুল অস্থির হইয়া উঠে। তাহারা চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হয়। এই স্থানে কবি ব্যাঘ্র-সিংহাদির মুখে মানব-ভাষা দান করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের দুরবস্থার দ্বারা তৎকালীন বাঙ্গালা-দেশের রাষ্ট্রীয়াবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তৎকালে দুর্দান্ত মুসলমানদিগের প্রবল প্রতাপে হিন্দু জাতি ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে। মোগল-সম্রাটের দক্ষিণবাহুস্বরূপ রাজা মানসিংহের সুদক্ষ রণপরিচালনায় হিন্দু ভূস্বামিবৃন্দ মোগলের পদানত হয়। মোগলের অগণিত সৈন্য ও বিপুল রণসম্ভারের সম্মুখে হিন্দুর শৌর্য-বীর্য ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পশুকুলের সহিত চণ্ডীদেবীর কথোপকথনের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

চণ্ডী।— আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ কে পায় তোমার লাগ
পবন জিনিতে পার জোরে
তব নখ হীরাধার দশন বজ্রের সার
কি কারণে ভয় কর নরে॥
ব্যাঘ্র।— যদি গো নিকটে পাই ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই
কি করিতে পারি আমি দূরে।
ব্যর্থ নহে তার বাণ একে একে লয় প্রাণ
দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে॥

ভারত-সম্রাট আকবর শাহের আমলে তাঁহার বিচক্ষণ রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমল্ল সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল স্থান পরিমাপ করিয়া রাজকর নির্ধারণ করিয়া দেন। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি হইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন রাজা-

জমিদার কাহারও রাজ্যই বাদ যায় না। ইতঃপূর্বে শুধু বৃহৎ রাজ্যগুলির উপরেই দিল্লীশ্বরের দৃষ্টি, ক্ষুদ্র রাজাদের বিষয়ে তিনি উদাসীন। এই কারণে তৎকালে বাঙ্গালাদেশে ছোট-বড় অনেকগুলি স্বাধীন রাজা ও রাজ্য। কিন্তু মানসিংহের শ্যেনদৃষ্টি হইতে সেগুলি অব্যাহতি পায় না; সুবিশাল মোগল-সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি সকলকেই পদানত করেন ও প্রত্যেকের নিকট হইতেই রাজকর আদায় করেন। দুর্গম গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষুদ্র রাজা এতকাল তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য ও স্বল্প প্রজাবৃন্দ লইয়া নির্বিবাদে রাজত্ব করিতেছেন, তিনিও মানসিংহের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পান না। ভল্লুকের খেদোক্তির মধ্যে তাঁহার দুর্দশার আভাষ পাওয়া যায়।—

বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥
সাত পুত্র মারে বীর বান্ধি জাল পাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে॥

কাব্যের নায়ক-নায়িকা ব্যাধ-দম্পতি হইলেও, মুকুন্দরাম তাঁহার কালুকেতুকে নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন ও ফুল্লরাকে স্বামী-সোহাগিনী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা যে অসভ্য অরণ্যবাসী তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাহাদের নৈতিক জ্ঞান ও কর্তব্যবোধ অসভ্য মানুষের অনুরূপ। সতিনীর জ্বালায় চণ্ডীদেবী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া ফুল্লরা তাঁহাকে উপদেশ দেয়—

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষ পান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥

ফুল্লরার কাছে স্বামীর ভালবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, অন্য কিছুর প্রত্যাশী সে নয়। সংসারের নানা অভাবের মধ্যেও কালকেতুর অনাবিল প্রেম লাভ করিয়া সে পরম সুখী। সেখানে ভুবনমোহিনী-রূপিনী চণ্ডীদেবীর সহসা আগমনে সে ভীতা হয়; তাহার সুখের সাম্রাজ্য অপরে হরণ করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া সে উদ্বিগ্না হইয়া উঠে। তাই তাহাদের সংসারের অভাব-

অনটন, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, সে চণ্ডীদেবীকে কালকেতু-গৃহবাসের সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পায়। তাহাদের এই দুঃখময় সংসার-জীবনের বিবরণ কবি ফুল্লরার "বারমাস্যা"-র মাধ্যমে নাটকীয় কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বারমাস্যার দ্বারা ফুল্লরার মনোজগৎটি আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইহা একটি সরস গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে। কবি নিজেও দারিদ্র্য-পীড়িত অতিশয় দুঃখী ; তাই ফুল্লরার দুঃখের মধ্যে তাঁহার নিজের দুঃখও সহজে মিশিয়া গিয়াছে। "হয়ত 'চালুসেরে বান্ধা দিলুঁ মাটিয়া পাথরা' তাঁহার নিজেরই অভাবগ্রস্ত জীবনেব একটি দিনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা।"[১] তাই বারমাস্যাটি এত সকরুণ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া ফুল্লরার সুগভীর পতিপ্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার সংসারের অবিরাম অভাব ও দুঃসহ দুঃখকষ্টের কথা সে বার বার বলিলেও, ও তজ্জন্য নির্মম বিধাতাকে বারংবার অভিসম্পাত দিলেও, তাহার স্বামীর নিন্দা সে একটুও করে নাই,—তাহার দুঃখের জন্য কালকেতুকে একটুও দায়ী সে করে নাই। ইহাতে তাহার পতির প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। এই সুমধুর বারমাস্যার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥

... ...

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
রবিকর করে সর্ব্ব শরীর দহন॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা-সারি॥

... ...

কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥

১, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'।

নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড় ।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥
... ...
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা ।
চালুসেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান ।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥

ফুল্লরার বারমাস্যা শুনিয়াও চণ্ডীদেবী যখন প্রস্থান করিতে রাজী হন না, তখন তাহার সন্দেহ হয় যে, কালকেতুই পাপোদ্দেশ্যে এই রমণীকে ভুলাইয়া আনিয়াছে। তাই সে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে স্বামীর সাক্ষাতে গিয়া অভিযোগ করে,—

কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রতে স্বপনে ।
দোষ না দেখিয়া কর অপমান কেনে ॥
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন ।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ ॥

কিন্তু ফুল্লরার কথায় সরলমতি কালকেতুর বিশ্বাস হয় না। ফুল্লরা ভিন্ন অন্য কোন রমণীর প্রতি সে আসক্ত নয়। কাজেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলে,—

সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা ।
মিথ্যা হইলে চোয়ারে কাটিব তোর নাসা ॥

ব্যাধের মুখে এইরূপ কঠোর উক্তি অতীব স্বাভাবিক হইয়াছে।

কালকেতু সেই মোহিনী রমণীকে তাহার গৃহ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে, এবং ফুল্লরাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে স্বীকৃত হয়। সুন্দরী যুবতীর সহিত একক যুবকের গমন—তাহার নৈতিক জ্ঞানে অনুচিত বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদেবী তথাপি প্রস্থান করেন না দেখিয়া, সে অগত্যা ধনুর্বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু মহামায়ার ছলনায় তাহার আকর্ষিত শরাসন হইতে শর নির্গত হয় না,—শত চেষ্টাতেও একটি তীর নিক্ষেপ করিতে সে পারে না। তদ্দর্শনে ফুল্লরা পতির হস্ত হইতে ধনুঃশর কাড়িয়া লইতে যায়, কিন্তু সমর্থ হয় না। ব্যাধ-দম্পতির এই বিহ্বলতার চিত্রটি কবি মনোজ্ঞরূপে অঙ্কন করিয়াছেন।—

এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর॥
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
হতবলবুদ্ধি হৈল আখেটী-নন্দন॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর।
ছাড়াইতে নারে রামা হইল কাঁফর॥

চণ্ডীদেবী আত্ম-পরিচয় দান করিলেও স্থূলবুদ্ধি ব্যাধের তাহাতে প্রত্যয় জন্মে না।—

হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী॥

যাহা হউক, অবশেষে চণ্ডীদেবী কৃপাপরবশ হইয়া কালকেতুকে অরণ্য-মধ্যে কতিপয় স্বর্ণপূর্ণ কলসীর সন্ধান দেন। ফুল্লরা ও কালকেতু যথাসাধ্য সেগুলি বহন করিতে থাকে, এবং অল্পবুদ্ধি কালকেতু চণ্ডীদেবীকেও এক ঘড়া ধন বহন করিতে অনুনয় করে। কিন্তু দেবী পাছে ঘড়াটা লইয়া পলাইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় সে বারে বারে পশ্চাৎ ফিরিয়া লক্ষ্য করিতে থাকে। এই দৃশ্যে কালকেতুর "সরলতা, বর্ব্বরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ নায়কের উপযোগী।" [১]

কিন্তু কবিকঙ্কণের রাজা-কালকেতু মাধবাচার্যের রাজা-কালকেতু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রকেও তিনি মাধবাপেক্ষা উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হন নাই।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটিও মুকুন্দরাম প্রশংসনীয়রূপে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী-রচনায় তিনি যেরূপ গভীর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে সেইরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। দুঃখের কথাতেই তিনি বড়, সুখের কথায় তাঁহার সহৃদয়তার কিঞ্চিৎ অভাব

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

দেখা যায়। খুল্লনা ও ধনপতির সানন্দ প্রেমলীলা, সুদীর্ঘকাল দুঃসহ লাঞ্ছনা-ভোগের পর হৃদয়বল্লভের সহিত সম্মিলনে খুল্লনার প্রবল উল্লাস—প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব দেখাইবার অবকাশ থাকিলেও এবং হাস্য-পরিহাস আমোদ-আহ্লাদ, সরস বাদানুবাদ, মান-অভিমান-মিলন প্রভৃতি বিচিত্র ভাব ও অনুভাবাদি পরিবেষণ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিলেও উহাতে তিনি বিশেষ সযত্ন হন নাই। কিন্তু সতীনের নির্যাতনে খুল্লনার দুঃখ, শ্মশানভূমিতে নিরীহ শ্রীমন্তের অন্তর-বেদনা প্রভৃতি সকরুণ ঘটনাগুলি তিনি অতিশয় নিপুণভাবে অঙ্কন করিয়াছেন।

যাহা হউক, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' একখানি সুবৃহৎ কাব্য। ইহাতে বাস্তব ও কল্পনা, কাহিনী ও ইতিবৃত্ত, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, দেবতা ও মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষলতা সকলেই স্থান পাইয়াছে। এই হেতু ইহা একটি বিশৃঙ্খল অরণ্যাণীর ন্যায়, যাহার সর্বত্রই শোভাময় কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অতিশয় সুদৃশ্য নয়।

২। মনসা-মঙ্গল

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু কবি বেহুলার কাহিনী অবলম্বন করিয়া মনসামঙ্গল রচনা করেন। দ্বিজ বংশীদাস, সুকবি নারায়ণ দেব, কবি ষষ্ঠীবর, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রায় শতেক কবি মনসাদেবীর মহিমা-কীর্তনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পূর্ববর্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ অপেক্ষা তাঁহাদের কাহারও কাব্য শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে নাই। এই যুগের চাঁদসদাগরের চরিত্র পূর্বযুগের চাঁদসদাগর হইতে অনেকাংশে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বেহুলার চরিত্র এইযুগে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগের মনসামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সমধিক প্রসিদ্ধ; এবং নারায়ণ দেব ও বংশীদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

(১) দ্বিজ বংশীদাস

দ্বিজ বংশীদাস একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম বংশীবদন চক্রবর্তী। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ থানার সন্নিকটে পাতুয়ারী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

পিতা যাদবানন্দ ও মাতা অঞ্জনা দেবী। তাঁহার পত্নীর নাম সুলোচনা। তিনি অতিশয় দরিদ্র,—মনসার গান গাহিয়া কোনক্রমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা-সন্তানের নাম চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী পিতার কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া একখানি রামায়ণ ও কতকগুলি গীতিকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'দস্যু কেনারামের পালা' নামক একটি পল্লীগীতিকা হইতে জানা যায় যে, বংশীদাসের সুমধুর কণ্ঠে ও আবেগপূর্ণ সঙ্গীতে এক ভীষণ নরঘাতক দস্যু পরম সাধুতে পরিণত হয়। তাঁহার কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তদনুসারে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেন, কিন্তু "এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।"[১]

বংশীদাস-রচিত 'মনসামঙ্গল' একখানি সুখপাঠ্য বৃহৎকাব্য। ইহার ভাষা সরল, বিশুদ্ধ ও সহজবোধ্য। কবি সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও, তাঁহার কাব্যের কোথাও পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার বর্ণনা অনায়াসে পাঠকের চিত্তে বর্ণিত চিত্রটিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে। চাঁদসদাগর মনসাদেবীর পূজাঘটে পদাঘাত করিয়া, বিশাল বাণিজ্য-তরী ভাসাইয়া সমুদ্রে আসিয়া উপনীত হন। তখন মনসাদেবী সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার কুকর্মের শাস্তিবিধান করিবার জন্য গগনমণ্ডলে প্রচণ্ড ঝড় উঠান। এই ঝটিকা-সঙ্কুল সাগরের বর্ণনা বংশীদাস প্রত্যক্ষপ্রায় দান করিয়াছেন।—

মনসামঙ্গল

চারিদিকে চারি মেঘ সাজিল দুষ্কর ॥
চৌদিকে মেঘের সাজ ঘোর অন্ধকার।
ঘন ঘন বজ্রাঘাত বিজলী সঞ্চার ॥
মুসল প্রমাণ ফোঁটা ঘন বরিষণ।
শিলাবৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে হয় ঘন ঘন ॥
একার্ণবে দারুণ সে অন্ধকারময়।
ভাবিতে লাগিল লোক পায়্যা মহাভয় ॥
শিমুল তুলার হেন ডিঙ্গা তোল্লে পাড়ে।
ঘূর্ণবায়ে পাক দেয় ঢেউয়ে আছাড়ে ॥
ক্ষণেকে একত্র করে ক্ষণে নেয় দূরে।
ক্ষণেকে ঘুরে যেন কুলুর গাছ ফিরে ॥

১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

চাঁদসদাগর নির্ভীক বণিক। বাণিজ্য-ব্যপদেশে তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক দেশে গমন করেন এবং নানাস্থানের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার দেখিবার সুযোগ তিনি পান। এইরূপ বহুদেশের অদ্ভুত চাল-চলনের কথা বংশীদাসের কাব্যে স্থান পাইয়াছে। দক্ষিণ-পাটনের অধিবাসীদের রীতি-নীতি বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত অংশটি অতীব কৌতুকাবহ।—

বাপ মৈলে তারা রাখে শুকাইয়া।
বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ করে কায়ক্লেশ পাইয়া॥
মৈলে পুত্র কিছু নহে ভাগিনেয় অধিকারী।
সর্ব্বস্ব বাটিযা নেয় বেয়াইর বরগিরি॥
সহোদর অংশ না পায ভগিনীপতির ভাই।
মৈলে মুখানল করে শালার বেয়াই॥
ভাগিনা ভাগিনী আর ভাগিনা-বৌয়ারী।
এ সকলে মিলিযা করযে হুডাহুডি॥
ভাগিনা-বধূ গীত গায় মামাশ্বশুর নাচে।
জামাইযে পাখোয়াজ বাজায শাশুডীর কাছে॥

চাঁদসদাগরের বাণিজ্যের কথা বলিতে গিয়া কবি কোন কোন স্থানে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। জনৈক অনার্য রাজার সভায চাদ-সদাগর চটের কাপডকে মহামূল্য দুর্লভ বস্ত্র বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। মূর্খ রাজা পাত্রমিত্রদের লইয়া সেই মোটা চট পরিয়া অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছেন,—তবু মনে সান্ত্বনা যে, মহার্ঘ বসন পরিধান করিয়াছেন। সদাগর কিন্তু রাজার এই মূর্খতার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেছেন না;—তিনি প্রকারান্তরে গরুর সহিত তাঁহার তুলনা দিতেছেন।—

হরষিতে চট রাজা পিন্ধিল আপনে।
তার পাছে পিন্ধিলেক পাত্রমিত্রগণে॥
খুঁয়ার ধুতি তবে পিন্ধে পুরোহিত।
শণ পাট পবিত্র খড় শাস্ত্রেতে বিদিত॥
মহাদেবীগণে পিন্ধে চটের ভুরাখানি।
চটের পাছড়া আর চটের উড়ানি॥

চটের কামড়ে গাও খাজোয়ায় বড়।
চন্দ্রধরে বলে মিতা খানিক হইবা দড় ॥
... ...
তোমার সমান আমার দেশের দেবতা।
তাহার যতেক গুণ শুন কহি কথা ॥
সাক্ষাতে বিষ্ণু-অংশ দেবতা-চরিত্র।
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত ভুবন পবিত্র ॥
বনের তৃণ খায় লোক পরিতোষে।
যে জনে তাহারে সেবে লক্ষ্মী তথা বৈসে ॥
সংসার পবিত্র হয় পড়ি পদধূলি।
গো-দেবতা করি আমরা তারে বলি।
সেই দেবতার লক্ষণ আছে তোমার ঠাই।
সবে মাত্র মিতা তোমার লেজ শিঙ্গ নাই ॥

বংশীদাসের মনসামঙ্গলের কোন কোন স্থানে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণ-রসাত্মক পদ দৃষ্ট হয়,—সেগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী। সম্ভবতঃ চন্দ্রাবতী সেগুলি রচনা করিয়া থাকিবেন। যথা—

বেহুলারে কোলে করি সুমিত্রাপ্রে সুন্দরী
কান্দে মায়ে সকরুণ হৈয়া।
মোর ঘরে আছিলা যেন স্বপ্নের কৌতুক হেন
কাল তোরে জামাইযে যাইবে লৈয়া ॥
... ...
বেহুলা বলয়ে মাও কি লাগিয়া চিন্তা পাও
কন্যা আমি দৈবে পরাধিনী।
ভালমন্দ যত হৈবে আমার সহিত যাইবে
তুমি থাক জন্ম-এয়োরাণী ॥
সতি ভাই সুখে রৌক রাজার কল্যাণ হৌক
আমার লাগি না কর ক্রন্দন ॥
কপালে লিখেছে যারে কে তারে খণ্ডাইতে পারে
বলে দ্বিজ বংশীবদন ॥

(২) সুকবি নারায়ণ দেব

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' এক সময়ে পূর্ববঙ্গে বিশেষ সমাদৃত হয়। এই গ্রন্থে কবি আত্ম-পরিচয়-দান ও কাব্য-রচনা-কাল বিষয়ে কিছুই বলেন নাই: তবে ভণিতা হইতে জানা যায়—"নরসিংহতনয়, নারায়ণ দেবে কয়।" কাব্যের ভাষা ও বর্ণনভঙ্গি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে সহজেই প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে ইহা রচিত। এই কাব্যখানি লিখিয়া কবি "সুকবি-বল্লভ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম রামনারায়ণ দেব। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ 'সুকবি নারায়ণ দেব' নামে পরিচিত। ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর-গ্রামে তিনি বাস করেন। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ ও মাতার নাম রুক্মিণী।

পদ্মাপুরাণ

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' একখানি সুবৃহৎ কাব্য। বহু ঘটনা ও বিবিধ রসের সমাবেশে ইহা বিশালাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি যখন যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, কিছুই সংক্ষেপে সারিয়া যান নাই। তারকারাণীর রন্ধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শাক, ভাজা, দাইল, ঝোল, মাছ, মাংস, পিঠা, পায়স প্রভৃতি যত রকমের সুখাদ্য আছে তাহার কোনটাই বাদ দেন নাই। সর্পকুলের বিবরণ দিতে গিয়া বাসুকী, তক্ষক, কীর্তিকা, অনন্ত, লোন্ধা, ঢেমসা, বোড়া, কেউটিয়া, শঙ্খিনী প্রভৃতি শত শত সর্পের নাম করিয়াছেন। আবার, নদীর নাম শুনাইতে গিয়া গঙ্গা, আত্রাই, ইন্দ্রা, সুরভি, ভাগীরথী, সুবর্ণরেখা, মন্দাকিনী, যমুনা, ফল্গু, বৈতরণী প্রভৃতি কত নদীর নামই না করিয়াছেন! এইরূপ বাহুল্যের দ্বারা কবি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অনেক স্থলেই বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছেন।

অপরাপর মনসামঙ্গলের তুলনায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে ঘটনাগুলির সমাবেশ কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল মনে হয়। কাব্যের প্রারম্ভে শিবদুর্গার দাম্পত্য-জীবন এবং নেতা ও মনসার জন্ম-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পরেই একেবারে বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহ ও লৌহবাসরে লক্ষীন্দরের সর্পাঘাত-কাহিনী কবি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মৃত স্বামীর পুনর্জীবন-লাভের আশায় সতী-সাধ্বী বেহুলা দেবসভায় উপনীত হইয়া অত্যাশ্চর্য নৃত্যগীতের

দ্বারা আদিত্যগণের মনোরঞ্জন করিতে থাকেন। সেই অবসর-সময়ে কবি নায়ক-নায়িকার পূর্ব-কথা বলিতে সুরু করেন। স্বর্গ হইতে ঊষা ও অনিরুদ্ধ মর্ত্যলোকে বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দররূপে অবতীর্ণ হন, চাঁদসদাগর বাণিজ্যার্থে দক্ষিণ-পাটনে গমন করেন এবং দীর্ঘকাল বহু দেশ ঘুরিয়া বহুতর ব্যবসায় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। বাণিজ্য-ব্যপদেশে তিনি বহু বিঘ্নে পতিত হইলেও স্বীয় অদম্য পৌরুষের দ্বারা যাবতীয় বিপজ্জাল ছিন্নভিন্ন করেন। এখন হইতে কবি চাঁদসদাগরের চরিত্রবিকাশ করিতেই বেশী ব্যস্ত। সমগ্র কাব্যমধ্যে এই চাঁদসদাগর-চরিত্রই সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু সদাগরের বাণিজ্য-কাহিনী অপেক্ষা লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যুই মনসামঙ্গলের সবপ্রধান ঘটনা। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই মনসাদেবীর মহিমা প্রচারলাভ করিয়াছে। এই হেতু কবি চাঁদসদাগরের কাহিনী বলিবার পূর্বেই বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের পালা গাহিয়া লইয়াছেন,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

"মনসামঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র—বেহুলা। বেহুলার চরিত্র কোমলে-কঠোরে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এই চরিত্রের যথাযথ স্ফুরণে নারায়ণদেব যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মনসাদেবীর প্রতি বেহুলার ভক্তি, বাসরঘরে স্বামীর সহিত তাঁহার প্রথম সলজ্জ বাক্যালাপ, স্বামীর মৃত্যুতে বেহুলার শোক, স্বামী-বিয়োগ-বিধুরার স্বামীসহ ভেলায় যাত্রা, যাইবার সময় শাশুড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণ, পথে বিভিন্ন বাঁকে নানারূপ বিপদ, নেতার সাহায্য প্রার্থনা, শিবঠাকুরের করুণা ভিক্ষা, দেবসভায় নৃত্য, স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া শ্বশুরগৃহে প্রত্যাবর্তন, শ্বশুরের আদেশে নানাপ্রকার পরীক্ষাদান, ছদ্মবেশে মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ ও স্বর্গারোহণ প্রভৃতি ঘটনা নারায়ণদেব অতি নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় চিত্রিত করিয়া সূক্ষ্মরসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তেজস্বিতা ও মৃদুতার একত্র সমাবেশে বেহুলার চরিত্রটি অপূর্ব গরিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

নারায়ণদেবের ভাষা তেমন প্রশংসনীয় নয়। ইহা গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট; কবি যেভাবে কথা বলিতেন সেইভাবেই শব্দগুলি লিখিয়া গিয়াছেন,—

১. শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত, 'সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ'।

কোথাও সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় নাই। ইহাতে রচনার পারিপাট্য না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে। কাব্যের কোন অংশের অর্থ-গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না। নমুনাস্বরূপ, লৌহবাসরে লক্ষীন্দরকে সর্পদংশন-বিষয়ক অংশ হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

কাল নাগের বিসে লখাই কাতর হইল।
বিপুলা২ বুলি ডাকীতে লাগিল॥
উঠল সুন্দরি বেউলা কথ নিদ্রা যাও।
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি খিতি তলে।
অকালেতে রাড়ি হইলা খণ্ডব্রত ফলে॥

(৩) কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

চৈতন্যযুগে যতগুলি মনসামঙ্গল রচিত হয়, সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান'। ইহা একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে অতিশয় সমাদর লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্ষেমানন্দ জীবিত ছিলেন। কাব্যের প্রারম্ভে তিনি গ্রন্থোৎপত্তির একটি বিবরণ দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আত্ম-পরিচয় বা কাব্য-রচনা-কাল বিষযে তিনি কিছুই বলেন নাই। ভণিতা হইতে জানা যায় যে, তিনি জাতিতে কায়স্থ ও অভিরাম নামে তাঁহার এক সহোদর ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলায় ছিল। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ একই ব্যক্তির নাম। কবির নাম ক্ষেমানন্দ এবং তাঁহার উপাধি কেতকাদাস। 'কেতকা'-শব্দের দ্বারা মনসাদেবীকে বুঝায়;—এই কাব্যেরই একস্থানে উল্লেখিত আছে—

বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী।
কেআ পাতে জন্ম হইল কেতকা সুন্দরী॥

ক্ষেমানন্দ-রচিত 'মনসার ভাসান' একখানি অতি উপাদেয় কাব্য। এই কাব্য-রচনায় কবি গভীর সহানুভূতি, সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও মনোরম কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অতি সহজ ভাষায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া কবি বিরাট ভাবকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মধুর ভাব ও ললিত ভাষার সম্মিলনে কাব্যটি অতিশয় মনোহর

মনসার ভাসান

হইয়াছে। নারীহৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিনিচয় তাঁহার লেখনীতে সম্যক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নারীচরিত্র-সৃজনে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। "চাঁদসদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে।"[১] ক্ষেমানন্দের বেহুলা একাধারে কোমলা ও কঠোরা, সুন্দরী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, পতিপ্রাণা ও ঈশ্বরে ভক্তিমতী।

ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসানে' নারীচরিত্রগুলি মনোজ্ঞভাবে রঞ্জিত হইযাছে। তাঁহার চিত্রিত নারীচরিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই মনে হয যে, কবি তাঁহাব সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা নারীর অন্তরের যাবতীয় বাসনা-কামনা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। গৃহবধূর কোমলতা ও সতীসাধ্বীর দৃঢ়তা—এই উভযের যথাযথ সংমিশ্রণের দ্বারা তিনি বিচিত্র করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাংসারিক দুঃখের নিষ্ঠুব আঘাতে মনুষ্যহৃদয়ে অবিরাম যে অশ্রুজল উত্থিত হইতেছে—এই কাব্যটির নানাস্থানে তাহারই করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ করুণরসাত্মক কাব্য বলা যাইতে পারে। কাব্যের নায়িকা বেহুলা, বেহুলাব মাতা অমলা ও লক্ষ্মীন্দরের জননী সোণকা—এই মহিলাত্রযের যে মহিমময আলেখ্য ক্ষেমানন্দ অঙ্কন কবিয়াছেন, তাহা চিরপ্রশংসনীয়। স্নিগ্ধ করুণবসে সিক্ত হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালার কাব্যলোকে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

বেহুলাকে বাল্যকাল হইতেই কাব্যে দৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যেব যাবতীয সুষমা তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত। তিনি সুকোমলা লজ্জাবতীলতা। প্রবল লজ্জাবশতঃ বিবাহ-বাসরে তাঁহার মিলনাকুল স্বামীকে দেহালিঙ্গন দান করিতে পারেন না। কিন্তু প্রাণপ্রিয পতির সহসা সর্পাঘাত-মৃত্যুতে এই লজ্জাবতী লতিকা কণ্টকিতা হইয়া উঠিয়াছেন,—করুণ আর্তনাদে বিবাহ-বাটীর নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বিপদের তাড়নায ব্রীড়াময়ী নববধূ গৃহকোণ ছাড়িয়া উন্মুক্ত অম্বরতলে আসিযা দাঁড়াইয়াছেন।—

বেহুলা নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈঃস্বরে।
দুর্লভ লখাই মৈল খট্টার উপরে॥

বেহুলার ক্রন্দনে সোণকার শঙ্কাকুলচিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। সোণকা

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

স্নেহময়ী জননী, সন্তানের শোকে শোকে তাঁহার হৃদয় শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভগ্নহৃদয় লইয়া তিনি অতি-আশায় শেষপুত্রটিকে সযত্নে পালন করেন। এই প্রাণপ্রিয় পুত্রের সহসা মৃত্যুতে তিনি জ্ঞানবুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন; তাঁহার এতদিনের ধৈর্য্য হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়; অভাগিনী পুত্রবধূকে তিনি চিত্তদাহী দুর্বাক্য বলেন—

সোণকা কান্দিয়া দেয় বেহুলারে গালি।
সিঁথার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালী॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পাএর আলতায় তোর না পড়িল ধুলি॥
খণ্ড-কপালিনী বেহুলা চিরনীঞা দাঁতী।
বিভা দিনে মৈল পতি না পোহাইল রাতি॥

সোণকাকে আদর্শ জননীরূপে সৃজিত করিলেও কবি তাঁহাকে স্বাভাবিক-ভাবে চিত্রিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। সোণকার এই কঠোর উক্তি লখিন্দর-বিচ্ছেদ-বেদনাকে আরো ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।

বেহুলা সরলা বালিকা হইলেও, তাঁহার দৃঢ়তায় বিস্মিত হইতে হয়। সারল্য ও দৃঢ়তার আলোকপাতে বেহুলাচরিত্র প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিধবা হইয়া তিনি কিছুতেই গৃহে থাকিবেন না; তিনি পতিপ্রাণা, স্বামীই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়,—লখিন্দর ভিন্ন তিনি জীবন ধারণ করিবেন না। তিনি নিষ্পাপ, পবিত্র—তাঁহার পতিকে তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবেন,—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলে তিনি স্বামীর মৃতদেহ লইয়া দেবলোকের উদ্দেশে অজ্ঞাত যাত্রা-পথে বাহির হন। করুণাময়ী সোণকা বার বার নিষেধ করেন, মৃত ব্যক্তি কখনই পুনরুজ্জীবিত হয় না। তাই এই অসম্ভব তপস্যা হইতে সরলা পুত্রবধূকে বিরত হইতে তিনি কত অনুনয় করেন। ভগ্নীপ্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ নয়নজলের দ্বারা বেহুলার গমনে বাধা দেয়, নগরের নরনারী বুঝাইতে চেষ্টা করে,—কিন্তু বেহুলার অটল বিশ্বাস কাহারও নিকট অবনত হয় না, স্বামীসঙ্গ তিনি পরিত্যাগ করেন না।—

নগরের লোক যত অশেষ বুঝায়।
মড়াটা লইয়া-কোলে কোথা ভাসা যায়॥

তুমি শিশু সীমন্তিনী নহলী যৌবনী।
কেমনে যাইবা ভাস্যা বেহুলা নাচনী॥
জলে জলজন্তু আছে হাঙ্গর কুম্ভীর।
দেখিয়া তোমার মন হইবে অস্থির॥
... ...
যে জন ব্যথিত হয় প্রবোধিয়া কয়।
কেমনে ভাসিয়া যাবে মনে নাঞি ভয়॥
বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে।
নিমিখ মিলায় তার প্রভুর বদনে॥

শোক-সন্তপ্তা বেহুলা গলিত পতিশব লইয়া কলার মান্দাসে অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছেন। এই অকূল যাত্রা ক্ষেমানন্দ অতি করুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানের এই অংশের বর্ণনা সমধিক প্রশংসনীয়। বেহুলার সাধনা—তাঁহার কাব্যে নানা বিপদসঙ্কুল হইয়া অলৌকিক মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানে তিনি তাঁহার করুণরস-পরিবেশনের সুযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

বাঁশের গজাল যত সব গেল ছাড্যা।
খান খান হইয়া যত ভাসে কলা গাড্যা॥
হাঙ্গর কুম্ভীর জোঁক জলজন্তু যত।
বেহুলার আশে পাশে ভাসে শত শত॥
... ...
দেখিয়া বেহুলা কান্দে পায়্যা বড় শোক।
ধরিল মরার গায় হানে এক জোঁক॥
ছাড়াইলে নাঞি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
হরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥

লখিন্দরের মৃতদেহ ক্রমে বিগলিত হইতেছে, তদ্দর্শনে বেহুলা ভীত ও দুঃখিত হইতেছেন, তথাপি তাঁহার সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের পবিত্রতার উপর বিশ্বাস ও দেবতার প্রতি ভক্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অবিরাম

অনন্ত জলস্রোতে বিগলিত স্বামীদেহ ক্রোড়ে লইয়া তিনি দেবীপ্রতিমার স্থায় ভাসিয়া চলিয়াছেন। এই দেবীচিত্র ক্ষেমানন্দ স্বল্প রেখাপাতে সুন্দররূপে অঙ্কন করিয়াছেন!—

পথের পথিক যত পথ বায়্যা যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎ-মোহিনী কন্যা মড়া লইয়া জলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউএর হিল্লোলে॥

বেহুলার পুনর্পতিলাভের পর কবি হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন,— গভীর করুণভাবের পর লঘু হাস্য-কৌতুক-রসে শ্রোতার হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছেন। বহু দুঃখের পরে প্রাণপ্রিয় পতিকে পাইয়া, বেহুলার মনে এখন নানা আমোদ-আহ্লাদের অভিলাষ জন্মিতেছে। তিনি ও লখিন্দর যথাক্রমে যোগিনী ও যোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া, কালক্রমে বেহুলার পিত্রালয়ে গিয়া উপনীত হন। কিন্তু বেহুলার জননী অমলার মাতৃ-হৃদয়কে তাঁহারা প্রতারিত করিতে পারেন না। তরুণী যোগিনীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সস্নেহে বলেন,

তোমারে দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ।
মোর কন্যা এক ছিল তোমার সমান॥
না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈযা কোলে।
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে॥

তখন বেহুলা আর আত্মগোপন না করিয়া করুণাময়ী মাতার বক্ষে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধা হইলেন। এইরূপে অশ্রু-বর্ষণের পরে কবি আনন্দের উল্লাস অঙ্কন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু বেদনার আলেখ্য অঙ্কনে তিনি যেরূপ সুদক্ষ শিল্পী, অন্যত্র তিনি সেরূপ নহেন। এই কারণে মনসার ভাসানের শেষাংশ তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

ক্ষমানন্দ নামে অপর এক কবির রচিত একটি মনসামঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের সহিত তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। তাঁহার কাব্যখানি অতিশয় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু একেবারে বিশেষত্ব-বিহীন নয়।

৩। অপরাপর মঙ্গলকাব্য

বাঙ্গালাদেশে বহুবিধ দেবদেবীর অভাব নাই, আর সেই সঙ্গে তাঁহাদের মহিমা-জ্ঞাপক কাব্যেরও অভাব নাই। কিন্তু সকল কাব্যই বস্তুতঃ "কাব্য" বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নয়। মনসা ও চণ্ডীদেবীর ন্যায় দুর্গা, কালী, অন্নদা, শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গা, বাসুলী, শিব, ধর্ম্ম, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর লীলা কল্পনা করিয়া অনেকগুলি পাঁচালী-জাতীয় কাব্য বাঙ্গালাদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে রচিত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত গ্রাম্য দেবদেবীর সহিত সংস্কৃত পুরাণের শিব, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতাদিগের বিশেষ কোন মিল নাই। ইঁহারা বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীদের দ্বারা কল্পিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে পৌরাণিক দেবতাদের সহিত এই সকল লৌকিক দেবদেবীর সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা অনেকে কালক্রমে করিতে থাকেন; এবং তাহার ফলে, চৈতন্য-পরবর্তী কোন কোন মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয়বিধ কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটে। চৈতন্যদেবের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী মনীষীদিগের প্রবল অনুরাগ জন্মিতে থাকে এবং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সংস্কৃতানুশীলনের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব অনিবার্য হইয়া উঠে। অনার্য লৌকিক দেবদেবীদিগকে পৌরাণিক আর্য দেবদেবীদের সহিত অভিন্ন করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। "লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী—পৌরাণিক অন্নদা, ধর্মঠাকুর—পৌরাণিক বিষ্ণু, মনসা—'ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টা',—এই সমস্ত কষ্টকল্পিত আভিজাত্যের সৃষ্টি দ্বারা নিজের উদ্ভবের অখ্যাতিকে পৌরাণিকী গরিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।......ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে নব সংস্কার প্রবর্তিত হওয়াতে সমাজে লৌকিক দেবতাদিগের প্রাধান্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।"[১] প্রাচীন কাহিনীগুলির স্থানে পৌরাণিক গল্প, এবং বাঙ্গালার বাস্তব চরিত্রের স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ চরিত্র স্থানপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে যাহা কোন দেশ-বিশেষে বা সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাকে সমস্ত আর্যাবর্তের বা আর্য সমাজের অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। লৌকিক দেবদেবীকে ছাড়িয়া অনেক কবি পৌরাণিক

১. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'।

দেবদেবী লইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। এই হেতু, চৈতন্যপরবর্তীযুগে সূর্য, গৌরী, ভবানী, দুর্গা, শিব, অন্নদা, কমলা, গঙ্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী লইয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। কিন্তু মনসা-চণ্ডী-আদির ন্যায় ইঁহাদের অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ জাতীয় কাব্য বড় একটা আর রচিত হয় নাই। কেবলমাত্র রাঢ়ভূমির লৌকিক দেবতা ধর্ম ও অনার্যদেবী কালিকার মহিমাসূচক ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল হইতে কালিকামঙ্গল অনেক নিকৃষ্ট, কিন্তু ধর্মমঙ্গল উহাদের সহিত সমকক্ষকতা লাভ করিতে পারে।

লৌকিক দেবদেবীদিগের মধ্যে শিব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দ রামের চণ্ডীমঙ্গল ও অপরাপর মঙ্গলকাব্যের সূচনায় শিবের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথকভাবে কোন স্বতন্ত্র 'শিবায়ন'-কাব্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

শূন্য পুরাণ

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত-রচিত 'শূন্যপুরাণে' সর্বপ্রথম শিবের মৌলিক কাহিনী বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হয়। ইহাতেই সর্বপ্রথম কৈলাসপতি গৌরীনাথকে আমরা শস্যশ্যামলা বঙ্গ-পল্লীর কৃষকরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাই। সরল বিশ্বাসী বঙ্গীয় কৃষি-সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রাণের দেবতাকে অত্যুচ্চ হিমাচলের তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ হইতে বাঙ্গালার সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে,—স্বর্গের দেবতাকে স্বীয় গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং বাঙ্গালীর আশা ও কামনার দ্বারা তাঁহার চরিত্রকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত পুরাণের শিব—সংসার-বিরাগী ধ্যানমগ্ন তপস্বী, কিন্তু বাঙ্গালা কাব্যের শিব—ইন্দ্রিয়পরায়ণ কৃষি-কার্যনিরত দরিদ্র গৃহী। এই লৌকিক শিবচরিত্রের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাদেশের কৃষি-সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কৃষক-শিব-চরিত্রের প্রথম রেখাপাত শূন্যপুরাণে ঘটে বলিয়া অনুমান হয়। জীবিকা হিসাবে কৃষিকার্যের প্রশংসা এই শূন্যপুরাণেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার-বিরাগী শিব লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে সংসার পালন করেন; ইহা দেখিয়া পার্বতী তাঁহাকে কৃষিকর্মের দ্বারা শস্যোৎপাদন করিয়া সুখে জীবন যাপন করিবার সদুপদেশ দেন।—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥
পুখরি কাঁদাএ লইব দমখানি।
আরসা হইলে ছিচএ দিব পানি ॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথায হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাযে ধান্ন আনিব দাইআ ॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড।
কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড় ॥
তিল সরিষা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোঁসাই বিভূতিগুলা গাএ ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামৃত্তর আস ॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দরব পাই যেন ধর্ম্মপূজার বেলা ॥

শূন্যপুরাণের প্রায় সমকালে সংস্কৃত 'শিবরহস্য'-বর্ণিত শিবচতুর্দশী-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাহিনী-ভাগ অবলম্বন করিয়া 'মৃগলুব্ধ'-নামক কতিপয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয়। কিন্তু ইহাদের রচয়িতা কে, তাহা নির্ণীত হয় নাই; কেবলমাত্র দুইজনের নাম জানা যায়—রতিদেব ও রামরাজ। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রতিদেব তাঁহার 'মৃগলুব্ধ' রচনা করেন। তাঁহার কাব্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম গোপীনাথ, মাতার নাম বসুমতী ও দুই ভ্রাতার নাম রাম ও নারায়ণ। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালা নামক গ্রামে তিনি বাস করেন। তাঁহার পরে রামরাজ 'মৃগলুব্ধ' রচনা করেন। রামরাজ সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়া-উপাধি-ধারী মগ। তাঁহার রচিত কাব্যখানি রতিদেবের মৃগলুব্ধের অনুরূপ। 'মৃগলুব্ধ'-বর্ণিত কাহিনী সর্বাংশে পৌরাণিক। হস্তিনা-নগরীর রাজা মুচুকুন্দ ও রাণী রুক্মিণী শিবচতুর্দশী-ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন। সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে

মৃগলুব্ধ

বলিয়া রাণী রাজাকে ব্রত-কথা শুনাইতেছেন। এক জাল-বদ্ধ মৃগের মুখে শিবের মাহাত্ম্য শুনিয়া, জনৈক ব্যাধ শিবের আরাধনা করিয়া শিবলোকে গমন করে। অনন্তর মুচুকুন্দ রাজাও শিবের পূজা করিয়া প্রজাবৃন্দসহ কৈলাসধামে প্রস্থান করেন। সংস্কৃত মহাভারত, শিবপুরাণ, হরিবংশ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মুচুকুন্দ রাজার বিবিধ কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাহিনীগুলি অবলম্বন করিয়া 'মৃগলুব্ধ'-জাতীয় কাব্যগুলি রচিত হইয়াছে। এইগুলিতে যে-শিবের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি সম্পূর্ণ পৌরাণিক, লৌকিক শিবের ছায়ামাত্র উহাতে নাই। ইহার পরবর্তী যুগে শিবমঙ্গল বা 'শিবায়ন' নামক কাব্যগুলিতে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় শিবের সংমিশ্রণ ঘটে। এই অভিনব শিবের অপূর্ব কাহিনী-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তাঁহার কথা পরে আলোচিত হইবে।

সংস্কৃত তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কালিকাদেবীকে অবলম্বন করিয়া কতিপয় কাহিনী-মূলক কাব্য খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে থাকে। এইগুলি 'কালিকা-মঙ্গল' নামে পরিচিত। কিন্তু কালিকা-মঙ্গলে কালীমাতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ খুব কমই ঘটে। কালীর মহিমা অপেক্ষা কালী-সাধকের অত্যাশ্চর্য চৌর্যলীলা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চোর ও ডাকাতের আরাধ্যা দেবী—কালী। এই কালীমাতার কৃপায় চোরের অসাধ্য-সাধনের কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সুন্দর নামক জনৈক রাজপুত্র কালীর পূজা করিয়া, শেষে কালীর বরে বিদ্যা-নাম্নী এক অসামান্যা সুন্দরী রাজকন্যার সুরক্ষিত প্রাসাদ-কক্ষে সংগোপনে প্রবেশ করিতে ও তাঁহার সহিত প্রণয় করিতে সক্ষম হন। এই বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন কাম-লীলাই ইহার মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। এই কারণে ইহা সাধারণতঃ 'বিদ্যাসুন্দর' নামে পরিচিত।

বিদ্যাসুন্দর

এযাবৎ যতগুলি বিদ্যাসুন্দর-কাব্য সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে ময়মনসিংহ-নিবাসী কবি কঙ্কের কাব্যখানি প্রাচীনতম। কঙ্ক পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কবি; তাঁহার জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া রঘুসুত-নামক অপর এক সুকবি 'কঙ্ক ও লীলা' নামে একটি মনোহর প্রেমের কাব্য রচনা করেন। উহা 'মৈমনসিংহ-গীতিকায়' স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহ-জেলার

পূর্বভাগে রাজ্যেশ্বরী-নদীর তীরে বিপ্রগ্রাম-নামক গ্রামে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ ও মাতার নাম বসুমতী। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন ও আত্মীয়-স্বজন-বিহীন হওয়ায়, এক চণ্ডালের গৃহে লালিত-পালিত হন। কৈশোর-কালে তিনি গর্গ-নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতে রাখালের কার্য করেন। এই পরম পণ্ডিতের নির্মলা কন্যা লীলাদেবী কঙ্কের প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়ে। সেই পবিত্র প্রণয়-কাহিনী লইয়া 'কঙ্ক ও লীলা' নামক গীতিকাটি রচিত। কবি কঙ্কের রচনা হইতে অনুমান হয়, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।—

কবি কঙ্ক

কবে বা হেরিব আমি গৌবার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য-জনম॥
পাপী তাপী মুঞি প্রভু আমি অল্পমতি।
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥

বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী আদি-রসাত্মক হইলেও, কঙ্কের কাব্যে কামলীলা প্রাধান্য লাভ করে নাই। নীতির সংযম তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই, কোথাও অশ্লীলতার সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার সবল রচনার মধ্য দিয়া কামকলার পরিবর্তে নির্মল ভক্তিভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পরে চট্টগ্রাম-নিবাসী গোবিন্দদাস, কলিকাতার নিকটবর্তী নিমিতা গ্রামের কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি কতিপয় কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচিত বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কোনখানাই মনোরম নয়।

'ধর্ম' নামে এক গ্রাম্য দেবতা বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই ধর্মঠাকুরের আশ্চর্য মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয়। ইহারা 'ধর্মমঙ্গল' নামে পরিচিত। ধর্মদেবের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসীরা সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা জানায়।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যেও উক্ত হইয়াছে যে, নিঃসন্তান রাণী রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় এই ধর্মঠাকুরের পূজা করেন ও লাউসেন নামক এক মহচ্চরিত্র পুত্র প্রাপ্ত হন। এই লাউসেনের জীবন-কথাই ধর্মমঙ্গলের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ধর্মদেবের বিবরণ ও পূজাপদ্ধতির কথা রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' সর্বপ্রথম দেখা যায়। কিন্তু লাউসেনের কাহিনী শূন্যপুরাণে নাই। লাউসেনের অপূর্ব কাহিনী লইযা সম্ভবতঃ ময়ূর ভট্ট সর্বপ্রথম 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল

ময়ূর ভট্টের জীবন-সম্বন্ধে ও তাঁহার কাব্যবিষয়ে বিশেষ কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁহার পরবর্তী ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা মানিকরাম গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি তাঁহাকে ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলিয়া তাঁহাদের কাব্যারম্ভে বন্দনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পরে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রূপরাম, মানিকরাম, খেলারাম, সপ্তদশ শতাব্দীতে সীতারাম ও রামদাস আদক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে মাণিকরামের কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ঘনরামের কাব্যখানি সর্বশ্রেষ্ঠ।

ময়ূরভট্ট

মানিকরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গলে যে আত্ম-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতামহ অনন্তরাম গাঙ্গুলী, তাঁহার পিতার নাম গদাধর, হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলডিহা গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। তাঁহার 'ধর্মমঙ্গল' ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। 'বাঁকুড়া রায়' নামক এক লৌকিক দেবতার সহসা সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন। ইহা চতুর্বিংশ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় গ্রন্থোৎপত্তি, ধর্মের বন্দনা, মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী ত্রিবিংশ পালায় ধর্মবীর লাউসেনের বিজয়-কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। এই কাহিনী অতিশয় দীর্ঘ ও বহুসংখ্যক বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। ধর্মবলে বলীয়ান্ ব্যক্তি যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘটাইতে পারে, কবি যেন তাহাই ঘটা করিয়া বলিবার জন্য বহু অত্যাশ্চর্য ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। এই সমস্ত

মানিকরাম গাঙ্গুলী

দুঃসাধ্য রোমাঞ্চকর কার্যের মধ্য দিয়া কাব্যের নায়ক তাঁহার দৃঢ় চরিত্রবল লইয়া দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অসীম বীরদর্পে যাবতীয় বিপজ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ রণকৌশলে প্রবল শত্রু পরাজিত, তাঁহার অমিত বাহুবলে হিংস্র পশুকুল নিপীড়িত, তাঁহার নির্মল চরিত্রবলে কুহকিনী কুলটা উপেক্ষিতা এবং তাঁহাব দুশ্চব তপস্যায় বিশ্বপ্রকৃতি পর্যন্ত বিপর্যস্ত। এই প্রকার বহুবিধ বিস্ময়কর বিজয়কাহিনীর সমাবেশে কাব্যখানি বীর-রসাত্মক ও বোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বস-সৃষ্টিতে মানিকরাম তেমন সুদক্ষ নহেন। তাঁহার ভাষা ও ছন্দ তেমন সাবলীল নহে। ঘটনার গুরুত্বের সহিত ভাষার গাম্ভীর্যের সমন্বয় তিনি অনেক স্থানেই ঘটাইতে পারেন নাই। এই হেতু তাঁহার রচনা অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী যুগে ঘনরাম চক্রবর্তীর লেখনীতে এই অতুল বীরত্ব-কাহিনী জীবন্তপ্রায় রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ঘনরামের কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে লাউসেনের কাহিনী আমরা সবিস্তারে বলিতে প্রয়াস পাইব।

[৪] অনুবাদ-সাহিত্য

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাব আদি মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝা মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণ বাঙ্গালা-পদ্যে অনুবাদ করিয়া বঙ্গদেশের সর্বজন-প্রিয় অমর কাব্য রচনা করেন। তদবধি সংস্কৃত ভাষার বহু বিখ্যাত গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত হইতে থাকে। চৈতন্যযুগে এই অনুবাদ-কার্য সমধিক-ভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু সকল অনুবাদই প্রশংসনীয় নয়। কেবলমাত্র মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদগুলিই উল্লেখযোগ্য।

মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত বাঙ্গালা-পদ্যে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া মনে হয়। সমগ্র মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রথমে অনেকেই করেন নাই। প্রায় কবিই মহাভারতের অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতে প্রয়াস পান। কেহ কেহ আবার মহাকাব্যের মূল ঘটনাটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা

করেন। কবীন্দ্র নামক জনৈক কবি সর্বপ্রথম মহাভারতের সমগ্র কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙ্গালা পদ্যে প্রকাশ করেন। ইহা 'বিজয় পাণ্ডব কথা' নামে অভিহিত। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। কাহারো কাহারো মতে তাঁহার নাম ছিল কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং তিনি কোচবিহার রাজ্যের রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কাব্যমধ্যে গ্রন্থরচনার যে বিবরণ তিনি দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ত্রিপুরা-রাজ্যের শাসনভার-প্রাপ্ত পরাগল খানের আদেশে তিনি এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। পরাগল খান—গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের একজন প্রধান সেনাপতি। গৌড়েশ্বরের আদেশে তিনি যুদ্ধের দ্বারা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জয় করেন এবং তথাকার শাসনভার-প্রাপ্ত হইয়া তিনি ত্রিপুরাতেই বসতি করিতে থাকেন। কালক্রমে তাঁহার মনে মহাভারতের কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাহাব সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কবীন্দ্র মহাভারতের কাহিনী বাঙ্গালা-কবিতায় সংক্ষেপে বলিতে সযত্ন হন। কিন্তু রচনাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও কোন মুখ্য কাহিনী উহাতে বাদ পড়ে নাই। ইহা কবির দক্ষতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। পরাগলের আদেশে বচিত বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ 'পরাগলী মহাভারত' বলিয়া থাকেন। সুলতান হোসেন শাহ্ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। কাজেই 'পাণ্ডব বিজয় কথা' ঐ সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে।

মহাভারত

পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকর নন্দী-নামক কবি মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং অন্তত: অশ্বমেধ-পর্বের অনুবাদ করেন। অশ্বমেধ-পর্ব লইয়া আরো কতিপয় কবি কাব্য রচনা করেন; যথা—রামচন্দ্র খান ও দ্বিজ রঘুনাথ। মহাভারতের বিশেষ কোন পর্ব লইয়া বা কোন একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়। এইগুলির মধ্যে লোকনাথ দত্তের 'নৈষধ' বা নলোপাখ্যান, রাজারাম দত্তের 'দণ্ডীপর্ব', মধুসূদন দত্তের 'নলদময়ন্তী', রাজেন্দ্র দাসের 'আদি-পর্ব', গোপীনাথ দত্তের 'দ্রোণপর্ব' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারতের প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ করিলে, এই সকল বিচ্ছিন্ন মহাভারত-কাহিনীর সমাদর হ্রাস পাইতে থাকে। কাশীরামের পূর্বে বা পরে আর কেহই বাঙ্গলাভাষায় এরূপ বিরাট ও সর্বাঙ্গসুন্দর মহাভারত রচনা করিতে

সক্ষম হন নাই। তবে, তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্বগামী নিত্যানন্দ ঘোষ তাঁহার প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। "তাঁহারই রচনা কাশীদাসের মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।"[১] কাশীদাসের পরবর্তী মহাভারত-রচয়িতাদের মধ্যে কেবলমাত্র ষষ্ঠীবর সেন, কবিচন্দ্র ও শ্রীনাথ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই শ্রীনাথ কোচবিহারের রাজ-পণ্ডিত ছিলেন। কোচবিহারের রাজারা চিরকাল বিদ্যোৎসাহী এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত কোচ-বিহারের সকল রাজাই সংস্কৃতভাষার সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র-পুরাণাদি জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষায় প্রচার করিতে উদ্যোগী হন। এই মহদুদ্দেশ্যে তাঁহারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সুপণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদ করান। মহারাজ নরনারায়ণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় কবি-পীতাম্বর খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভাগবত-পুরাণের দশম স্কন্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। মহারাজ বীর নারায়ণের আদেশে পণ্ডিত-কবিশেখর মহাভারতের 'কিরাতপর্ব' অনুবাদ করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৩২-১৬৬৫ খ্রীঃ) শ্রীনাথ পণ্ডিত (চক্রবর্তী) মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করেন, কিন্তু আদিপর্ব, দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর ও দ্রোণপর্বের কতকাংশ অনুবাদ করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। পরে মহারাজ মোদনারায়ণের ইচ্ছানুক্রমে দ্বিজ কবিরাজ দ্রোণপর্ব সমাপ্ত করেন। মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণের আজ্ঞায় দ্বিজরাম সরস্বতী ভীষ্মপর্ব অনুবাদ করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খড়্গনারায়ণের ইচ্ছানুক্রমে দ্বিজনারায়ণ নারদীয় পুরাণ অনুবাদ করেন। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৮২-১৮৩৯ খ্রীঃ) স্বয়ং সুকবি ছিলেন। তিনি বৃহদ্ধর্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড, মহাভারতের ঐশিকপর্ব, সভাপর্ব ও শল্যপর্বের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত দশকুমারচরিত প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া তিনি 'রাজপুত্র-উপাখ্যান' ও 'উপাখ্যান' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেকগুলি ভক্তিরসাত্মক

কোচবিহারের রাজাদের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ

১. মনীন্দ্রমোহন বসু, 'বাঙ্গালা সাহিত্য'

শাক্তপদও রচনা করেন। তাঁহার রাজসভার পণ্ডিতদের দ্বারা তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, যথা, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, ধর্মপুরাণ, কাশী-খণ্ড, রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ প্রভৃতি—বাঙ্গালায় অনুবাদ করান।

রামায়ণ

মহাকবি কৃত্তিবাসের পরে আরো অনেক কবি বাঙ্গালা পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিচন্দ্র, দ্বিজ মধুকণ্ঠ, ঘনশ্যামদাস, কুমারী চন্দ্রাবতী,—সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিজ দয়ারাম, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, ষষ্ঠীবর সেন, দ্বিজ দুর্গারাম,—অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিজ লক্ষ্মণ, দ্বিজ ভবানী, জগৎরাম, অদ্ভুতাচার্য, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রঘুনন্দন ও রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রভৃতি রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু এই রামায়ণগুলির কোনটাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে উৎকৃষ্ট হয় নাই, এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় কোনখানাই সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী সমাদর লাভ করে নাই। কৃত্তিবাসের মত ভাষার প্রাঞ্জলতা, ছন্দের বিশুদ্ধতা, ভাবের সুস্পষ্টতা ও চরিত্রের মনোহারিতা আর কাহারো রামায়ণে দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে, চন্দ্রাবতীর রামায়ণে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে ;—বঙ্গপল্লীর পারিবারিক জীবনের অনেক মনোহর চিত্র উহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের অতিশয় প্রিয়। এই হেতু ভাগবত-পুরাণ বৈষ্ণবসমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বহু বৈষ্ণব কবি ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলি সাধারণতঃ 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে পরিচিত। এইগুলির মধ্যে ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ইহা সমগ্র ভাগবতের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। রঘুনাথ মহাপ্রভুর সমসাময়িক। গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে শ্রীচৈতন্য বরাহনগরে তাঁহার গৃহে রাত্রিবাস করেন। তাঁহার ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য'-উপাধি দান করেন।

বাঙ্গালার লৌকিক দেবী চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যগুলি রচিত, সেইরূপ পৌরাণিক চণ্ডীদেবীকে অবলম্বন করিয়াও দুর্গামঙ্গল-নামে কতিপয় কাব্য খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। "এই জাতীয় কাব্যরচনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ দিয়া সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় কিন্তু পরে তাহার কাহিনীটুকু অবলম্বন করিয়া স্বাধীন রচনারও সূত্রপাত হয়। এই

সমস্ত কাব্য সাধারণতঃ দুর্গামঙ্গল, দুর্গাপুরাণ, দুর্গালীলা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, চণ্ডিকাবিজয়, ভবানীমঙ্গল ইত্যাদি নামে পরিচিত।"[১]

দুর্গামঙ্গল

এইগুলির মধ্যে কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়', ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল' ও রূপনারায়ণের 'দুর্গামঙ্গল' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই জাতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল'। ইহা একখানি সুবৃহৎ কাব্য এবং চারি অংশে বিভক্ত ;—প্রথমাংশে দেবরাজ্য, বৃত্রাসুর-বধ ও দেবীমাহাত্ম্য-প্রচার, দ্বিতীয়াংশে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীবর্ণিত সুরথ-সমাধি-কাহিনী, তৃতীয়াংশে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান এবং চতুর্থাংশে বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের 'দুর্গামঙ্গল' আকারে বৃহৎ না হইলেও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে দুইখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয় ;—একটি কৃষ্ণদাস বাবাজী-কৃত নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থের অনুবাদ, এবং অপরটি আলাওলকৃত মালিক মোহাম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ'-কাব্যের অনুবাদ। হিন্দী ভক্তমাল-গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভক্তমাল-গ্রন্থ আকারে অনেক বড়। কারণ, ইহাতে কৃষ্ণদাস বঙ্গদেশের বহু বৈষ্ণব মহাজনের জীবন-কথা জুড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বরভক্ত সাধকদিগের নির্মল ধর্মজীবন ও ভক্তিমূলক বহু সৎকথন স্থান প্রাপ্ত হয় বলিয়া ভক্তিপ্রবণ বঙ্গ-সমাজে ইহার বহুল প্রচার ঘটে। হিন্দী পদুমাবৎ কাব্যখানি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্ঞী পদ্মাবতীর-রূপতৃষ্ণায় যে সমরানল প্রজ্বলিত করেন, ইহা তাহারই ইতিবৃত্ত। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলাওল ইহার বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদ করেন ও ইহার নাম দেন 'পদ্মাবতী'। কিন্তু ইহা মূল-গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ নয় ;—মূল গ্রন্থের কোন কোন অংশ ইহাতে পরিত্যক্ত এমং বহু নূতন বিষয় ইহাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাহ-বর্ণনায় কবি মূলের পরিবর্তে বঙ্গদেশীয় বিবাহোৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন। কোথাও মূলের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া নিজের কল্পনার দ্বারা তিনি অভিনব আখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কাব্যখানিতে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের ও মনোহর

ভক্তমাল ও পদ্মাবতী

১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.

কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাকে বিরাটাকার করিয়া তুলিয়াছেন; তথাপি সমগ্র গ্রন্থটিকে সুমধুর কাব্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। "মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত হয়, কিন্তু কাব্যখানি অনুসরণ করিতে তাদৃশ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।"[১] আলওল চট্টগ্রাম-অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। তিনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন; যথা—পদ্মাবতী, সতী ময়নামতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল, সপ্তপয়কর, তোহ্‌ফা, সেকেন্দর নামা।

(১) চন্দ্রাবতী

বাঙ্গালার মহিলা-কবিদের মধ্যে চন্দ্রাবতী সর্বাগ্রগণ্যা। তাঁহার পূর্বে কোন বঙ্গনারী বাঙ্গালাভাষায় কোন কাব্য বা কবিতা রচনা করেন বলিয়া জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত গীতগুলি একদা পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। তিনি পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পৈতৃক কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়" ইহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। 'দস্যু কেনারামের পালা' ও 'মলুয়া' নামে দুইটি মনোহর খণ্ডকাব্য তিনি রচনা করেন। তাঁহার পিতার মনসামঙ্গল-রচনাতেও তিনি সাহায্য করিয়া থাকিবেন।

নয়ানচাঁদ ঘোষ নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় কবির 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি গীতিকা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকায়' মুদ্রিত হইয়াছে। উহা এই চন্দ্রাবতীর জীবন-কথা বলিয়া অনুমান হয়। উহা হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রাবতীর জীবন একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় অতীব করুণ। যৌবন-সমাগমে তিনি জয়ানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি অনুরাগিনী হন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাকে পতিরূপে তিনি পান না। সেই ক্ষোভে তিনি সারাজীবনে আর বিবাহ করেন না, পূজার্চনা ও কাব্য-রচনায় কালাতিপাত করেন। তাঁহার পুণ্যশীল পিতা বংশীদাস একটি শিব-মন্দির স্থাপন করেন; সেই মন্দিরে তিনি প্রায় সর্বক্ষণ শিবারাধনায় নিমগ্ন

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

থাকেন। যৌবনসুলভ মোহবশতঃ জয়ানন্দ এক মুসলমানী যুবতীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে মগ্ন হন, কিন্তু অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া চন্দ্রাবতীর নিকট পুনরায় প্রেম নিবেদন করিতে আসেন। কিন্তু চিরকুমারী চন্দ্রাবতী তখন শিবমন্দির-মধ্যে ধ্যানমগ্না। জয়ানন্দের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কোন সাড়া দেন না বা মন্দিরের দ্বার খোলেন না। মন্দিরের সন্নিকটে বিকশিত পুষ্পরাজীর মনোহর শোভা। সেই পুষ্পের রক্তবর্ণ রসের দ্বারা মন্দির-গাত্রে চন্দ্রাবতীর নিকট অন্তিম বিদায়-বাণী লিখিয়া রাখিয়া মর্মাহত জয়ানন্দ ফুলেশ্বরী নদীস্রোতে ঝম্প প্রদান করেন। তাঁহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, তাঁহার আর চৈতন্যোদয় হয় না।

চন্দ্রাবতী তাঁহার রামায়ণে বংশ-পরিচয় দান করিয়াছেন—

ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
... ...
দ্বিজবংশী পুত্র হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
... ...
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা।
যার কাছে শুনিযাছি পুরাণের কথা॥
... ...
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কতকগুলি গানের সমষ্টি। ময়মনসিংহ জেলার পল্লী-অঞ্চলের হিন্দুর বিবাহ-বাসরে এই গানগুলি এখনও গীত হইয়া থাকে। অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সীতার জন্ম ও বনবাস সম্বন্ধে নূতনত্ব দৃষ্ট হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিভুবন জয় করিয়া মুনিগণের উপরে কঠোর নির্যাতন করেন। তাঁহাদের বক্ষস্থল হইতে সুতীক্ষ্ণ কুশাগ্র দ্বারা বিন্দু বিন্দু রক্ত লইয়া তিনি একটি স্বর্ণ কৌটায় সঞ্চিত করেন ও রাণী মন্দোদরীকে উহা রাখিতে দেন। অনন্তর মন্দোদরী স্বীয় স্বামীকে ভিন্ন নারীতে আসক্ত দেখিয়া মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিবার

রামায়ণ

মানসে উহা পান করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় না বরং তিনি গর্ভবতী হন এবং যথাকালে একটি ডিম্ব প্রসব করেন। ভীতিবশতঃ তিনি ডিম্বটিকে একটি স্বর্ণপাত্রে আবদ্ধ করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। এক ধীবর জালের দ্বারা সডিম্ব স্বর্ণপাত্রটি সাগরজল হইতে উদ্ধার করে ও জনকরাজার মহিষীর করে উহাকে অর্পণ করে। সেই ডিম্ব হইতে কালক্রমে সীতাদেবী আবির্ভূতা হন।

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নির্বাসন সম্বন্ধেও চন্দ্রাবতী এক নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কুকুয়া নামে কৈকেয়ীর এক কন্যা মন্থরাদাসীর মত কুটিলা এবং মন্থরার মতই সে পুনরায় অযোধ্যার শান্তি ভঙ্গ করে। একদা সীতাদেবী শয়নমন্দিরে এক স্বর্ণপালঙ্কে বিশ্রাম করিতে থাকেন, সেই সময়ে কুকুয়া তাঁহার সন্নিকটে আসে এবং রাবণের মূর্তি কিরূপ তাহা আঁকিয়া দেখাই-বার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করে। তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সীতাদেবী অবশেষে একটি তাল-পত্রে রাবণ-চিত্র অঙ্কন করেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রান্তিবশতঃ তিনি নিদ্রিতা হইয়া পড়িলে, কুকুয়া সেই চিত্রিত তাল-পাখা-খানা সীতার বক্ষের উপরে রাখিয়া দেয় এবং রামচন্দ্রকে তথায় টানিয়া আনিয়া দেখাইয়া দেয়—সীতা অসতী, তিনি এখনও দশাননকে ভুলিতে পারেন নাই। ইহার পরিণামেই রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনে নির্বাসন দেন। এই কাহিনীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শয়নমন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্কপাতা গো ফুলের বিছানি।

... ...

হেনকালে আসিল তথায় কুকুয়া ননদিনী॥
কুকুয়া বলিছে গো বধূ মোর বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি রাবণের ঘর॥
দেখি নাই রাক্ষস গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশমুণ্ড রাবণরাজা দেখাও আঁকিয়া॥

... ...

সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন।
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ॥
... ...
সীতা বলে দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে।
হরিয়া যখন দুষ্ট লৈয়া যায় মোরে॥
সাগরজলেতে পড়ে গো রাক্ষসের ছায়া।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাক্ষসের কায়া॥
বসিয়া ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে॥
এড়াতে না পাবি গো পাখার উপব।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো বাজা লঙ্কেশ্বর॥

চন্দ্রাবতীব রামাযণের সমস্তটা পাওয়া যায নাই। সম্ভবতঃ সমগ্র রামায়ণ তিনি বচনা করিতে পাবেন নাই। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ হইলেও, শিল্পনৈপুণ্যে ও আন্তবিকতায় চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিযাছে। ইহার ভাষা অতীব সবল, অতি সহজেই বোধগম্য এবং প্রতিপদে নাবীসুলভ কোমলতার অনুপম মাধুর্য।

(২) কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাস বাঙ্গালা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ মহাকবি। তাঁহার রচিত মহাভারত বঙ্গদেশেব প্রায প্রতি গৃহে সাগ্রহে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হইযা আসিতেছে। যাবতীয বাঙ্গালা মহাভাবতের মধ্যে তাঁহার মহাভাবতখানাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নিজে ইহাকে 'ভারত-পাঁচালী' নাম দেন, কিন্তু ইহা এখন 'মহাভারত' নামেই সকলের নিকট পরিচিত। আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহা রচনা করেন। বর্ধমান-জেলার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে তাঁহার জন্ম হয। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্তদেব এবং অপর দুই সহোদরের নাম কৃষ্ণদাস ও গদাধর। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই কবি। কৃষ্ণদাস ভাগবত পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ও গদাধর নীলাচল-বিষয়ক 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু কাশীদাসের মহাকাব্যের তুলনায় ইহারা নিকৃষ্ট। কমলাকান্ত জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া উড়িষ্যায় থাকিয়া যান। কাশীরাম ও গদাধর

পিতার সহিত সেখানে কিছুকাল বাস করেন। এই উড়িষ্যাতেই কাশীরাম তাঁহার ভারত-পাঁচালীর শেষার্ধ রচনা করেন।

কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার নামে অধুনা-প্রচলিত সুবৃহৎ মহাভারতের সর্বাংশই তাঁহার নিজের রচনা নয়। উদ্যোগ-পর্ব হইতে পরবর্তী পর্বগুলির মধ্যে নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম, দ্বৈপায়নদাস প্রভৃতি অপর কবিদের রচনা সংমিশ্রিত হইয়াছে। "সঙ্কলনকারিগণ কাশীদাসের মহাভারত নানাভাবেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া দিয়াছেন।"[১] কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় তাঁহাব মহাভারতেও প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে, অপর কবির রচনা তাঁহার গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইযাছে। তাঁহার ভাষার উপরেও প্রায় সকল প্রকাশক ও সম্পাদক কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ একটি মহাভারত রচনা করেন এবং উহার যথেষ্ট সমাদর হয়। ঐ মহাভারতের কিযদংশ বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গিযাছে। কাশীদাসী মহাভারতের শেষভাগে এই নিত্যানন্দের বচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এতদ্ব্যতীত রাজেন্দ্রদাস-রচিত আদিপর্ব, গোপীনাথ দত্ত-প্রণীত দ্রোণপর্ব ও গঙ্গাদাস সেন-রচিত অশ্বমেধপর্ব হইতে বহু অংশ কাশীদাসী মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যাবতীয মহাভারতের মধ্যে ধারাবাহিক অনুবাদ হিসাবে কাশীরাম দাসেব মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ নয়, ব্যাস-রচিত মহাভারতের সহিত ইহার বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। ব্যাসদেবের মূল উপাখ্যানের সহিত নানা পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী সংযুক্ত করিয়া স্বীয় রুচি-অনুসারে কাশীরাম তাঁহার মহাভারত রচনা করেন। এতদ্বিষয়ে তিনি কৃত্তিবাসের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাস যেরূপ বাল্মীকি-রচিত রামাণ স্বীয় প্রতিভাবলে বাঙ্গালীর উপযোগী করিয়া রচনা করেন, তিনিও সেইরূপ মহাভারতোক্ত বিষয় নিজের মনোমত করিয়া স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস উভয়েই সাহিত্য-জগতে অতুলনীয়; বাঙ্গালার কবিবৃন্দ তাঁহাদের নিকট সমধিক ঋণী।

মহাভারত

১, মণীন্দ্রমোহন বসু, 'বাজলা সাহিত্য'

কাশীদাস সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ; মহাভারত রচনায় তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, পুরাণাদি মন্থন করিয়া তিনি আদর্শ মানবজীবন-যাপনের উপযোগী নীতিসুধা আহরণ করিয়াছেন ও তাহার দ্বারা তাঁহার মহাভারতখানি ·ানগর্ভ করিয়া ভারতবাসীর জীবন-সাথী করিয়া দিয়াছেন। সংসার-জীবন, স্বধর্মাচরণ, সত্যপালন প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ নানা কাহিনী-প্রসঙ্গে তিনি সরস ও সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাব ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁহার মহাকাব্য অলৌকিক দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। বীরত্ব, সতীত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি, ধার্মিকতা, উদারতা, আত্মবিসর্জন প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির প্রোজ্জ্বল চিত্রে সুশোভিত হইয়া ইহা অনন্তকাল বাঙ্গালার কাব্যগগনে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে।

কাশীরামের মহাভারতের সর্বাংশই সুন্দর। যে কোন স্থান পাঠকের চিত্তে পরম তৃপ্তি দান করে। বিশুদ্ধ ভাষা, সুললিত ছন্দ, অনুপম অলঙ্কার ও মনোহর ভাব ইহার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। পূর্বগামী কবিবৃন্দের তুলনায় তাঁহার ভাষা সমধিক মার্জিত ও সংস্কৃতশব্দবহুল। কিন্তু তাঁহার পদবিন্যাস এত সুসমঞ্জস ও উদ্দেশ্য প্রকাশের এমনি উপযোগী যে পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারে ও তদ্দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। তাঁহার কবি-প্রতিভা সর্বত্র সতেজ, কোনস্থানেই তাহা কণামাত্র মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। কাব্যশাস্ত্র-বর্ণিত যাবতীয় রস ও সমুদয় অলঙ্কার এবং মানব-হৃদয়ের বিচিত্র ভাবরাশি তাঁহার গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যে বীর, করুণ ও শান্ত—এই রসত্রয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সুবিশাল মহাগ্রন্থে মানবজাতির দেবোচিত ও অমানুষিক প্রবৃত্তি—সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল বাৎসল্য, দুর্যোধনের দুর্দম দর্প, যুধিষ্ঠিরের অবিচল ধর্মনিষ্ঠা, ভীমসেনের আসুরিক তেজস্বিতা, অর্জুনের আশ্চর্য রণকৌশল, অভিমন্যুর অটল নির্ভীকতা, দ্রৌপদীর অসীম তিতিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের সর্বগুণশীলতা প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল আলেখ্যদ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া ইহা অমর-কাব্যে উন্নীত হইয়াছে। ধর্ম-পালনের মহিমা, পাপের কালিমা, দারিদ্র্যের শাস্তি, ঐশ্বর্যের অস্থিরতা, অহঙ্কারের পতন, সংযমের উত্থান ইত্যাদি মহদ্বিষয়ে ইহা পরিপূর্ণ,—তাই ইহা সর্বজনপ্রিয় ও চিরকালজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। মুনির কুটীর, রাজার প্রাসাদ, প্রকৃতির শোভা প্রভৃতি বিচিত্র দৃশ্য এবং নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি বহু মনোরম

উপাখ্যানের •সমাবেশ থাকায় ইহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক। ইহার অসীম প্রশংসা অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না।

ঈশ্বরে ভক্তি ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা কাশীরামের অতিমাত্রায় দৃষ্ট হয়। এই ভক্তিপ্রবণতা তাঁহার মহাভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও মহিমা তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন ব্রাহ্মণের বাক্যকে তিনি কোথাও ব্যর্থ হইতে দেন নাই। কোনখানেই ব্রাহ্মণের আচরণ হীনভাবে অঙ্কন করেন নাই। ব্রাহ্মণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। "মস্তকে ধারণ করি বিপ্রপদরজ" প্রভৃতি বাক্য তাঁহার ভণিতার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। তাঁহার দেবভক্তি আরো সমধিক। দেবতাদের লীলা-প্রসঙ্গ তিনি শ্রদ্ধাসহকারে কীর্তন করিযাছেন। তিনি যেখানেই ভগবৎ-কথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার ভাষা সরস ও ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছে;—উহা পাঠ করিতে করিতে পাঠকের চিত্ত ভগবন্মহিমায় আলোকিত হইয়া উঠে ও নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দু আগত হয়। তাঁহার লেখনীতে দেব-চরিত্রগুলি প্রকৃতই দেবতার যোগ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মহাদেবের চরিত্র-চিত্রণে তিনি অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সকল দেবতা বিচিত্রবর্ণ পট্টাম্বর পরিধান করেন, কিন্তু মহাদেব সর্বজন-ঘৃণিত ব্যাঘ্রচর্মদ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন করেন; দেবগণ অগুরুচন্দনের দ্বারা প্রসাধন সমাপন করেন, আর মহাদেব সর্বদেহে ভস্ম মাখিয়া সুন্দর হন; দেবতারা মণিরত্ন লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু মহাদেব অস্থিমালা লইয়া অতিশয় শান্ত; গরুড়, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি দেববৃন্দের বাহন, আর মহাদেবের বাহন সাধারণ বৃষভ; দেবগণ অমৃত লইয়া কোলাহল করেন, কিন্তু মহাদেব কণ্ঠে গরল তুলিযা নেন। সকল দেবতাই ভোগের দেবতা, কিন্তু মহাদেব ত্যাগের দেবতা,—এই কারণে তিনি পরম দেবতা। এই অপূর্ব শিবচরিত্র-চিত্রণে কাশীরাম অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিব-চরিত্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রও কাশীরামের তুলিকা-পাতে অত্যুজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পরমেশ্বর বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার মহাভারতের অধিকাংশ স্থলে তাঁহাকে মনুষ্যজাতির পরিপূর্ণ-চরিত্র-রূপে অঙ্কন করিয়াছেন, দুই-এক স্থানে মাত্র তাঁহার অলৌকিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোগ-পর্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের দূতরূপে কৌরব-প্রাসাদে

আগমন করিলে দুষ্টমতি দুর্যোধন তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিবার অভিসন্ধি করেন। অহঙ্কারী দুর্যোধনের এই ঔদ্ধত্যে তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁহার সেই দৈব রুদ্রমূর্তি দেখিয়া কৌরবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়েন। অতঃপর কুরুক্ষেত্র-রণপ্রাঙ্গণে মহাযোদ্ধা ভীষ্মদেবের অব্যর্থ শরজালে পাণ্ডবপক্ষ বিধ্বস্ত হইতে থাকিলে তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার পদভরে ধরাতল কম্পিত ও তাঁহার দেহজ্যোতিঃতে দশদিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং ভীষ্মদেব তাঁহাকে পরমেশ্বরজ্ঞানে স্তবস্তুতি করিতে থাকেন। এইরূপ দুই একটি ঘটনায় তাঁহার ঐশ্বর্য মহাভারতে দৃষ্ট হয়। মহাভারতের যেখানে সেখানে এবং যখন তখন যদি তিনি অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তিনি পাঠকের চিত্তে নিশ্চয়ই এরূপ পরম বিস্ময় ও গভীর শ্রদ্ধার উৎপাদন করিতে পারিতেন না। মহামানব পার্থসারথীর রহস্যময় চরিত্রসৃজনে কাশীরাম সত্যই পরিমিত সংযম ও অসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

কাশীদাসের মহাভারতে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ, কিন্তু সকল চরিত্রই উজ্জ্বলরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কর্ণ, দুর্যোধন, গান্ধারী ও দ্রৌপদী সমধিক উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাইতেছেন।

প্রাচীন ভারতের সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রতাপশালী কৌরব ও পাণ্ডবে যে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে,—তাহাই মহাভারতের প্রধান ঘটনা। এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কাশীরাম প্রত্যক্ষপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মত সরল ভাষায় সেই বিশাল সমরাঙ্গনের কর্ণভেদী আর্তনাদ ও নেত্রদাহী অস্ত্রসঞ্চালন আর কেহই সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যথা—

রথে রথে, গজে গজে, পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ধর্ম্মনীতি॥
আসোয়ারে আসোয়ারে, ধানুকী ধানুকী।
যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী॥
দুই দলে নানা অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
অস্ত্রে অন্ধকার, কেহ না দেখে কাহাকে॥
মণিমস্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায়॥

* * *

অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথী।
শূন্য হস্তে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
খড়্গ চর্ম্ম লয়ে তবে রণ করে বীর।
তাহাতে কাটয়ে সৈন্য, কেহ নহে স্থির॥
বড় বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া।
খান খান করে রথ হয়ে যায় গুঁড়া॥
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের কায়।
পদাতি পাইক মারি ধরণী লোটায়॥

(৩) ভবানীপ্রসাদ রায়

ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ হইয়াও 'দুর্গামঙ্গল' নামে একটি সুন্দর কাব্য রচনা করেন,—ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইলেও প্রখর শ্রুতিশক্তি ও অখণ্ড মনোযোগের দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন,—তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যমধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। জন্মান্ধ ব্যক্তির এইরূপ প্রবল জ্ঞানানুরাগ প্রকৃতই প্রশংসার বিষয়। কাব্যমধ্যে তিনি যে সংক্ষিপ্ত আত্মবিবরণ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—

নিবাস কাটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ॥
জন্মকাল হইতে কালী কবিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥
... ...
ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈরাছ আমায়॥
এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন।
কৃপা করি আসি অন্ধে কর পরিত্রাণ॥

ময়মনসিংহ জেলার আটীয়া পরগণার অন্তর্গত কাঁটালিয়া গ্রামে ভবানীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়, জাতিতে বৈদ্য।

তিনি জন্মান্ধ, তদুপরি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কাশীনাথ নামক তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার দ্বারা তিনি প্রতিপালিত হন ; কিন্তু কাশীনাথের দুই দুর্বৃত্ত পুত্র তাঁহার সঙ্গে বড়ই দুর্ব্যবহার করে। তাহাদের নির্মম অত্যাচারে সর্বদা নির্যাতিত হইয়া উপায়হীন অন্ধ কবি অতিশয় দুঃখকষ্টে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। সেই দুর্বহ জীবন হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্যই যেন তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর চরণে আত্ম-নিবেদন-ছলে এই 'দুর্গামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। আনুমানিক ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতীচণ্ডী-বর্ণিত দুর্গা-মাহাত্ম্য 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কবি অনেকস্থলে চণ্ডীর শ্লোকে শ্লোকে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সমগ্র চণ্ডীর যাবতীয় প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্যে শৃঙ্খলানুসারে সাজাইয়াছেন। কিন্তু ইহা সপ্তশতী-চণ্ডীর যথাযথ অনুবাদ নয়। রামায়ণ, পুরাণ, লৌকিক কাহিনী প্রভৃতি হইতে প্রয়োজনানুরূপ বিষয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার মূল উপাখ্যানের সহিত সুসঙ্গতভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর অবতরণিকা বিশেষ কিছুই নাই। মন্বন্তর-ব্যবস্থাদির সুদীর্ঘ আলোচনার প্রসঙ্গে সহসা দেবীমাহাত্ম্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভবানীপ্রসাদ দুর্গা-মহিমা কীর্তন করিবার পূর্বে একটি মুখবন্ধ বা ভূমিকা দান করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয় করিবার নিমিত্ত বানরসৈন্যদলসহ সমুদ্র তটে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার হইতে পারিতেছেন না। সীমাহীন সাগরবেলায় কপিদল-পরিবৃত কিংকর্তব্য-বিমূঢ় শ্রীরামচন্দ্রের সেই বিষণ্ণ দৃশ্য লইয়া কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে। যথা—

দুর্গামঙ্গল

বসিছেন রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ভাই ধনুর্ব্বাণ করে ॥
... ...
বানরে জানায় আসি রাজার সদন।
কোনমতে নহিলেক সমুদ্র-বন্ধন ॥
শুনিয়া সুগ্রীব কহে রামের গোচর।
বানর বাঁধিতে নারে অলঙ্ঘ্য সাগর ॥
সাত দিন হৈতে পাথর ফেলায় জলেতে।
তথাপি না ভাসে পাথর দেখিল সাক্ষাতে ॥

গাছ পাথর ফেলি যত সব হয় তল।
তাহা দেখি বানরগণ হইল বিকল॥
... ...
রাম বলে শুন মিতা সুগ্রীব রাজন।
এতেকে না হইল বুঝি সমুদ্রবন্ধন॥
আর না হইল বুঝি সীতার উদ্ধার।
আমার বংশেতে বড় রহিবে খাখার॥
... ...
আর না যাইব আমি অযোধ্যা নগর।
সীতার শোকেতে হবে মরণ আমার॥

ব্যর্থমনোরথ শ্রীরামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারের কোনই উপায় না দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন জাম্ববান সবিনয়ে বলেন যে, অগস্ত্যের শরণ লইলে সমুদ্র-অতিক্রমের উপায় হইতে পারে। অতিপূর্বে তিনি একবার এক গণ্ডূষে সমস্ত সাগর-জল নিঃশেষে পান করেন। সুতরাং সত্যব্রতধারী রঘুপতির উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত তিনি নিশ্চয় দ্বিতীয়বার সমুদ্র-শোষণ করিবেন। অনন্তর সীতাপতির স্মরণে অগস্ত্যমুনি তথায় আগমন করেন, কিন্তু তাঁহাকে তিনি দুর্গাপূজা করিবার সদুপদেশ দেন। শক্তিময়ী শ্রীদুর্গার কৃপাতেই তিনি সমুদ্রবন্ধন, লঙ্কাবিজয়, সীতা-উদ্ধার প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সহজে সিদ্ধিলাভ করিবেন। কারণ, ইতঃপূর্বে সুরথরাজা বসন্তকালে দুর্গারাধনা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হন। তখন শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরের নিকট দুর্গা-পূজার যাবতীয় বিধান এবং তাঁহার দশভুজা মহিষমর্দিনী-মূর্তিগ্রহণের বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের প্রাসাদে গৌরীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, যোগীশ্বর শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ, কৈলাস-শিখরে নিঃস্ব পতিগৃহে তাঁহার সংসার-যাত্রা, শরৎকালে তাঁহার পিতৃগৃহে আগমন, মর্ত্যবাসীর পূজা-গ্রহণ প্রভৃতি তাঁহার জীবন-কথা সংক্ষেপে কীর্তন করেন।

পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমন প্রসঙ্গে কবি বাঙ্গালার লৌকিক আগমনী-গীতের আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্গজননীর কন্যাস্নেহ ও মাতার জন্য বঙ্গ-ললনার

হৃদয়-ব্যাকুলতা তিনি প্রশংসনীয়রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাহের পর উমা শিবের সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গেলে, বৎসরেক কাল পরে মেনকারাণী কন্যার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। নিশিযোগে তিনি প্রায়ই গৌরীকে স্বপ্নে দেখেন।

একদিন নিশিশেষে মেনকা সুন্দরী।
স্বপন দেখায় বসি শিয়রেতে গৌরী ॥
কাঞ্চন প্রতিমা গৌরী শিয়রে বসিয়া।
বিধুমুখে আধস্বরে ডাকে মা বলিয়া ॥
কেন গো জননী আছ নিদয়া হইয়া।
তনয়া বলিয়া কিছু নাহি মায়া দয়া ॥
যত দুঃখ পাই আমি হর-নিকেতন।
ক্ষুধায় না পাই অন্ন নাহিক বসন ॥
বসন ভূষণ বিনা হইয়াছি উলঙ্গ।
পিশাচ বেতাল ভূত দানাগণ সঙ্গ ॥
রাজার নন্দিনী হইয়া এত দুঃখ পাই।
তৈলের অভাবে মাগো অঙ্গে মাখি ছাই ॥
বছর হইল গত হর-নিকেতনে।
মা বিনে সন্তান-দুঃখ জানে কোন জনে ॥
... ...
একদিন মেনকা রাণী গৌরী করি মনে।
কান্দিতে লাগিল রাণী গিরি বিদ্যমানে।
হায় গৌরী প্রাণ গৌরী তুমি সে জীবন।
কত কাল হইতে মায়ের নাহি দরশন ॥

প্রাণসমা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া দিয়া স্নেহময়ী জননী যে অনির্বাণ বিচ্ছেদানলে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে থাকেন, এবং আশৈশব-পরিচিত পিতৃগৃহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পরের ঘরে অনভ্যস্ত জীবন যাপন করিতে গিয়া সুকোমলা কন্যার হৃদয় যে অব্যক্ত বেদনায় পুড়িতে থাকে—উদ্ধৃত কাব্যাংশটিতে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাতার অস্থিরতা দেখিয়া গিরিরাজপুত্র মৈনাক

ভগ্নীকে আনিবার জন্য কৈলাস-ভূধরে গমন করেন এবং শিবের নিকট অনুমতি চাহেন। কিন্তু শিব তাহাতে নিরুত্তর থাকেন। তখন—

ঘরে থাকি দেখিলেন দেবী ভগবতী।
নিকটে মৈনাকে ডাকি আনিলা পার্ব্বতী ॥
ভাই দেখি বাপ মাও পড়িল স্মরণ।
নিকটে বসাইয়া দেবী পোছেন কথন ॥
কহত মৈনাক ভাই কহ সমাচার।
কুশলে আছেন পিতা জননী আমার ॥
মৈনাক বোলেন দেবী কি কহিব আর।
তোমা বিনে গিরিপুর হইয়াছে আন্ধার ॥

এই স্থানে কবি শ্বশুর-গৃহাবস্থিতা নবোঢ়া বঙ্গবধূর পিতৃগৃহের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতার ভাবটি সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রাতার মুখে পিতামাতার বিমর্ষাবস্থার কথা শুনিয়া পার্বতী পিত্রালয়ে যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু বিবাহিতা বালিকার পক্ষে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাইবার উপায় নাই। সুতরাং দুর্গা শিবের নিকট তাঁহার মিনতি নিবেদন করেন। কিন্তু শিব সহজে সম্মতি দেন না।

শঙ্কর বোলেন তোমায় না দিব বিদায়।
দক্ষ-অপমান দেবি মোর মনে ভয় ॥
আর বার যাইতে চাহ বাপের ভুবন।
কৈলাস ছাড়িবা দেবি হেন লয় মন ॥

শিবের অমূলক আশঙ্কা দূর করিবার জন্য দেবী বলেন যে, তিনি মাত্র তিন চারি দিনের জন্য পৃথ্বীবাসীর পূজা লইবার উদ্দেশ্যে হিমালয় পর্বতে যাইতেছেন, এবং

ষষ্ঠী আদি কল্প করি নবমীর দিনে।
কৈলাসে আসিব পুন দশমী বিহানে ॥

দেবতাদিগের পূজা-প্রাপ্তির লোভ অতিশয় প্রবল। তাই, গৃহিণী ত্রৈলোক্যের পূজা লইতে যাইতেছেন শুনিয়া গৌরীনাথ আর দ্বিরুক্তি করেন

না। কার্তিক-গণেশাদিসহ সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, ভ্রাতা মৈনাকের সহিত পার্বতী পিতৃগৃহে যাত্রা করেন। কন্যাদর্শনাকুলা মেনকারাণী ধান্যদূর্বা দিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া সাদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। তাহার পর, কন্যার অদর্শনে তিনি এতদিন কত দুঃখ পাইয়াছেন এবং কতকাল তিনি উমার মুখের সুমধুর মা-ডাক শুনিতে পান নাই—ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। এইরূপে কবি মেনকা-পার্বতীর মিলনের কথা বলিবার ছলে, বাঙ্গালার হিন্দু-পরিবারে বিবাহিতা কন্যার পতিগৃহ হইতে মাতৃ-সকাশে আগমনের দৃশ্য মধুরভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। করুণরসমিশ্রিত বাৎসল্যভাবের দ্বারা এই আগমনী-কাহিনীটুকু বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

হিমালয়-পর্বতে দুর্গাদেবীর পূজাগ্রহণের কথা সমাপন করিয়া অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে সপ্তশতীচণ্ডী-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মহিষাসুরবধ-লীলা বলিতে আরম্ভ করেন। এই চণ্ডীর কাহিনীর মধ্যেও কবি একস্থানে স্বীয় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সপ্তশতীচণ্ডী-অনুসারে মহিষাসুর-ভীত দেবগণের দেহনির্গত তেজোরাশি হইতে চণ্ডীদেবী যখন আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে সুসজ্জিতা করেন এবং হিমালয় তাঁহার বাহনের জন্য একটি সিংহ দান করেন। এই বাহনের মহিমা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কবি মৎস্যপুরাণ হইতে বিষ্ণুর সিংহমূর্তিধারণের কাহিনীটি এইস্থানে জুড়িয়া দিয়াছেন। বিবিধ দৈবাস্ত্রে দশভুজা দুর্গা বিভূষিতা হইয়া অসুর-বধার্থ প্রস্তুত হইলে, যুদ্ধকালে তাঁহার বেগশীল পদভর ধারণ করিতে পারে এইরূপ যোগ্য বাহনের অভাব বোধ হয়। তখন স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার বাহন হইবার জন্য সিংহমূর্তি ধারণ করেন।—

ভগবতী বোলে হরি অবধান কর।
যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর ভর॥
পদভরে পৃথিবী হইবে রসাতল।
কিমতে অসুর সঙ্গে করিব সমর॥
ধরিবারে আমারে পারহ কোন জন।
অসুর বধিতে পারি করিয়া সংগ্রাম॥
এতেক শুনিয়া তবে বোলেন শ্রীহরি।
অবশ্য ধরিব আমি সিংহমূর্তি ধরি॥

এ বোলিয়া সিংহমূর্ত্তি ধরিলা নারায়ণ।
বজ্র নখ দন্ত হৈল বিকট ভূষণ॥
শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার।
মহা পরাক্রম বীর কি কহিব আর॥
এহিমত ঐরিমূর্ত্তি করিলা প্রচার।
মৎস্যপুরাণে আছে ইহার বিস্তার॥

অতঃপর কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণ করিয়া, দুর্গাদেবী কর্তৃক মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরবধের কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের উপসংহারে হিমালয়পর্বতস্থিতা পার্বতীদেবীকে তিনি পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীদুর্গার যথাবিধি পূজার্চনা সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র পুনর্বার অগস্ত্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করেন—

কৈলাস ছাড়িয়া দেবী আসিলা হিমালয়।
কিমতে চলিয়া গেলা শিবের আলয়॥

তখন কবি বাঙ্গালীর চিরপরিচিত বিজয়ার বর্ণনা দান করেন। এইরূপে তিনি আগমনীর আনন্দের দ্বারা যে কাব্যের সূচনা করেন, বিজয়ার অশ্রুজলের দ্বারা তাহার সমাপ্তি সাধন করেন।

দুর্গামঙ্গলের ভাষা সহজ ও সরল। ইহা মূলতঃ অনুবাদ হইলেও, কবির স্বীয় রচনাশক্তির পরিচয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা, অস্ত্রচালনার চমৎকারিতা, রক্তপাতের জিঘাংসা, শবভক্ষণের বীভৎসতা প্রভৃতি রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলি কবি যথাযোগ্য ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে নিশুম্ভবধ-আখ্যান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

তবে কালী মুণ্ডমালী শূল নিয়া করে।
কাটিছে অসুর-মুণ্ড শূলের প্রহারে॥
নরশির মালা করি পরিলা গলায়।
শবপর রহি দেবী নাচিয়া বেড়ায়॥
রণজয়ী হৈয়া নাচে ভৈরবী যোগিনী।
এহি হেতু মুণ্ডমালী হইলা নারায়নী॥

শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়।
রুধির খাইয়া অস্থি দশনে চিবায়॥
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকিছে গভীর।
যতেক অসুরগণ হইছে অস্থির॥
পড়িল অসুরগণ হইয়া গাদি গাদি।
অসুরের রক্তমাংসে বহিয়াছে নদী॥

[৫] পল্লী-গীতিকা

১। ময়মনসিংহ-গীতিকা

মুসলমান-শাসন বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীসমূহ সুশাসন করিতে পারে নাই, এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের রীতি-নীতিও তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এইহেতু বাঙ্গালার উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল দীর্ঘকাল স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রকৃতির প্রভাবে ও স্বভাবের আবেগে এতদঞ্চলবাসী প্রফুল্লভাবে জীবন যাপন করিয়া যায়। তখন জাতিগত পার্থক্য প্রেমিক-প্রেমিকার সম্মিলনে বাধা দিতে পারে নাই, হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর পাণি-গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে নাই, সভ্যতার চক্ষুলজ্জা আন্তরিক বাসনা-নিবেদনে কাহারো চিত্তে সংকোচ জাগায় নাই। এই স্বাধীন প্রেমের দুর্বার প্রণয়লীলা পল্লীকবিগণ প্রাণের আবেগে সুমধুর সুরে গাহিয়াছেন। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে রাজশাসন সাধারণতঃ শিথিল হইয়া থাকে। এই কারণে, নিবিড় অরণ্য, বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, বেগবতী নদী ও খাল-বিল-পরিপূর্ণ বাঙ্গালার সীমান্তাঞ্চলে গৌড়েশ্বরের নিয়োজিত মুসলমান রাজকর্মচারিবৃন্দ দোর্দণ্ড প্রতাপে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপরে ঘোরতর অত্যাচার করে। তাহাদের পাশবিক নির্যাতনে পল্লীবাসীদের দুর্দশার সীমা থাকে না। দুর্বল হিন্দু গৃহস্থের পবিত্র অন্তঃপুর হইতে মনোলোভা রমণীদের তাহারা হরণ করে,—সুখশান্তিময় সংসারে দুঃখ-শোকের তীব্র অনল জ্বালাইয়া দেয়। এই মর্মান্তিক বেদনার করুণ ক্রন্দন কোন কোন সহৃদয় পল্লীকবি সরল গ্রাম্য ভাষায় ব্যক্ত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ময়মনসিংহ-অঞ্চল হইতে এই পল্লী-গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এইগুলি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও

পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাদের অন্তর্গত দ্বিজ-কানাই-রচিত 'মহুয়া', নয়ানচাঁদ ঘোষ-রচিত 'চন্দ্রাবতী', চন্দ্রাবতী-রচিত 'কেনারাম' ও 'মলুয়া' এবং জনৈক অজ্ঞাত কবি-রচিত 'ধোপার পাট' নামক গীতিকানিচয় সাহিত্যজগতে চিরকাল সমাদৃত হইবার যোগ্য। ইহারা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়।

এই পল্লী-গীতিকাগুলি মনোরম কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার। যুবক-যুবতীর পরস্পর হৃদয়-বিনিময়, মিলনের প্রতিবন্ধকতায় তাহাদের কোমল অন্তরের তীব্র বেদনা, গ্রাম্য পরিবারের প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপন, প্রবাসী পুত্রের নিমিত্ত স্নেহময়ী জননীর অস্বস্তি প্রভৃতি পল্লীজীবনের বিবিধ কাহিনী অপূর্বরূপে এইগুলিতে অঙ্কিত হইয়াছে। উন্মুক্ত গ্রাম্য প্রান্তরে মানব-মানবীর অবিকৃত স্বভাবের জীবন্ত লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বহৃদয়ে অনুভব করিয়া এই পল্লীকবি-বৃন্দ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। মানবমনের যে সুগভীর ভাব সাধুভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহাদের সহজ কথায় ও সরল সুরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কবিত্ব বিচারে এই পল্লীগীতিকাগুলি বঙ্গবাণীর কণ্ঠভূষণ হইবার যোগ্য।

দৈনন্দিন ভাষায় ও দুইচারিটি রেখায় স্বীয় গ্রামের নৈসর্গিক স্বভাব বিশাল চিত্র এই পল্লীকবিগণ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহুয়া' নামক গীতিকায় হুমরা-বাইদ্যার সুন্দর বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রটি দ্বিজকানাইয়ের দুইটি মাত্র চরণে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

সানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল।
পাইক্যা আছে সাইলের ধান সোনার ফসল॥

'মলুয়া'-পালায় বিনোদের সহিত মলুয়ার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে পুষ্করিণীর ঘাটে, সেস্থানটি বড়ই মনোহর।—

গাঁয়ের পাছে আন্ধ্যা পুকুর ঝাড়জঙ্গলে ঘেরা।
চাইর দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া॥

'কঙ্ক ও লীলা'-পালায় নববর্ষার বারিবর্ষণ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।—

হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষাজলে বসুমাতা ভাসে॥

নারীর রূপবর্ণনাতেও পল্লীকবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। মহুয়া ব্রাহ্মণের কন্যা হইলেও অনার্য বাদিয়ার দলে লালিতা-পালিতা। এই অপরূপ যুবতীর অনুপম লাবণ্য স্বল্পকথায় সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।—

হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চম্পার ফুল॥

বস্তুতঃ, এই পল্লী-গীতিকা সরস বঙ্গভূমির সজীব চিত্র,—গ্রামাঞ্চলের শোভা-সৌন্দর্যের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

মহুয়া, মলুয়া, ধোপার পাট প্রভৃতি গীতিকায় প্রেমের লীলা ও সতীত্বের গরিমা প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হইয়াছে। নদের চাঁদ মহুয়াকে তাহার প্রণয়ানুরাগ জানাইয়া নিবেদন করিতেছে—

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুইবা মরি॥

স্নানের ঘাটে বিনোদকে দেখিয়া নবীনা যুবতী মলুয়া তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। সেই মনোহর নবীন যুবককে সন্নিকটে পাইবার জন্য তাহার মনে অনুক্ষণ ইচ্ছা জাগিতে থাকে। তাহার এই মনোভাব নিম্নোক্ত উক্তিতে সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

অথিত বলিয়া যদি আইত আমার বাড়ী।
বাপেরে কহিয়া আমি বইতে দিতাম পিড়ি॥
শুইতে দিতাম শীতল পাটী বাটাভরা পান।
আইত যদি সোনার অতিথ যৌবন করতাম দান॥

কৃষিজীবী স্বামী সারাদিন শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, আর তাহার প্রেমময়ী পত্নী সারাক্ষণ তাহার গৃহাগমন প্রতীক্ষা করে।—

উক্কায় ভরিয়া পানী তামাকু ভরিয়া।
খসমের লাগ্যা থাকি পন্থপানে চাইয়া॥

'ধোপার পাট' গীতিকায় তরুণ রাজকুমার কিশোরী রজক-কন্যা কাঞ্চন মালার প্রেমে বিভোর। গভীর নিশীথকালে নির্জন কাননে উভয়ের মিলন

হইবার কথা। রাজপুত্র অধৈর্য হইয়া বংশীধ্বনি-দ্বারা কাঞ্চনমালাকে বারবার আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু পিতামাতা তখনও সুনিদ্রিত হয় নাই বলিয়া উতলা যুবতীর বহির্গমনে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহার উপর আবার দুর্যোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, গগনে নিবিড় মেঘরাশি ঘনাইয়া উঠে ও সহসা বারিধারা পড়িতে থাকে। হায়, তাহার মিলন পাইবার আশায় রাজপুত্রের কতই না কষ্ট! প্রিয়তমের প্রতি তাহার এই সকরুণ সহানুভূতি কবি সুকোমল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আস্মানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন ॥
বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।
ঘরের পিছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায ধর ॥
ভিজিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে।
অভাগী নিকটে থাক্লে মুছাইতাম কেশে ॥

মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীচরিত্রগুলি একনিষ্ঠ প্রেম ও অসাধারণ ত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরলা পল্লীবালার স্বাভাবিক প্রণয় শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়বিলাসের মোহ নয়, ইহা প্রিয়তমের প্রেমপূজায় আত্ম-বিসর্জন। তাহাদের নির্মল জীবন কোনখানেই বাসনা-কামনার লোলুপতায় আবিল হইয়া পড়ে নাই। কুটিলতা, ঈর্ষা, কপটতা বা চরিত্রহীনতা কাহাকেও কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুঃসহ দুঃখে, দুর্নিবার অত্যাচারে ও অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তাহাদের প্রবল প্রেমনিষ্ঠা কিঞ্চিন্মাত্রও শিথিল হয় নাই। সীতা-সাবিত্রীর পুণ্যকাহিনী অপেক্ষা মহুয়া-মলুয়ার জীবন-কথা কোন অংশেই হীন নয়। নদের চাঁদের জন্য মহুয়ার অকাল মৃত্যু-বরণ, স্বামীর জন্য মলুয়ার জীবন্ত সলিল-সমাধি, রাজকুমারের প্রেমে বিমুখ হইয়া রজক-কন্যার নদীগর্ভে আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি সীতার দুঃখ ও সাবিত্রীর তপস্যা হইতে কোন অংশে ন্যূন নয়। বঙ্গপল্লীর পর্ণকুটীরবাসী কবির তুলিকায় যে এই প্রকার প্রেমের মাধুর্য ও সতীত্বের মহিমা বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে মহাগৌরবের বিষয়।

২। নাথ-গীতিকা

একদা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে ও উহা কালক্রমে এক নবধর্মে রূপান্তরিত হয়। বুদ্ধদেবের স্থানে মীননাথ, গোরক্ষনাথ আদি গুরুবৃন্দ এই নবধর্মসম্প্রদায়ের পরম পূজনীয় হইয়া উঠেন। এই নাথ গুরুদিগের অত্যাশ্চর্য মহিমা কীর্তন করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় বাঙ্গালাকাব্য খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহারা 'নাথ-গীতিকা' নামে পরিচিত। মৈমনসিংহ-গীতিকার ন্যায় এই নাথ-গীতিকাগুলিও গ্রাম্য কবিদের দ্বারা বিরচিত ও গ্রামবাসীদের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত। মৈমনসিংহ-গীতিকার 'মহুয়া'-আদি পালা অপেক্ষা নাথগীতিকার 'গোপীচাঁদের গান'-আদি কাহিনী আকারে অনেক বৃহৎ। ইহাকে গীতিকা না বলিয়া কাব্য বলা সঙ্গত। এই নাথ-কাব্যগুলি তান্ত্রিক সাধনা ও যৌগিক শক্তির মহিমা বর্ণনায় পঞ্চমুখ। যোগীপুরুষ যে কত শক্তিশালী এবং ঐরূপ শক্তিশালী হইতে হইলে চরিত্র যে কত পবিত্র রাখিতে হয়—তাহাই ইহারা শ্রদ্ধার সহিত ঘোষণা করে। বৌদ্ধধর্মের অটুট সংযম ও হিন্দুতান্ত্রিকের অলৌকিক সাধনের সংমিশ্রণ ইহাদের চরিত্রগুলির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চিত্তসংযমের দ্বারা জাগতিক শোক-দুঃখ হইতে ত্রাণলাভে সচেষ্ট হন, কিন্তু নাথ-যোগীরা অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য পার্থিব ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সুকঠোর তন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধ ভিক্ষু 'নির্বাণ' প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর জ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, কিন্তু নাথ-গুরু 'মহাজ্ঞান' লাভ করিয়া অমরত্ব আয়ত্ত করেন। এইরূপ মহাজ্ঞানী নাথ-যোগীদের অলৌকিক মহিমা কীর্তন করাই নাথ-কাব্যের প্রধান উপজীব্য। নাথ-কাব্যগুলির মধ্যে 'গোরক্ষ-বিজয়', 'ময়নামতীর গান' ও 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' সমধিক প্রসিদ্ধ।

(১) গোরক্ষ-বিজয়

'গোরক্ষ-বিজয়' নামে যে কয়খানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কাব্যখানির রচয়িতা বলিয়া চারিজনের নাম উহার ভনিতায় দেখা যায়,—ফয়জুল্লা, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন। "ফয়জুল্লার ভনিতাই সমধিক, এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুঁথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ট

হন। সুতরাং ফয়জুল্লাকে আমরা গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন পুস্তকের আদি লেখক বলিয়া মাল্যচন্দন দিতে প্রস্তুত।"[১]

'গোরক্ষ-বিজয়'-কাব্যে নাথ-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ গুরু গোরক্ষনাথের নির্মল চরিত্রবলের অনুপম মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবতী মোহিনী-রূপে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারেন নাই, কদলী-নগরের স্বেচ্ছাচারিণী যুবতীরা তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই, মহিলা-রাজ্যের স্বাধীনা অধীশ্বরী কঠোর রাজশক্তির দ্বারাও তাঁহার মহৎকার্যে বাধা দিতে পারেন নাই। তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্র বুদ্ধদেবের ন্যায় মহীয়ান্ ও হিমাচলের মত দৃঢ়। "ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে।"[২] গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ যোগভ্রষ্ট হইয়া কদলীপত্তনের রাণীর সহিত ইন্দ্রিয়-বিলাসে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। শত শত সুন্দরী রমণীর দ্বারা সেবিত হইয়া, মনোলোভা নারীবৃন্দের মধ্যে তিনি কর্দমামুলিপ্ত বরাহের ন্যায় কামলীলায় প্রমত্ত থাকেন। ইহার পরিণামে তিনি অচিরে জরাক্রান্ত হন,—যমরাজের খাতায় তাঁহার মৃত্যুদিন ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে থাকে;—কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহার এইরূপ ঘোরতর অধঃপতনের সংবাদ শ্রুত হইয়া, তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে কদলীপত্তনে গমন করেন, এবং অটল চরিত্রবল ও অপূর্ব কৌশলের দ্বারা তাঁহাকে নারীর মোহ হইতে বিমুক্ত করেন। ইহাই গোরক্ষ-বিজয়ের মূল গল্পাংশ;—ইহাকে ইন্দ্রিয়-লালসার বিরুদ্ধে আত্মসংযমের বিজয়াভিযান বলা যাইতে পারে। গোরক্ষ-বিজয়ের কতকাংশ নিম্নে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।—

তরুতলে বসি আছে গোর্খ মহাজন।
সাক্ষাৎ হইল আসি নারী একজন॥
জল ভরিবারে আইল সরোবরকূলে।
জোগিয়ারে দেখি কৈন্যা জল ভরে আর ছলে॥
দেখিয়া নাথের রূপ কৈন্যা পড়ে ভোলে।
হানিল মদন বাণে ভেদিলেক শরে॥

১, ২, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

মনমত্ত হইযা নারী আন নাহি লয়।
চলিল সুন্দর কন্যা তেজি লাজ ভয় ॥
চাহিতে চাহিতে নারী নিশটে আইল।
আপনার গুণকথা কহিতে লাগিল ॥
হাত জে সান দিয়া কথা কহে ছলে।
পযোধরে বস্ত্র নাহি রত্তন হার দোলে ॥

(১) ময়নামতীর গান

ইহা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামেও পরিচিত। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন কর্তৃক ইহা সর্বপ্রথম সঙ্কলিত হয। ইহা একটি সুদীর্ঘ কাব্য। এই কাব্যবর্ণিত রাজা মানিকচন্দ্র ও তৎপুত্র গোবিন্দ চন্দ্র (বা গোপীচাঁদ) খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন বলিযা অনেকে অনুমান করেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র তরুণ বযসে অতুল রাজসম্পদ ও প্রাণসমা পত্নীদ্বযকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে বাধ্য হন। তাঁহার এই অকাল-সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী একদা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার লাভ করে। তাঁহার পিতামাতা রাজা মানিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর কাহিনী 'ময়নামতীর গান'-নামক কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যটি ভবানীদাস কর্তৃক বিরচিত। মানিকচন্দ্রের পৌরুষ ও ময়নামতীর মহাজ্ঞান বা যোগশক্তি ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যমদূত গোদা তাঁহার প্রাণ হরণ করিবার জন্য শিয়রে দণ্ডায়মান, কিন্তু ময়নামতীর উপস্থিতির জন্য গোদা রাজার প্রাণ লইতে সাহসী হইতেছে না। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ;—গুরুর নিকট হইতে তিনি মহাজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া ও মহাজ্ঞান-মন্ত্র-সাধন করিয়া রাজাকে দীর্ঘজীবী হইবার জন্য তিনি মিনতি করেন। কিন্তু মানিকচন্দ্র পুরুষ হইয়া নারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে কিছুতেই সম্মত হন না।—

রাজা বলে শুন ময়না বাক্য মোর ধর।
এখনি মোর মানিকচন্দ্র যমে লইয়া যাউক ॥

তিনি মরিতে রাজী আছেন তথাপি পত্নীর নিকট অবনত হইবেন না। কাজেই অচিরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা যোগিনী ময়নামতী

সহজে ছাড়িবার পাত্রী নন; তিনি যোগবলে গোদা-যমের পশ্চাতে পশ্চাতে একেবারে যমপুরীতে গিয়া উপনীত হন।—

ময়না বলে শুন যম বলি নিবেদন।
আর ছাড়িয়া দেও আমার স্বামীধন॥
তোমার স্বামীধন আমি না দিব ছাড়িয়া।
... ...
তুড়ু তুড়ু করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
যত মুনিগণক হুঙ্কারে নামাইল॥
পুষ্পরথে গোরক বিদ্যাধর।
ঢেকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর॥
... ...
মাথার চুল ময়না দুই আধ করিয়া।
গোরক নাথের চরণত পড়িল ভজিয়া॥
... ...
যত মুনিগণ পরামর্শ করিয়া।
ময়নাক আশীর্ব্বাদ দেয়॥
যা যা ময়না তোমাক দিলাম বর।
সাতমাসী ছেলে হৌক উদরের ভিতর॥

হাজার সাধ্য-সাধনা করিয়াও রাণী আর রাজাকে ফিরিয়া পান না, তবে স্বর্গবাসী মুনিদের আশীর্বাদে এক সাতমাসী ছেলে গর্ভে লইয়া মর্ত্যে ফিরিয়া আসেন। এই স্বর্গলব্ধ শিশুর নাম গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দের জীবন-সম্বন্ধে কিন্তু মুনিগণ বলিয়া দেন, "আঠার মাসে জন্ম উনিশ বৎসরে মরণ।" এই অকালমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গোবিন্দ যৌবনকালে নাথ-গুরু হাড়িকার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সকরুণ সন্ন্যাসের মর্মান্তিক কাহিনী 'গোপীচাঁদের গান' নামক কাব্যে কীর্তিত হইয়াছে।

(৩) গোপীচাঁদের গান

'রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস'—নামেও এই সুবৃহৎ কাব্যটি পরিচিত। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক উত্তর-বঙ্গ হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। ইহার

রচনা ময়নামতীর গানের রচনা-কালেই হইয়া থাকিবে। ইহার রচয়িতার নাম —দুর্লভ মল্লিক। ইহার আখ্যান-ভাগ ময়নামতীর গানেরই অনুস্মৃতি। এই দুইখানি কাব্যকে একত্র করিয়া একখানি কাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় ও উহাকে মহাকাব্য বলিতে ইচ্ছা হয়। মহাকাব্য-পাঠে হৃদয় যেরূপ বিচিত্রভাবে উদ্বেলিত, অন্তর-মধ্যে মহচ্চিন্তাধারা প্রবাহিত ও মানসপটে মহামানবের উজ্জ্বল আদর্শ প্রকটিত হয়, এই কাব্যদ্বয়-পাঠেও পাঠকের চিত্ত তদ্রূপ বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হয়। ময়নামতীর দুর্দম যোগবল, গোবিন্দের প্রবল চিত্তসংযম, পতিবিয়োগবিধুরা তরুণী রাজবধূদ্বয়ের সকরুণ বিলাপ এবং নাথ-গুরু হাড়িফার অমানুষিক যাদুশক্তি পাঠকের চিত্তফলকে গভীর রেখাপাত করে। এই কাব্য-দ্বয় পাঠ করিতে করিতে কখন বিস্মিত ও শুম্ভিত, কখন ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত, আবার কখন বা পুলকিত ও উল্লসিত হইতে হয়।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, অকাল-মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত, রাজমাতা ময়নামতীর আদেশে সন্ন্যাস লইতে বাধ্য হন। এই কোমলমতি নবীন রাজার অকাল-সন্ন্যাসের বিয়োগ-ব্যথায় 'গোপীচাঁদের গান' 'ময়নামতীর গান' অপেক্ষা অধিকতর মর্মস্পর্শী হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ পিত্রাজ্ঞায় বনবাস বরণ করেন, গোবিন্দচন্দ্রও সেইরূপ মাত্রাদেশে যৌবনবয়সে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ঐশ্বর্যময় রাজ্য ও দুই যুবতী রাণীর মধুর সঙ্গ ছিন্ন করিয়া তিনি গুরু হাড়িফার সহিত অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করেন। কণ্টকময় অরণ্য, ছায়াশূন্য প্রান্তর, উত্তপ্ত মরুভূমি—কত দুর্গমস্থল দিয়া গুরুদেব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে করিতে লইয়া চলেন। শেষে এক অজানা নগরে উপনীত হইয়া, হাড়িফা তাঁহাকে এক দুশ্চরিত্রা গণিকার নিকট বিক্রয় করেন। এই স্থানে তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বহু কঠোর নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় এবং অবশেষে অটল চরিত্রবলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥
বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী ॥
নিদের স্বপনে রাজা হব দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥
দশ গিরির মাও বইন রবে স্বামী লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে ॥

রাজা কিন্তু মৃত্যুভয়ে গৃহে থাকিতে পারিতেছেন না; অদৃষ্টের লিখনকে বিফল করিতে হইলে তাঁহাকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া মহাজ্ঞান লাভ করিতেই হইবে। ইহা শুনিয়া অদুনা স্বামীকে নির্ভয় হইতে বলিতেছেন, কারণ তিনি যমরাজকে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর আয়ু বাড়াইয়া লইবেন। "যমকে যে উপায়ে তিনি বশীভূত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সাবিত্রীর তপস্যা হইতেও বড় তপস্যা—

নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব।
মস্তকের চুল কাটিয়া চামর ঢুলাইব ॥
জিহ্বা কাটিয়া আমরা সলতে পাকাইব।
পৃষ্ঠের চর্ম্ম কাটি আমরা চাঁদোয়া টাঙ্গাইব ॥
দশ নখ কাটিয়া মোরা দশ বাতি দিব।
পায়ের মালই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব ॥
নানান পুষ্পজলে যমের সেবায় মানাব।
সেবায় মানিয়া আমরা স্বামী-বর নিব ॥

ভারতবর্ষে রমণীর প্রেম কখনই উপন্যাসী আমোদ-প্রমোদ নহে—ইহা চিরকালই তপস্যা, আত্মোৎসর্গ ও সাধনা।"[১]

গোবিন্দচন্দ্র কিন্তু কোনক্রমেই আর রাজধানীতে থাকিতে সম্মত হন না। অগত্যা রাণীদ্বয় সীতার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিতে সঙ্কল্প করেন।—

জীয়ব জীবনধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রান্ধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥

১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী ॥
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু।
গিরিলোকের বাড়ী গেলে গুরু স্বামী বলিমু।
শীতল পাটী বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥
... ...
গ্রীষ্মকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখার বাও।
মাঘমাসি শীতে ঘেষিয়া রমু গাও ॥

উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা বন্যপশুর ভীতির দ্বারা রাণীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন।

স্ত্রী আর পুরুষে যদি পথ বহিয়া যায়।
হেন দুঃখে বনের বাঘে স্ত্রীকে ধরিয়া খায়।

কিন্তু রাণী ইহাতে ভীত না হইয়া সহাস্যে প্রত্যুত্তর দেন, ব্যাঘ্রের ভয়ে কোন্ নারী স্বামিসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মতা হয়?—

খল্ খল্ করিয়া কন্যা হাসিবার লাগিল।
কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায় ॥
পুরুষের সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীকে বাঘে ধরে খায়।
ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায় ॥
খায় না কেনে বোনের বাঘে তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামীর পদতল ॥
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥

এইরূপে নাথ-গুরুদের মহিমার কথা বলিতে গিয়া কবিরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক উচ্চ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন;—পুরুষের দৃঢ়তা ও নারীর কোমলতার দ্বারা তাঁহাদের কাব্যকে মনোহর করিয়া তুলিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

[খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দী]

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে বিপুলভাবের প্লাবন বহে, তাহা সবেগে প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয় ; অবশেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার স্রোতোধারা মন্দীভূত ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। পূর্বযুগের জের টানিয়া তখনও মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, রামায়ণাদির পদ্যানুবাদ প্রভৃতি রচিত হয় বটে, কিন্তু মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কেতকাদাসের মনসার-ভাসান, কাশীদাসের মহাভারত, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, চণ্ডীদাসাদির পদাবলীর মত মনোহর কাব্য ও কবিতা আর রচিত হয় নাই। কারণ, তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আর উচ্চস্তরের কাব্যরচনার অনুকূল ছিল না।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীজাতির শোচনীয় অধঃপতন ঘটে। এই সময় দিল্লীশ্বরের প্রতাপ নির্বাপিত-প্রায়, বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রদেশের নবাবগণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী। এই সময়েই পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে অধিকার বিস্তার করে। বিলাসপরায়ণ নবাবের অক্ষম শাসনের পরিণামে বাঙ্গালাদেশে অশান্তি, অরাজকতা, বর্গীর হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। শেষে, দেশের অধিবাসিবৃন্দ নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। অবশেষে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটিলে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজ-শাসনাধীন হইয়া পড়ে। দেশের এইরূপ দুর্দিনে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র শিথিল হয়,—ধর্মকর্মের বিসর্জন দিয়া তাহারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে প্রমত্ত হইয়া উঠে। এইহেতু এইযুগে কোন বিরাট সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই।

এই অশান্তিময় যুগে সাহিত্যচর্চা করিবার মত অনুকূল অবস্থা বাঙ্গালা

দেশের খুব কম স্থানেই ছিল। কেবলমাত্র নবদ্বীপ-অঞ্চলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুশাসনে শাস্ত্র ও সাহিত্যের কথঞ্চিৎ অনুশীলন হয়। তাঁহারই অনুকম্পায় এই যুগের দুইজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই কারণে এই যুগটি—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কাল—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' নামে পরিচিত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক-গমন ঘটে। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর। কথিত আছে, তাঁহার পিতা রাজা রঘুরাম রায়ের নির্দেশক্রমে তাঁহার পিতৃব্য রামগোপালের রাজ্যাধিকারী হইবার কথা। কিন্তু তিনি তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দী খাঁকে বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা মুগ্ধ করিয়া নিজেই নবদ্বীপের রাজা হইয়া বসেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহাতে তিনি লিপ্ত হন। তাঁহারই পরামর্শে বঙ্গের শাসনভার ইংরাজের হস্তে অর্পিত হয়। কিন্তু তিনি কুটিল রাজনীতিজ্ঞ হইলেও, সুরসিক ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার রাজসভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হয এবং বহু গুণীব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যরচনায় ব্রতী হন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জ্যোতির্বিদ অনুকূল বাচস্পতি, সুরসিক গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি বহু গুণবান্ ব্যক্তি তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন। নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদ সর্বদা হাস্য-পরিহাসে পরিপূর্ণ; সেখানে সকলেই অবাধ আনন্দে নানারসের অবতারণা করেন; আদিবসের প্লাবনে, বাদ-প্রতিবাদের কোলাহলে ও বিবিধ রসাল বাক্যপ্রবাহে সকলেই মহানন্দে নিমগ্ন। যাহা হউক, এই কাব্যামোদী নৃপতির আশ্রয়ে বঙ্গভারতী সেই ঘোর দুর্দিনেও কোনরূপে আত্মরক্ষা করেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসকে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ' নামে অভিহিত করা খুবই সঙ্গত হইয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রভাবের বাহিরেও কতিপয় কবি এইযুগে আবির্ভূত হন, কিন্তু ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদের ন্যায় প্রসিদ্ধি কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ঘনরাম চক্রবর্তী ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

পূর্বগামী কবিদের অনুকরণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেও চণ্ডী, মনসা, শিব, ধর্ম, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর প্রভৃতি দেব-দেবী বিষয়ে অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়। কিন্তু পূর্বযুগের তজ্জাতীয় [illegible] তুলনায় এইগুলি অনেক নিকৃষ্ট। তবে, শিব, ধর্ম ও সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠকাব্য এই যুগেই রচিত হয়। ধর্মঠাকুরকে লইয়া যে ধর্মমঙ্গল-রচনার সূচনা চৈতন্যযুগে ঘটে, তাহার পরিপূর্ণতা হয় এই যুগে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্যে। শিবায়ন-কাব্য লিখিবার প্রয়াস ইহার পূর্বযুগে দেখা দিলেও, এই যুগের রামেশ্বর রচিত 'শিবায়ন'-খানিতেই উহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সত্যনারায়ণ ঠাকুর বিষয়ে বহু পাঁচালী এই যুগে রচিত হয়, কিন্তু ঐগুলির কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। কেবলমাত্র জয়নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ীর দ্বারা রচিত 'হরিলীলা' নামক পাঁচালীখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের স্রোত এইযুগে ক্ষীণকায় হইয়া পড়িলেও গ্রন্থরচনার বিরাম ঘটে না। নৌকাখণ্ড, কৃষ্ণবিজয়, রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনেকগুলি অখ্যাত কাব্য রচিত হয়। পদকর্তাদের মধ্যে দুইজন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন—চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর। চরিতকাব্য-জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' এবং প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বংশীশিক্ষা—মূলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-কাহিনী, কিন্তু প্রচুর বৈষ্ণবতত্ত্বের সমাবেশ আছে। নরোত্তমবিলাসে পরমবৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ মনোহরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর বৈষ্ণব-ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বীরহাম্বীর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবভক্তের জীবন-কথা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কতিপয় কবি গ্রন্থ-রচনা করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহাদের মধ্যে কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর দাস ও রামানন্দ ঘোষের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত দুইজন রামায়ণ ও মহাভারত দুই-ই রচনা করেন এবং তৃতীয়জন নিজেকে 'বুদ্ধাবতার' ঘোষণা করিয়া এক অদ্ভুত রকমের রামায়ণ রচনা করেন।

'বিদ্যাসুন্দর'-জাতীয় আদিরসাত্মক কাব্য অনেকগুলি এই যুগে রচিত হয়। এই আদিরস কিন্তু ফুল্লরা বা বেহুলার একনিষ্ঠ পতিপ্রেম নয়, ইহা আপাত-

মধুর মিথুন-বিলাসের রঙ্গীন চিত্র মাত্র। এই ইতরজনোচিত কামলীলার চিত্র তৎকালীন মুসলমানী কেতাব হইতে আগত বলিয়া অনুমান হয়। এই যুগে কতিপয় মুসলমান কবি আরবী-ফারসী-উপাখ্যানমালা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালাপদ্যে কতকগুলি কেচ্ছা রচনা করেন। এই কেচ্ছাগুলিতে স্বেচ্ছাচারী যুবক-যুবতীর অবৈধ মিলন-লীলা মনোমোহনরূপে অঙ্কিত। এইগুলির মধ্যে দৌলৎউজীরের 'লয়লা-মজনু' কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) ঘনরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। আনুমানিক ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সুবৃহৎ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করেন। যাবতীয় ধর্মমঙ্গলের মধ্যে এইখানাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় (১৮৮৪ খ্রীঃ, বঙ্গবাসী); ইহার পূর্বে অন্য কোন কবির রচিত ধর্মমঙ্গল মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ধমান-জেলায় দামোদর নদীর তটে কৃষ্ণপুর-গ্রামে ঘনরাম বাস করেন। তাঁহার পিতা—গৌরীকান্ত, মাতা—সীতা দেবী, এবং রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ নামে তাঁহার চারি পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত; তাই চারি পুত্রেরই নামের আগে রাম-নাম, আর তাঁহার কাব্যমধ্যেও বার বার রাম-নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ॥

রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

কবি অনেক ভণিতায় তাঁহার গুরুদেবের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ গুরুদেবের নিকট হইতেই তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।—

গুরুপদে যত্ন দ্বিজ কবিরত্ন
সঙ্গীত মধুরস গান॥

কোন কোন ভণিতায় কবি তৎকালীন বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংশ্রব ছিল কিনা, তাহা কোথাও তিনি ব্যক্ত করেন নাই। যথা—

অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান ॥

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' একটি বিরাট কাব্য। ইহাতে বহু ঘটনা ও বিচিত্র রসের সমাবেশ থাকায়, ইহাকে মহাকাব্য বলিলে একেবারে অত্যুক্তি হয় না। ইহা চব্বিশ পালা বা সর্গে বিভক্ত এবং প্রতি সর্গে প্রায় আড়াই শত চরণ আছে। সুতরাং ইহার অবয়ব যে অতি বৃহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্মমঙ্গল

মহাবীর লাউসেনের বিজয়-কাহিনীর দ্বারা ইহা প্রধানতঃ পরিপূর্ণ। লাউসেনের সহিত বহু বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ আছে, এবং মূল ঘটনার সংশ্লিষ্ট বহু বিস্ময়কর ব্যাপারের দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই বিশাল কাব্যটির যথোচিত সমাদর ও বিস্তৃত সমালোচনা এযাবৎ হয় নাই। ইহার অস্তিত্ব এখনও জনসাধারণের অগোচর রহিয়াছে।

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল এত বিরাট, এত এক ঘেয়ে যে সমস্ত কাব্যখানি যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্যের প্রশংসা করা উচিত হইবে।" ইহাতে বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। মহামদ ঈর্ষ্যাবশতঃ লাউসেনকে নানা বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করেন, আর লাউসেন অমিত বাহুবল ও নির্মল ধর্মভক্তির দ্বারা সেইগুলি সগৌরবে উত্তীর্ণ হন। কাজেই এই ঘটনাগুলি স্বাভাবিকভাবে না ঘটিয়া, মহামদের ইঙ্গিতক্রমেই যেন ঘটিতেছে ও সেই সঙ্গে লাউসেনের অপার মহিমা উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। লাউসেনের গৌড়-যাত্রা-পথে কামদল-শার্দুলের সহিত যুদ্ধ, নয়ানীর নিহত শিশুকে পুনরায় প্রাণদান, গৌড়েশ্বরের মহাশক্তিশালী হস্তীকে সম্মুখ যুদ্ধে নিধন ও উহার পুনর্জ্জীবন সম্পাদন—প্রভৃতি ঘটনাগুলি অনেকটা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার কৃত্রিম ঘটনার সংস্থান কাব্যটির প্রথমদিকে সমধিক; সেই কারণে ইহাকে অতীব একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু কাব্যটির মধ্যভাগ হইতে—লাউসেনের সহিত সিমুলার রাজা হরিপালের তেজস্বিনী কন্যা কানাড়ার প্রচণ্ড যুদ্ধ, ঢেকুড়-গড়ের মহাবলশালী ইছাই ঘোষের সহিত

লাউসেনের ভীষণ সংগ্রাম ও ইছাই ঘোষের পরাজয়, গৌড়-সেনাবাহিনীর ময়নাগড়-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে লখাই-ডোমনী, কলিঙ্গা ও কানাড়া প্রভৃতি নারী-বৃন্দের অসি ও ধনুঃশর লইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—ইত্যাকার বহু বৃহৎ বাস্তব ঘটনার মনোহর বর্ণনা আছে হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্বে ও ভাষার লালিত্যে এই ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ধৈর্য সহকারে সমগ্র কাব্যখানি পাঠ করিলে পাঠককে একেবারে নিরাশ হইতে হইবে না, বরং অতীত-বাঙ্গালার অন্তঃপুরচারিণীদের রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের প্রথম সর্গের নাম—স্থাপন-পালা। ইহাকে কাব্যের প্রস্তাবনা বলা যাইতে পারে। ইহাতে গণেশ, ধর্ম, শক্তি, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা করিয়া, কবি বিশ্বসৃষ্টির বিবরণ দিয়াছেন। ইহা 'শূন্যপুরাণ'-বর্ণিত সৃষ্টি-পত্তনের অনুরূপ।

দ্বিতীয় সর্গের নাম—ঢেকুর-পালা। গৌড-রাজ্যের অন্তর্গত ঢেকুরগড নামক এক জনপদের কথা এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষ সহসা গৌড়েশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠে, এবং তাহারই পরিণামে এই বিশাল কাব্যের বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রথম সূত্রপাত ঘটে। এই পালা হইতেই কাব্যটির প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালার সুবিখ্যাত রাজা ধর্মপালের "বীর্যবন্ত পুত্র" তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এই "বীর্যবন্ত পুত্র"টির নাম কাব্যের কোথাও উল্লেখিত হয় নাই। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মহামদ। মহামদ সুচতুর, পরশ্রীকাতর ও ভীষণ স্বার্থপর ;—তাঁহার দুরভিসন্ধির দ্বারা কাব্যের প্রায় যাবতীয় ঘটনা সঞ্চালিত হইয়াছে। এক বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা হওয়ায়, গৌড়েশ্বর প্রজাদের খাজনা মাপ করেন। কিন্তু ধূর্ত মহামদ রাজার অজ্ঞাতসারে সুদূর গ্রামাঞ্চলের প্রজাদিগকে নিপীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করেন ও উহা স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। সোমঘোষ নামক একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা রাজকর দিতে অসম্মত হইলে, তিনি তাঁহার "হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ি, তোকদড়ি গলে" দিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। একদিন গৌড়েশ্বর মৃগয়া-যাত্রা-কালে সেই কারাপ্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া গমন করেন এবং দৈবাৎ গজপৃষ্ঠ হইতে সোমঘোষকে কঠিন বন্ধন-দশায় দেখিতে পান। তাঁহার ঐরূপ দুর্দশার কারণ

জ্ঞাত হইয়া তিনি মহামদের উপর অতিশয় রুষ্ট হন ও কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। অনন্তর তিনি সোমঘোষকে বন্ধনমুক্ত করিয়া "সঙ্গে নিল শিকারে, চাপায়ে দিব্য ঘোড়া"।

কালক্রমে সোমঘোষের সহিত গৌড়েশ্বরের প্রগাঢ় সখ্য স্থাপিত হয়। সখার পরামর্শ না লইয়া তিনি কোন রাজকার্য পরিচালনা করেন না। ইহাতে মহামদ মনে মনে অতীব ক্রুদ্ধ ও সোমঘোষের প্রতি ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। কিন্তু গৌড়েশ্বর তাঁহার নব-বন্ধুবরকে ত্রিষষ্টিগড়েব অধিপতি করিয়া দেন। ত্রিষষ্টিগড়ে তখন কর্ণসেন আধিপত্য করিতেন। তাঁহার উপরে প্রাধান্য লইয়া সোমঘোষ রাজাজ্ঞানুসারে ত্রিষষ্টিগড়ে সপরিবারে বাস করিতে যান। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া কর্ণসেন তাঁহার ছয় পুত্রসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।—

রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হৈল গোয়ালার॥

এই ত্রিষষ্টিগড়ে সোমঘোষের শিশুপুত্র ইছাই সযত্নে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। দিনে দিনে তাঁহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমে তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরভক্তির উদয় হয়। তিনি প্রায় সর্বক্ষণ শক্তিদেবীর আরাধনায় নিমগ্ন থাকেন,—"মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে।" এক মন্ত্র-সিদ্ধ তান্ত্রিকের উপদেশে তিনি দুর্গতি-নাশিনী ভগবতীর পূজা করেন। তাঁহার নির্মল ভক্তিতে সন্তুষ্টা হইয়া জগজ্জননী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন ও তাঁহাকে মনোমত বর দিতে চাহেন। তিনি তখন দেবীকে চিরদিন তাঁহার গড়ে থাকিতে অনুরোধ করেন এবং এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন—"তোমার হাতের ঐ অসি বিনা মৃত্যু নাই মোর"। মহামায়া তাঁহার অনুগত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

যৌবনকালে মহাবলশালী ইছাই ঘোষ এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করাইয়া মহাদেবীর একটি স্বর্ণময়ী প্রতিমা স্থাপন করেন ও নিত্য ছাগ-মেষ-মহিষ বলি দিয়া মহাড়ম্বরে মহাশক্তির অর্চনা করিতে থাকেন। দেবীর কৃপায় তিনি অচিরে দুর্জয় মহাবীর হইয়া উঠেন। চতুর্দিকের পর্বতমালা বেষ্টন করিয়া তিনি এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন, দুর্গম অরণ্য কাটিয়া সুন্দর নগর স্থাপন করেন এবং নানা-জাতি প্রজাবৃন্দ বসাইয়া এক নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গড়ের পূর্বনাম ঘুচাইয়া তিনি তাহার নূতন নাম রাখেন—ঢেকুরগড়। এইরূপে

তিনি প্রবল প্রতাপশালী হইয়া কর্ণসেনের রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে সপরিবারে গড হইতে বাহির করিয়া দেন। গৌড়েশ্বরের আদেশে গঙ্গাধর ভট্ট তাঁহার নিকট রাজকর আদায় করিতে আসিয়া, ঘোরতর লাঞ্ছিত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যান। তাঁহার এইপ্রকার ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। অনতিবিলম্বে ঢেকুরগড় আক্রমণ করিবার জন্য তিনি গৌড়-সেনাদলকে সজ্জিত হইতে আদেশ দেন। তখন চারিদিকে "সাজ সাজ সত্বরে" রব পড়িয়া যায়, ঘোর রোলে রণদামামা বাজিয়া উঠে, বার ভূঁইয়ার বীর যোদ্ধারা দলে দলে আসিয়া গৌড়ের রাজনিকেতন-তলে সমবেত হয়। সেই বিপুল সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া কর্ণসেন তাঁহার ছয় পুত্রসহ উদ্ধত ইছাইকে শায়েস্তা করিতে যাত্রা করেন।

এদিকে ইছাই ঘোষ বিশাল গৌড়-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের বার্তা পাইয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়েন। এই নিদারুণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তিনি দিবানিশি একান্তচিত্তে দুর্গতি-নাশিনী ভগবতীর স্তব করিতে থাকেন। তাঁহার সকরুণ মিনতিতে ভগবতীদেবী বিচলিতা হইয়া তাঁহাকে অভয় দেন—ঢেকুরগড়ের দুর্দান্ত কোটাল লোহাটার হস্তে গৌড়-সেনাদলের পরাজয় হইবে। যথাকালে লৌহসদৃশ-দৃঢকায় লোহাটার নিক্ষিপ্ত শরজালে বিপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী জর্জরিত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং কর্ণসেনের ছয়পুত্র তাহাতে নিহত হয়। তখন পরাজিত কর্ণসেন ছয়পুত্রের মৃত্যুশোক বুকে লইয়া স্বীয় পরিবার-বর্গের নিকট ফিরিয়া যান। তাঁহার ছয় পুত্রবধূ তাঁহার চোখের সম্মুখে প্রচণ্ড চিতানল জ্বালিয়া ও উহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া মৃতপতির অনুগমন করে। সেই নির্মম দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্নীও তৎক্ষণাৎ বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। হায়, রাজ্যহীন কর্ণসেন একসঙ্গে পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ সকলকেই হারান।

হতভাগ্য কর্ণসেনের সেই নিদারুণ দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে নিজের নিকটে লইয়া আসেন। তাঁহার দুঃসহ দুঃখ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পুনরায় বিবাহ ও নূতন জায়গীর দিবার প্রস্তাব করেন। কি আশ্চর্য মানুষের মন, এইরূপ শোকজর্জর অবস্থাতেও কর্ণসেনের "মনেতে বাড়িল সংসার-বাসনা!"

তৃতীয় সর্গের নাম—রঞ্জাবতীর বিবাহ। রঞ্জাবতী গৌড়াধিপতির একমাত্র রূপসী শ্যালিকা। বাল্যকাল হইতে তিনি রাজমহিষীর সহিত গৌড়-প্রাসাদে লালিতা-পালিতা। এক্ষণে তিনি বিবাহ-যোগ্যা হওয়ায়, তাঁহার সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিতে গৌড়েশ্বর মনস্থ করেন। কিন্তু এই বিবাহে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। একে কর্ণসেন হৃতসর্বস্ব, তাহার উপরে প্রায় বৃদ্ধ। ওদিকে নব-কিশোরী রঞ্জাবতী প্রধান-মন্ত্রী মহামদের অতিস্নেহের কনিষ্ঠা ভগ্নী। তিনি নিশ্চয় এই বিবাহে সম্মতি দিবেন না। যাহা হউক, অবশেষে মহামদকে রাজকার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া, সেই অবকাশে কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ রাজা তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলেন। বিবাহের পরে তিনি কর্ণসেনকে পরামর্শ দেন—

বিবাহ করেছ তুমি পাত্র অগোচরে।
কি জানি কুচক্রী আসি কতখান করে॥
সত্বর সুযুক্তি তার শুনহ সম্প্রতি।
দক্ষিণ ময়নাভুমে করহ বসতি॥

যথাকালে মহামদ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ভগ্নীর বিবাহ-বৃত্তান্ত শুনিতে পান ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হন।—

হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠি বলে, "হায়, হায়!
এ তাপ বাপের পুত্রে সহা নাহি যায়॥
মাথায় উঠেছে গিয়া চরণের জুতা।
... ...
ভাল মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল।
প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হতে মলো।
দৈবকী হইলা রঞ্জা, উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥"

পরম-রূপবতী রঞ্জাবতীকে পাইয়া পরম-ভাগ্যবান কর্ণসেন পুনরায় পরমানন্দে ময়নাগড়ে কাল যাপন করেন। কিন্তু অনতিকাল পরে রঞ্জাবতীর মন পিতামাতা ও ভ্রাতাভগ্নীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মহামদের ভয়ে তাঁহার পিতা বেণুরায় বা জ্যেষ্ঠা সহোদরা গৌড়েশ্বরী—কেহই তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন না। তাঁহাদের এইরূপ ঔদাসীন্যে তিনি বড়ই মর্মপীড়িতা

হন ও প্রৌঢ় স্বামীকে একবার গৌড়ে গিয়া তাঁহাদের কুশল-সংবাদ জানিয়া আসিবার জন্ম বারংবার সকরুণ মিনতি করেন। ইহাতে কর্ণসেন কঠিন সমস্যায় পড়িয়া যান ;—বিনা-আমন্ত্রণে শ্বশুরালয়ে যাইতে তাঁহার সাহস হয় না, অথচ সুকোমলা কিশোরী বধূর বেদনামলিন মুখচ্ছবি তিনি সহ্য করিতেও পারেন না। অবশেষে,

বিষম নারীর দায়, এড়াতে না পারি রায়
যাত্রা করে গৌড়ের সহর।

গৌড়-রাজপ্রাসাদের সুবৃহৎ সভাকক্ষে পাত্রমিত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া গৌড়েশ্বর রাজপণ্ডিতের মুখে মথুরার রাজা পাপাশয় কংসের কাহিনী শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময়ে কর্ণসেন সহসা সেই রাজসভায় প্রবেশ করেন। বহু দিন পরে প্রিয় সখার সাক্ষাৎ পাইয়া মহারাজা অতিশয় আহ্লাদিত হন। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ও নিজের সম্মুখে বসাইয়া তিনি রঞ্জাবতীর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি রাজার এইরূপ আন্তরিক প্রীতি দেখিয়া মহামদের অত্যন্ত ঈর্ষা হয়। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে তিনি তখন গৌড়পতিকে একটি প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করাইয়া দেন—যে-পুরুষ নিজে আটকুড়া ও যাহার পত্নী বন্ধ্যা, তাহার মুখ দেখিলে পাপ হয়। তাঁহার এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ সলজ্জভাবে সভাকক্ষ হইতে প্রস্থান করেন ও সেই সঙ্গে পাত্রমিত্রাদি সকলেই উঠিয়া যান। কেবল হতমান কর্ণসেন সেই সুবিশাল প্রকোষ্ঠে নিতান্ত বিমূঢ় অবস্থায় একাকী পড়িয়া থাকেন। অনন্তর ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় তিনি নীরবে সেস্থান হইতে ময়নাগড়ে ফিরিয়া যান, রাজপুরী-মধ্যে আর প্রবেশ করেন না।

প্রবীণ স্বামীর প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইপ্রকার দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া রঞ্জাবতী অতীব মর্মাহত হন। তাঁহার সন্তান-লাভের বয়স পূর্ণ না হইতেই, নিষ্ঠুর সহোদরের এইরূপ কটূক্তি তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়া ফেলে। তিনি যে কোনদিন জননী হইতে পারিবেন, তাঁহার বৃদ্ধ স্বামী হইতে সে-আশাও বড় বিশেষ নাই। ইহার কিয়দ্দিন পরে উৎসবপুর-গ্রামে সুখদত্ত বারুইয়ের পুত্র ধর্ম-পূজার আয়োজন করে। সেই উপলক্ষে ধর্ম-গাজনের একটি দল ময়নাপুরে আসে। স্বর্ণময় চতুর্দোলায় ধর্মঠাকুরের সুন্দর খড়ম, তাহার চারিদিকে ঢাকঢোলের সুমধুর বাদ্যধ্বনি ও ভক্তবৃন্দের মনোহর নৃত্যগীত—এই আনন্দময়

পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া রঞ্জাবতী অতীব বিমুগ্ধ হন। ধর্মদেবের কৃপায় পুত্র-সন্তান লাভ হয় শুনিয়া তিনি আন্তরিক ভক্তির সহিত নানাবিধ পূজার উপাচার গাজন-দলটিকে দান করেন ও যাবতীয় ধর্মপূজাবিধি জানিয়া নেন।

চতুর্থ সর্গের নাম—হরিশ্চন্দ্র-পালা। ইহাতে ধর্মদেবতার মহিমা-বিষয়ক একটি অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কাব্যের মূল গল্পের সহিত ইহার কোনই সংযোগ নাই। ধর্মপূজার বিধান ভয়ানক কঠিন দেখিয়া কর্ণসেন তাঁহার তরুণী পত্নীকে ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে নিষেধ করেন। তখন রঞ্জাবতী এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বলিয়া স্বামীর সম্মতি লইতে চেষ্টা করেন। মহাভারত-বর্ণিত দাতা-কর্ণের পুত্রবলিদানের গল্পটাই এখানে রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাণী মদনা ও রাজকুমার লুহিশ্চন্দ্রের নামে বলা হইয়াছে। এই গল্পটি শুনিয়া কর্ণসেন অবশেষে তাঁহার সুকোমলা বধূকে ধর্মদেবতার সুকঠোর আরাধনা করিতে অনুমতি দেন।

পঞ্চম সর্গের নাম—শালেভর পালা। এই পালায় রঞ্জাবতী কর্তৃক ধর্মদেবের পূজা ও কৃচ্ছ্রসাধনা বর্ণিত হইয়াছে। দাসদাসী ও পূজারীবৃন্দ সঙ্গে লইয়া রঞ্জাবতী এক শুভদিনে "চাঁপায়ের ঘাটে" আসেন। এই ঘাটটি ধর্ম-ঠাকুরের একটি পরম তীর্থ। এই তীর্থস্থানে তাঁহার অনুচরেরা অচিরে একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করে। তখন তিনি পবিত্রভাবে ধূপধুনা ও ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া, চিনি-কলা-ক্ষীর-বাতাসা দিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া ও চন্দনচর্চিত চম্পা-পুষ্প লইয়া শ্রীধর্মের পূজায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সঙ্গীরাও ধর্মঠাকুরকে প্রসন্ন করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে বসে। কেহ এক পায়ে দাঁড়াইয়া, কেহ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া ধর্মের নাম জপিতে থাকে। কেহ নিজের মাথার উপরে ধূপধুনা পুড়ায়, কেহ বা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া পূজামন্ত্র উচ্চারণ করে। তথাপি ধর্মদেবতার কোনই সাড়া পাওয়া যায় না। রঞ্জাবতী সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন—

> অনাথ-বান্ধব ধর্ম্ম হও কৃপাবান্।
> অভাগিনী রঞ্জা মাগে এক পুত্রদান॥

অনন্তর রঞ্জা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপর হেটমুণ্ড হইয়া রহেন এবং বাদকেরা ঘোর রোলে শিঙ্গা-কাড়া-ঢাক-ঢোল বাজাইতে থাকে। কিন্তু ইহাতেও আরাধ্য দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন না। তখন পুরোহিত রামাইপণ্ডিতের

নির্দেশে তিনি সূর্যের ধ্যান, অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান প্রভৃতি আরো বহুপ্রকার দুশ্চর তপস্যা করেন। তাহাতেও ইষ্টদেবতার কৃপালাভ করিতে না পারিয়া, তিনি অগত্যা "শালেভর" দিয়া দেহবিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হন। তাঁহার সহচরী সামুলাও তাহাতে সম্মতি জানায়।—

অসার সংসার আশ পুত্রবিনা গৃহবাস
ত্রাস না করিহ কিছু মনে।
শালে মর যদি স্যাৎ বাঁচাবে বৈকুণ্ঠনাথ।

ধর্মদেবের উপর নিঃসংশয় বিশ্বাস রাখিয়া তিনি যখন সত্যই ক্ষুরধার শালের উপরে ঝম্পপ্রদান করেন, তখন স্বয়ং ধর্মদেব তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট বর প্রদান করেন। সেই বরেই এই কাব্যের প্রধান নায়ক লাউসেনের জন্ম হয়।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সর্গত্রয়ে লাউসেন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্পূরসেনের জন্ম, তাঁহাদের শৈশবলীলা, বাল্যশিক্ষা, মল্লক্রীড়া, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মদেবতার প্রধান বাহন হনুমান স্বর্গ হইতে গুরুর ছদ্মবেশে ময়নাগড়ে আসিয়া তাঁহাদের সযত্নে শিক্ষা দেন। কালক্রমে লাউসেন সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসিয়া সারঙ্গধল-প্রমুখ মহাবলশালী মল্লবীরেরাও পরাজিত হয়। এইরূপে যৌবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন তিনি গৌড়নগরে গিয়া তাঁহার মাতামহ, মাতৃষসা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার স্নেহময়ী জননীর নিকট তিনি সাগ্রহে নিবেদন করেন—

বড় সাধ যাব মামা মেসোদের ঘরে॥
লোকে বলে মার চেয়ে মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি॥

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গচারিটিতে কর্পূরসহ লাউসেনের গৌড়-যাত্রা ও যাত্রাপথে বহুবিধ ভয়ঙ্কর বিপদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। লাউসেন যে বাহুবল ও ধর্মবলে কত বলবান্, তাহাই প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে কবি তাঁহার গৌড়-যাত্রা-পথে ভীষণ বিপজ্জালের সৃষ্টি করিয়াছেন; আর, তিনি অসীম বিক্রমে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিয়া স্বীয় গন্তব্য-পথে আগাইয়া

চলিয়াছেন। জলন্দার গড়ের নিবিড় অরণ্য-মধ্য দিয়া গমনকালে কামদল-নামক এক ভয়ঙ্কর হিংস্র ব্যাঘ্রকে তিনি নির্ভয়ে নিহত করেন। জামতি-নগরে উপনীত হইলে, শিবাইদত্ত বারুইয়ের দুষ্টচরিত্রা পত্নী তাঁহার নিরুপম যৌবন-সৌন্দর্য দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়া ওঠে ও তাঁহাকে করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল করে। কিন্তু তাহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া সে তাহার সঙ্গের শিশুপুত্রটিকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে, এবং লাউসেন উহা করিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোষণা করে। সেই চীৎকারে বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে নির্মম প্রহার করিতে করিতে কারাগারে লইয়া যায়;—তিনি যে নিরপরাধ, তাহা কেহই বিশ্বাস করে না। তখন তিনি ভক্তিসহকারে ধর্মদেবতার নাম স্মরণ করিয়া, সেই মৃতশিশুর অঙ্গে তাঁহার পবিত্র হস্ত বুলাইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত ও তাহারই মুখ দিয়া সত্য ঘটনা প্রকাশিত করেন। অনন্তর তাঁহারা গোলাহাট-গ্রামে উপনীত হইলে রাত্রিকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। সুরিক্ষা-নামে এক পরম-রূপসী বারাঙ্গনা সাদরে তাঁহাদের আতিথ্য দান করে। পরম রূপবান লাউসেনের সম্মিলন-লাভের নিমিত্ত সে বহুবিধ কৌশল বিস্তার করে; কিন্তু তিনি সকলই বিফল করিয়া দিয়া গৌড়ের পথে অগ্রসর হন।

ত্রয়োদশ সর্গের নাম—হস্তিবধ। মহাবীর লাউসেন কর্তৃক এক মদমত্ত হস্তীর নিধন-কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কর্পূর-সহ তিনি গৌড়-নগরে উপনীত হইয়া প্রথমে লাউদত্ত কর্মকারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দৈবক্রমে হিংসাপরায়ণ মহামদ তাঁহাদের আগমন জানিয়া ফেলেন। তিনি তখন সমস্ত সহরে এক জরুরী আদেশ ঘোষণা করিয়া দেন যে, রাত্রিকালে কোন প্রবাসী-পুরুষকে কোন গৃহস্থই আশ্রয় দান করিবে না। সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয় রজনী-যাপনের জন্য লাউদত্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া এক বিজন প্রান্তরের একটি বিশাল বৃক্ষতলে শয্যা রচনা করেন। তাঁহাদের গভীর নিদ্রাকালে, মহামদের চক্রান্তে, একটি রাজ-হস্তীকে সেই বৃক্ষকাণ্ডের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। উহার পরিণামে, পরদিন প্রভাতকালে রাজপুরুষেরা লাউসেনকে হস্তী-চোর সাব্যস্ত করিয়া কারাগারে লইয়া যায় ও নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করে। যমদূত-প্রায় প্রহরীরা তাঁহাকে অন্ধকার কারাকক্ষে আবদ্ধ করে; তাঁহার বক্ষের উপরে বিশাল শিলাখণ্ড ও উভয় পার্শ্বে "করাত শেল" রাখিয়া

দেয়। সেই দুঃসহ যন্ত্রণায় নিদারুণ ব্যথিত হইয়া তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা ধর্মদেবের কৃপা সকাতরে প্রার্থনা করেন। সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক হইয়াও তিনি যদি মিথ্যা অপরাধে নির্যাতিত হন, তাহা হইলে ধর্মের মহিমা থাকিবে না, ধর্মের শরণ কেহই লইবে না।—

প্রহারে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস চোর-বাদে হলে নাশ
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে॥

ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে কৃপাময় পরমেশ্বর অলক্ষ্যে থাকিয়া ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সেই দিবস নিশাকালে ধর্মদেব গৌড়েশ্বরকে স্বপ্নযোগে হস্তীচোরের সুবিচার করিবাব জন্য আদেশ দেন। বিচারকালে সেই হস্তীচোরের অতিসুন্দর রূপ ও অতুল যৌবনশ্রী সন্দর্শন করিয়া রাজা ও সভাসদ্‌বর্গ সকলেই অতিশয় বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হন। মহারাজ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া সক্ষোভে বলেন—

মেসো মহারাজ সঙ্গে সাধ ছিল দেখা।
সিদ্ধ হইল, দুঃখ কিন্তু কপালের লেখা॥

মিথ্যা চোরের সত্য পরিচয় পাইয়া মহারাজার নয়নদ্বয় অশ্রুসজল হয়, দুই বাহু বাড়াইয়া দুই শ্যালিকা-পুত্রকে নিজের কাছে টানিয়া নেন ও সস্নেহে তাঁহাদের পিতামাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি মহারাজার এই প্রকার আন্তরিক প্রীতি দেখিয়া মহামদের চিত্ত ঈর্ষ্যানলে জ্বলিয়া উঠে। তিনি সক্রোধে মহারাজার আচরণের প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা বস্তুতঃ রঞ্জাবতীর পুত্র নয়।—

আমার ভাগিনা হলে আমি নাহি চিনি।
সভাটা ভুলালে চোরা জানে কি মোহিনী॥
... ...
তবে যে নিশ্চয় হয় রঞ্জার নন্দন।
হাতাহাতি হাতীর সহিত দেহ রণ॥

লাউসেন সুবিখ্যাত মহাবীর, মহাবলশালী হস্তীও তাঁহার সহিত যুদ্ধে

পরাজিত হয়। কাজেই এই অজ্ঞাত-কুলশীল যুবককে গৌড়েশ্বরের প্রধান হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আত্মপরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হইবে। এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সেই অতিকায় হস্তীর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ লাউসেন নির্ভয়ে অবতীর্ণ হন। উহার দুর্বার আক্রমণ তিনি কৌশলে এড়াইয়া যান, এবং সহসা উহার দুই বিশাল দন্ত ধরিয়া উহার মস্তকে "বজ্রলাথি" মারেন। সেই ভীম পদাঘাতে উহা চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাতে পিছাইয়া যায়; কিন্তু মাহুতের অঙ্কুশের ঘাযে উহা পুনরায় আগাইয়া আসে ও তাঁহাকে শুঁড় দিয়া বেড়িয়া শূন্যে তোলে। কিন্তু তিনি তাঁহার সুদৃঢ় পদদ্বয় দ্বারা উহার গলদেশ চাপিয়া ধরেন ও মস্তকে বজ্রমুষ্ঠি মারেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে করিকুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া যায় ও সবেগে রক্তধারা নির্গত হইতে থাকে। সেই মুহূর্তে তিনি উহার সুদীর্ঘ দন্তদ্বয় সবলে উৎপাটিত করেন। তখন গজবর হতবল হইয়া ভূতলে পতিত হয় ও দর্শকমণ্ডলী বিজয়ী বীরের জয়ধ্বনি করে। অতঃপর মহামদের আদেশে তিনি ধর্মদেবতাব নাম লইয়া সেই নিহত হস্তীকে পুনর্জীবিত করিয়া তোলেন। কিন্তু ইহাতেও মহামদ তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেন না;—তাঁহাকে একটি উন্মত্ত দুর্দান্ত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে বলেন। এই তৃতীয় পরীক্ষাতেও তিনি অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হন। সুতরাং তাঁহাকে লাউসেন বলিয়া আর অস্বীকার করিতে মহামদ পারেন না। তখন গৌড়েশ্বর সানন্দে উভয় ভ্রাতাকে রাজপুরী-মধ্যে মহারাণী-ভানুমতীর নিকট লইয়া যান। স্নেহময়ী ভানুমতী কনিষ্ঠা ভগ্নীর নয়নরঞ্জন পুত্রদ্বয়কে সন্নিকটে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হন।

গৌড়-নগর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে লাউসেন তাঁহার ভ্রাতাসহ এক অনার্য ডোমপল্লীতে প্রবেশ করেন। তাহাদের দলপতি কালুডোমের বলিষ্ঠ দেহ ও দুর্জয় সাহস দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হন ও তাহাকে সদলবলে ময়নাগড়ে গিয়া বসতি করিতে অনুরোধ করেন। সেই দুর্দান্ত ডোমদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি যথাকালে পিতৃভবনে আসিয়া উপনীত হন। কালুডোম কালক্রমে তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষণে বৃদ্ধ কর্ণসেন তাঁহার অসীম বীরত্ব ও অশেষ গুণরাশির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার হস্তেই ময়নাগড়ের শাসনভার অর্পণ করেন।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সর্গদ্বয়ে মহাবীর লাউসেনের কামরূপ বিজয়-কাহিনী

বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন নবীন সামন্ত-রাজ হইয়া ময়নাগড়ে সুযোগ্যতার সহিত আধিপত্য করিতে থাকেন, তখন মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কামরূপ-রাজ্য জয় করিতে আদেশ করেন। কালু-প্রমুখ দুর্ধর্ষ ডোমদল ও রণকুশল গৌড়সেনাদল সঙ্গে লইয়া তিনি কামরূপের সীমান্তে নির্বিঘ্নে উপনীত হন। কিন্তু কামরূপ তন্ত্রমন্ত্রের দেশ; তথায় অস্ত্রবলের দ্বারা জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি তাঁহার বিপুল সৈন্যবল প্রয়োগ করিয়াও সেই রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। অগত্যা তিনি মন্ত্রসাধনায় প্রবৃত্ত হন ও কামরূপ বিজয়-মন্ত্র আয়ত্ত করেন। সেই মহামন্ত্রের বলে তিনি সংগোপনে সসৈন্যে সেই রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করেন ও অতর্কিতভাবে তথাকার রাজা কর্পূরধলকে বন্দী করেন। গৌড়েশ্বরকে রাজকর দিতে অঙ্গীকার করিয়া কর্পূরধল বন্দী-দশা হইতে বিমুক্ত হন ও রাজকুমারী কলিঙ্গাকে তাঁহার করে অর্পণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। গৌড়-প্রত্যাবর্তন-পথে তিনি মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা ও বর্ধমানের রাজকুমারী বিমলার পাণিগ্রহণ করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গদ্বয়ে সিমুলার রাজকন্যা কানড়ার সহিত লাউসেনের পরিণয় বর্ণিত হইয়াছে। মহামদের দুরভিসন্ধিতে প্রৌঢ়বয়স্ক গৌডেশ্বর সিমুলাপতি হরিপালের নিকট তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা কানড়াকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করেন। সন্দেশ-বাহক গঙ্গাধর ভট্ট ক্ষীর, সন্দেশ, লাড়ু, মণ্ডা প্রভৃতি সুমিষ্ট খাদ্যসামগ্রী ও স্বর্ণহীরকমণ্ডিত বলয়, কেয়ুর, কিঙ্কিণী প্রভৃতি চাকচিক্যময় অলঙ্কাররাজী রাজকন্যার উপহার-স্বরূপ সঙ্গে লইয়া সিমুলার রাজপ্রাসাদে গমন করেন। কিন্তু কানড়া তেজস্বিনী যুবতী, নানাবিদ্যায় পারদর্শিনী, শক্তীশ্বরী চণ্ডীদেবীর পূজারিণী ও যুদ্ধক্ষেত্রে রণরঙ্গিণী। তিনি মনে মনে সুবিখ্যাত মহাবীর লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তাই বৃদ্ধপ্রায় গৌডেশ্বরের বিবাহ-প্রস্তাব তিনি সক্রোধে উপেক্ষা করেন ও গঙ্গাধরকে ঘোরতর অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাঁহার এইপ্রকার ঔদ্ধত্যের সমাচার অবগত হইয়া গৌড়াধিপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও তাঁহাকে বলপূর্বক বিবাহ করিতে সংকল্প করেন। তিনি অবিলম্বে বিচক্ষণ মহামদ সহ নবলক্ষ সৈন্য লইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে সিমুলা-রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন।

হরিপাল, গৌড়েশ্বরের অধীন সামন্ত-রাজা মাত্র। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে সুবিশাল সৈন্যবাহিনীসহ গৌড়পতির অভিযান-বার্তা পাইয়া তিনি

অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন। গৌড়েশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্ত তিনি কানড়াকে সানুনয়ে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা কানড়া তাঁহার কথায় কোনক্রমেই সম্মত হন না দেখিয়া, তিনি দুর্বিনীতা কন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ বাসডিঙ্গাগড়ে পলাইয়া যান। এদিকে গৌড়পতি সদলবলে সিমুলার সীমান্তে আসিয়া বিশাল শিবির স্থাপন করেন। নিঃশঙ্কিনী কানড়া কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিতা না হইয়া, তাঁহার দুর্মুখা-দাসীর দ্বারা একটি বৃহৎ লৌহময় গণ্ডার গৌড়েশ্বরের শিবিরে পাঠাইয়া দেন। দুর্মুখা সদর্পে মহারাজকে নিবেদন করে—

কৈলাস হইতে দেবী দিল এই গণ্ডা।
এক চোটে যে জন করিবে দুই খণ্ডা॥
সে হবে কানড়া-পতি ঈশ্বরী-আদেশে।
কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষে॥

সেই অপূর্ব লৌহ-গণ্ডারের সুদৃঢ় মূর্তি দেখিয়া কুঞ্চিতচর্ম গৌড়েশ্বর নিদারুণ হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। কিন্তু মহামদ তাঁহাকে তাঁহার যৌবনকালের বীরত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উৎসাহিত করিয়া তোলেন। পাঁচটি শক্তিশালী সৈনিক তাঁহার কটিদেশ ধরিয়া তাঁহাকে গণ্ডারটির সম্মুখে তুলিয়া ধরে, "হানিবে বীর-দাপে" বলিয়া মহামদ হুঙ্কার দিয়া উঠেন এবং তিনিও তন্মুহূর্তে তাঁহার অস্থিসার বাহু কোনক্রমে সঞ্চালিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা উহার দেহে কোপ মারেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধোমুখ হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। তখন মহামদ এক তীক্ষ্ণধার অসি লইয়া গণ্ডারটা দ্বিখণ্ডিত করিতে সদর্পে আগাইয়া যান; কিন্তু খর্বতাবশতঃ উহার গলদেশের নিম্নে পড়িয়া থাকেন। সুতরাং একটি উচ্চ মঞ্চের উপর উঠিয়া তিনি উহার পৃষ্ঠদেশে কোপ মারিতে উদ্যত হন, তাঁহার সর্বাঙ্গ সহসা বিকম্পিত হইয়া উঠে এবং তিনি সজোরে ভূতলে পড়িয়া যান। পতনকালে তাঁহার হস্তস্থিত তরবারি গণ্ডারের দুর্ভেদ্য দেহে আহত হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং উহার একখণ্ড তাঁহার ললাটদেশে বিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরস্ত না হইয়া তাঁহার অধীন নবলক্ষ সৈন্তকে একে একে গণ্ডারটা দ্বিখণ্ডিত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তাহাদের কেহই ঐ অসাধ্য কার্য করিতে অগ্রসর হয় না। সুতরাং মহাবীর লাউসেনের প্রয়োজন তখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে।

অনন্তর লাউসেন তথায় আগমন করিলে, গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া লৌহগণ্ডারটাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে তিনি আদিষ্ট হন। তিনি পরম ভক্তি সহকারে ধর্মদেবতার ধ্যান করিয়া এক গুরুভার তরবারির দ্বারা উহার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড আঘাত করেন ও উহা তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। তখন কানড়ার ধুমসী-দাসী এক স্বর্ণপাত্রে বরমাল্য লইয়া তাঁহার সন্নিকটে উৎফুল্লভাবে আগাইয়া আসে, কিন্তু মহামদ চক্ষের নিমেষে মালাটি উঠাইয়া লইয়া গৌড়েশ্বরের গলায় পরাইয়া দেন,—কারণ ভৃত্যের অর্জিত ধনে প্রভুরই অধিকার। কিন্তু লাউসেন ব্যতীত অপর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে সতীসাধ্বী কানড়া কোনক্রমেই সম্মতা হন না। ইহাতে মহামদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সিমুলাগড় আক্রমণ করিতে সংকল্প করেন,—দুর্বিনীতা কানড়াকে বন্দিনী করিয়া গৌড়পতির চরণে সমর্পণ করিবেন। হরিপাল যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের গড় রক্ষা করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি লাউসেনকে বাসডিঙ্গাগড় অবরোধ করিয়া রাখিতে প্রেরণ করেন। অতঃপর গৌড়েশ্বরের নবলক্ষ সৈন্য সহসা বজ্রনিনাদে রণডঙ্কা বাজাইয়া সিমুলাগড়ের চারিদিক আবেষ্টন করে ও শিলাবৃষ্টির ন্যায় অজস্র গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। অসহায়া কানড়া তখন তাঁহার পরমারাধ্যা দুর্গাদেবীর শরণাপন্না হন; আলুলায়িত কেশে ভূতলে লুণ্ঠিতা হইয়া দুর্গতিনাশিনীর কৃপা সকাতরে প্রার্থনা করেন। সতী-নারীর রক্ষাকারিণী মহিষমর্দিনীদেবী তন্মুহূর্তে তাঁহার "নিজ সেনা, চৌষট্টি যোগিনী-দানা" কানড়ার রক্ষার্থে প্রেরণ করেন। তখন ধুমসী-দাসী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া, সেই ভয়ঙ্করী ডাকিনী-যোগিনীদের লইয়া গৌড়-বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধের বর্ণনা ভারতচন্দ্রের "দক্ষযজ্ঞ-নাশ"-বর্ণনার অনুরূপ—

করয়ে তর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সমরে সেনাগণ সংহারে যেছন
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে॥'
দাদালিয়া দাবড়ে চাটী চড় চাপড়ে
কামড়ে পাড়ে হাতী ঘোড়া।
ঝটপটী ছটফটী রণশির লটপটী
ভূতলে জড়ায়ে জামাজোড়া॥

টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ সঘনে সন্ সান্
ঝন্ ঝান্ ঘন রণ-নাদ।
শুনিয়া বিপরীত ভূপতি চমকিত
মামুদা ভাবে পরমাদ॥

শ্মশান-বিহারিণী প্রেতিনীদের প্রচণ্ড আক্রমণে গৌড়-সেনাগণ দলে দলে প্রাণত্যাগ করে ও শত শত সংখ্যায় রণস্থল হইতে পলাইয়া যায়। রণনিপুণা ধুমসী-দাসী অবশেষে অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে কানড়ার কক্ষে প্রবেশ করে। রণজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ এক বিশাল হস্তীর ছিন্ন শির ও এক যমাকৃতি সৈন্যের কর্ত্তিত মুণ্ড সে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া আনে,—তাহার প্রতি-পদক্ষেপে রক্তবিন্দু ঝরিয়া পড়ে।—

রণধূলি রুধির ভূষিত সর্ব্ব গা।
টস্ টস্ পড়ে রক্ত পসারিতে পা॥

বঙ্গরমণীর এইরূপ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

ওদিকে বাসডিঙ্গাগড়ে লাউসেন হরিপালের পথ অবরোধ করিয়া আছেন। তথায় তাঁহার বিশেষ কিছুই কবিবার নাই। গভীর নিশীথকালে তাঁহার চিত্ত সহসা অকারণে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। তাঁহার মনে আশঙ্কা জাগে, হয় তো কুচক্রী মাতুলের দুর্বুদ্ধিতে তাঁহার "মেসো"-মহাশয় কোন ঘোর সংকটে পড়িয়াছেন। তিনি তখনই কালুবীরকে সঙ্গে করিয়া সিমুলার দিকে যাত্রা করেন এবং প্রায় প্রভাতকালে গতদিনের যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন। সেস্থানে চতুর্দিকে রাশি রাশি মৃতদেহ দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়। তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে, সিমুলাগড়ে এমন কেহ আছেন যিনি দৈববলে বলীয়ান। যাহা হউক, তিনি অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ও এক তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং বিনা বাধায় পঞ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া মহল-দুয়ারে উপনীত হন। তখন তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী কানড়া [illegible] বীরাঙ্গনার ভূষণে সজ্জিতা হইয়া ও এক সালঙ্করা ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আগমন করেন;—শুভক্ষণে ধর্ম্মবীর ও শক্তিসাধিকার পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে।—

লাউসেন ঘোড়ায় কানড়া ঘুড়ী-পিঠে।
শুভক্ষণ সাক্ষাৎ মিলন দিঠে দিঠে॥

কানড়া যুক্তকরে তাঁহাকে সবিনয়ে নিবেদন করেন, "তোমার বনিতা আমি, তুমি প্রাণনাথ।" কিন্তু তিনি তাহাতে আপত্তি জানাইয়া গৌড়েশ্বরকেই বিবাহ করিতে কানড়াকে পরামর্শ দেন। কানড়া তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলেন, "যেজন হানিবে গণ্ডা সেই প্রাণনাথ।" প্রাণনাথ যদি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তিনি যুদ্ধের দ্বারা তাঁহাকে জয় করিয়া লইবেন। তখন তাঁহারা উভয়ে ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হন এবং শক্তীশ্বরী দুর্গাদেবীর কৃপায় কানড়ার হস্তে লাউসেন পরাজিত হন। কাজেই তিনি কানড়াকে যথারীতি বিবাহ করিয়া গৌড়েশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ সর্গদ্বয়ে লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ-বধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়েশ্বরের আশ্রিত সোম ঘোষের দুর্দান্ত পুত্র ইছাই তখন বিদ্রোহী হইয়া ঢেকুরগড়ে আধিপত্য করিতেছেন। মহামদের চক্রান্তে, তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত লাউসেন প্রেরিত হন। এইবার দুই সমকক্ষ মহাবীরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়;—তাঁহারা উভয়েই বাহুবল ও ধর্মবলে অসাধারণ বলবান। এই যুদ্ধের সূচনাতে লাউসেনের অনুগত কালুডোম অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করে ও ইছাইয়ের প্রধান যোদ্ধা লোহাটা-কোটালকে সংহার করে। বিজয়লাভের প্রথম নিদর্শন-স্বরূপ লোহাটার ছিন্নশির লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু উহা মহামদের হস্তে গিয়া পড়ে। তিনি উহাকে লাউসেনের মস্তকের অনুরূপভাবে রূপান্তরিত করিয়া, ময়নাগড়ে কর্ণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং ঢেকুরগড়ের যুদ্ধে লাউসেন নিহত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ জানান। সেই মায়ামুণ্ড দেখিয়া স্নেহবৎসল কর্ণসেন ও পুত্রপ্রাণা রঞ্জাবতী প্রবল শোকে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং কানড়া-কলিঙ্গাদি লাউসেনের চারি পত্নী চিতারোহণ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু সত্যের দেবতা ধর্মদেব মহামদের এই মিথ্যাচরণ সফল হইতে দেন না; তিনি তাঁহার বাহন হনুমানকে তৎক্ষণাৎ ময়নাগড়ে পাঠাইয়া দিয়া কর্ণসেন প্রভৃতিকে সত্য ঘটনা জ্ঞাপন করেন।

দুর্বৃত্ত ইছাই ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও সত্যনিষ্ঠ লাউসেনের দুর্বার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন না। তিনি অবশেষে সম্মুখসমরে [illegible] অস্ত্রে নিহত হন। তাঁহার পতন হইলে, বৃদ্ধ সোম ঘোষ লাউসেনের আনুগত্য

সবিনয়ে স্বীকার করেন। সুতরাং লাউসেন তাঁহাকে গৌড়েশ্বরের অধীন সামন্তরূপে ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান।

বিংশতি সর্গের নাম—বাদল-পালা। পরশ্রীকাতর মহামদ লাউসেনের অকালমৃত্যু ঘটাইবার মানসে তাঁহাকে কতবার কত ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রতিবারেই ভীষণ বিপদ ছিন্নভিন্ন করিয়া আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই আশ্চর্য সফলতার কারণ ধর্মদেবতার পূজা বলিয়া মহামদ সাব্যস্ত করেন এবং তিনি নিজেও ধর্মদেবের আরাধনা করিতে মনস্থ করেন। ধর্মপূজার পুণ্যবলে লাউসেন এত অধিক বলবান হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন। অতএব তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইবার উদ্দেশ্যে গৌড়েশ্বরেরও ধর্মপূজায় প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত,—এই প্রকার সুযুক্তি দেখাইয়া তিনি গৌড়পতিসহ ধর্মপূজার যথারীতি আয়োজন করেন। কিন্তু অধার্মিকের কপট ভক্তিতে ধর্মদেব বিরক্ত হইয়া প্রবল ঝড়-বাদলের দ্বারা তাঁহার যাবতীয় পূজার আয়োজন বিনষ্ট করিয়া দেন।

ধর্মপূজায় কোন গুরুতর ত্রুটি সাধনের পরিণামে এই দুর্বিপাক ঘটিয়াছে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গৌড়াধিপতি অতিশয় বিমর্ষ হন। তখন ইহার প্রতিবিধানের জন্য ধর্মপ্রাণ লাউসেনকে মহামদ আহ্বান করেন। গৌড়পতির খণ্ডব্রত-জনিত মহাপাপ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে ধর্ম-সাধনার দ্বারা পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটাইতে আদেশ করেন। কিন্তু উহা অসাধ্য, অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া লাউসেন কিছুতেই সম্মত হন না। তাঁহার এই অবাধ্যতায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহামদ তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীকে রাজ-কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন; পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাইতে না পারিলে, তাঁহারা আর মুক্তি পাইবেন না। অগত্যা পিতৃমাতৃভক্ত লাউসেন সেই অসাধ্য ব্রত সাধন করিবার নিমিত্ত কতিপয় ধর্মপরায়ণ অনুচর সঙ্গে লইয়া সুদূর হাকন্দ-তীর্থে যাত্রা করেন।

একবিংশ সর্গের নাম—পশ্চিমে উদয় আরম্ভ। হাকন্দ-নদীর তীরে রামাই পণ্ডিত, সামুলা-মাসী, পূজারীবৃন্দ প্রভৃতির সহযোগে লাউসেন কর্তৃক ধর্মদেবের দুশ্চর তপস্যা; এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুষ্টমতি মহামদের সসৈন্যে অরক্ষিত ময়নাগড়-আক্রমণের কাহিনী এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ সর্গের নাম—জাগরণ-পালা। গভীর নিশীথকালে গৌড়সৈন্য-বাহিনী লাউসেন-শূন্য ময়নাগড় অতর্কিতে আক্রমণ করে। রাজপুরীর সকলেই প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন, কেবলমাত্র কালুবীর-পত্নী লখাই-ডোমনী তখনও সজাগ রহিয়া পুরী-প্রহরায় রত। সে ক্ষিপ্রহস্তে পুরী-প্রাচীরের তিন দ্বার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, ঢাল ও ধনুর্বাণ লইয়া রণরঙ্গিণীর মূর্তিতে চতুর্থ দ্বারে গিয়া দাঁড়ায়। বিপক্ষীয় সেনাদল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রাশি রাশি শর নিক্ষেপ করে, আর সে সুকৌশলে একহস্তে ঢাল ধরিয়া সেগুলি হইতে আত্মরক্ষা করে এবং অপর হস্তে অব্যর্থ শরজাল নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য শত্রু বিনাশ করে। এইরূপে সে একাই প্রভাতকাল-পর্যন্ত রাজপুরী রক্ষা করে। তৎপরে নির্ভীক কালুবীর ও শাকা-শুকা নামে তাহার দুই যুবক পুত্র একে একে এই যুদ্ধে গমন করে ও নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জন দেয়। অনন্তর দুর্দান্ত ডোমকুলও সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নিহত হয়। তখন লাউসেনের প্রথমা পত্নী কলিঙ্গা বীরাঙ্গনার বেশে সজ্জিতা হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষত-বিক্ষত দেহে ফিরিয়া আসেন। এইবার তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তেজস্বিনী কানড়া এক উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্বার গতিতে গৌড়বাহিনীর বিরুদ্ধে ধাবিত হন। তাঁহার সেই প্রচণ্ড আক্রমণে তাহারা সকলেই প্রাণভয়ে পিছাইয়া যায় ও পাপিষ্ঠ মহামদ তাঁহার হস্তে বন্দী হন। "মামাশ্বশুর" বলিয়া মহামদকে তিনি প্রাণে মারেন না বটে, কিন্তু চরম অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গের নাম—পশ্চিম-উদয়। ইহাতে লাউসেনের দুশ্চর তপস্যা ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি কখন ঊর্ধ্ববাহু, কখন একপদে দণ্ডায়মান, কখন বা নিম্নশির হইয়া ধর্মদেবের ধ্যান করেন। তবু ইষ্টদেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন না। তৎপর তিনি প্রবল হুতাশন প্রজ্বলিত করেন ও সুতীক্ষ্ণ কাটারি দিয়া নিজের দক্ষিণ-উরুর মাংস কাটিয়া তাহাতে আহুতি দেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহার বাম-উরু, চারিদণ্ড রাত্রে দক্ষিণ-পদ, পাঁচদণ্ড নিশীথে বাম-পদ এবং সাতদণ্ড নিশায় ভুজদ্বয়ের মাংস একে একে কাটিয়া যজ্ঞানলে আহুতি দেন। অবশেষে তাঁহার পৃষ্ঠদেশের মাংস কাটিয়া আহুতি দান করেন। তবু ধর্মের প্রভু তাঁহাকে কৃপা করেন না দেখিয়া, তিনি রাত্রিশেষে গলায় কাতি লাগাইয়া সকাতরে প্রার্থনা করেন,—

"ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান।
পশ্চিম উদয় দেহ নহে লহ প্রাণ ॥"
এত বলি টানে কাতি দূরে ত্যজি মায়া।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে আর ঠাঁই কায়া ॥

তথাপি তাঁহার ছিন্নমুণ্ড হইতে পশ্চিমোদয়ের প্রার্থনা উচ্চারিত হইতে থাকে। সামুলা-মাসী জয়ধ্বনি দিয়া সেই কর্তিত শির সযত্নে একটা তেকাটার উপরে বসাইয়া রাখেন ও উহার মুখবিবরে একটা জলন্ত শলিতা স্থাপন করেন। অনন্তর তিনি নিজেও তাঁহার দুই স্তন কাটিয়া ধর্মদেবের নামে আহুতি দেন ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। রামাইপণ্ডিত ও অপর সাধকেরাও যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন। তখন হাকন্দের পবিত্র সৈকতভূমি ভীষণ শ্মশানে পরিণত হয় ও নরহত্যার পাপে অষ্ট কুলাচল কাঁপিতে থাকে। কাজেই ধর্মঠাকুর আর বৈকুণ্ঠলোকে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তচূড়ামণির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ হাকন্দে গমন করেন ও অনুচরবর্গসহ লাউসেনকে পুনর্জীবন দান করেন। লাউসেনের প্রার্থনানুসারে তিনি সূর্যদেবকে পশ্চিম-গগনে উদিত হইতে আদেশ দেন।

অস্তাচলে উদয় হইল ঝলমল।
পুণ্যের প্রভাবে হলো পৃথিবী উজ্জ্বল ॥
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বার দণ্ড রজনী উদয় হলো দিবা ॥

চতুর্বিংশ সর্গের নাম—স্বর্গারোহণ। পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় ঘটাইয়া লাউসেন গৌড়নগরে প্রত্যাবর্তন করিলে, কুচক্রী মহামদ উহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। পশ্চিমোদয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সরকারপক্ষ হইতে হরিহর বাইতি লাউসেনের সহিত হাকন্দ-তীর্থে যায়। তাহাকে প্রচুর হীরামাণিক্যাদি সংগোপনে উৎকোচ দিয়া তিনি তাহাকে পশ্চিমোদয় অস্বীকার করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার কালে সে সত্যকথা বলে। তখন প্রতিহিংসার বশে তিনি তাহাকে রাজকোষ হইতে হীরামুক্তাদি চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত করেন। গৌড়েশ্বরের কঠোর বিচারে তখনই তাহাকে শূলদণ্ডে বসাইবার হুকুম হয়। কিন্তু সরলচরিত্র হরিহরের প্রতি এইরূপ অন্যায় বিচার হইতে দেখিয়া ন্যায়পরায়ণ ধর্মঠাকুর

বিচলিত হন ও তাহাকে সশরীরে স্বর্গে আনিবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করেন। নির্মম ঘাতকেরা যখন মহোল্লাসে তাহাকে সুতাক্ষ্ণ শূলের উপর বসাইয়া দেয়, তখন হনুমান অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে দিব্যরথে তুলিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যান। তাহার এইরূপ সশরীরে স্বর্গারোহণ দেখিয়া সকলেই পরম বিস্মিত হয় ও তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে থাকে।

কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ মহামদ মন্তব্য করেন যে, শুভদিনে পবিত্র শূলদণ্ডে উপবিষ্ট হওয়ার ফলেই হরিহরের সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে, তাহার নিজের কোন পুণ্যের জোরে নহে। উহা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কামদেবকে সেই শূলের উপরে বসাইয়া দেন; কিন্তু হৃদয়হীন লৌহদণ্ড রোরুদ্যমান বালকের দেহ বিদীর্ণ করে,—কোন দিব্যরথ তাহাকে উদ্ধার করিতে আসে না। ক্রোধান্ধ মহামদ তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মদনকে শূলে চড়াইয়া দেন;—কিন্তু সেও প্রথমটির দশা প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি দুর্মতির বশে অপর তিন পুত্রকে একে একে প্রাণান্তক শূলে চাপাইয়া দেন। কিন্তু তাহাদের কেহই হরিহরের ন্যায় সশরীরে স্বর্গে যায় না। অবশিষ্ট ছয়মাসের নিষ্পাপ শিশু নিশ্চয় স্বর্গ-গমন করিবে—এইরূপ দুরাশার বশবর্তী হইয়া তিনি তাহাকে শূলের উপরে বসাইয়া দেন। কিন্তু হায়, তাঁহার এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়!—তিনি নির্বংশ হইয়া পড়েন। দয়াবতী রঞ্জাবতী তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহামদের এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হন। তাঁহার পিতৃবংশে বাতি দিবার জন্য অন্ততঃ একজনকে বাঁচাইয়া দিতে তিনি লাউসেনকে অনুরোধ করেন। মাতাব নির্দেশে তিনি শিশুপুত্রটিকে পুনর্জীবন দান করেন; কিন্তু পাপিষ্ঠ মহামদকে ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইতে অভিশাপ দেন। অমনি মহামদের সর্বাঙ্গ ভীষণ কুষ্ঠব্যাধিতে গলিয়া পড়িতে থাকে, তাঁহার বিগলিত দেহের দুর্গন্ধে সকলেই দূরে সরিয়া যায়। তাঁহার সেই নিদারুণ দুর্গতি দেখিয়া, কোমলহৃদয় গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য লাউসেনকে মিনতি করেন। মহারাজার প্রার্থনায় লাউসেন মহামদকে মার্জনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার পাপকর্মের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বদনমণ্ডলে একটি ধবলচিহ্ন রাখিয়া দেন।

অতঃপর কীর্তিমান লাউসেন বৃদ্ধ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন সহ ময়নাগড়ে পরম সুখে ও অনাবিল শান্তিতে দীর্ঘকাল আধিপত্য করেন।

অবশেষে ধর্মদেবতার ইচ্ছায় তিনি সপরিবারে দিব্যরথে চড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া যান।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' একটি বিরাট কাব্য। বিভিন্ন ভাব, বিচিত্র কাহিনী ও বিবিধ রসের সমাবেশে ইহা মহাকাব্যপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ঘটনাবহুল কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় নিতান্ত দুর্লভ। ইহাতে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও কাল্পনিক ঘটনাবলী সংমিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব আখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে। কর্ণসেনের পুত্রশোক, রঞ্জাবতীর সন্তান-কামনা, কানড়ার স্বয়ম্বর, লাউসেনের সংগ্রাম, মহামদের হিংসা, কালুবীরের নির্ভীকতা, লখাই-ডোমনীর অস্ত্রধারণ, ধুমসী-দাসীর রণতাণ্ডব, কুলবধূ কলিঙ্গার শত্রুদমন, ইছাই ঘোষের দুর্দম বিক্রম, ইন্দুমেটের ইন্দ্রজাল, কুহকিণীর মোহ-বিস্তার—ইত্যাকার অত্যাশ্চর্য দৃশ্যরাজী পাঠকের মানস-নয়নকে বিস্ময়-পুলকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। বিশেষ করিয়া, নারী-চরিত্র-চিত্রণে কবি অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বঙ্গললনা কেবলমাত্র কোমল-হৃদয়া নহে, প্রয়োজন হইলে তাহারা দৃঢ়হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতে পারে—এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত এই কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা নবীনযুগের মহাকবি মধুসূদন দত্তের কল্পিতা রণরঙ্গিণী প্রমীলার তেজস্বিতা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু প্রমীলার বহুপূর্বে বাঙ্গালার পল্লীতে যে তাঁহার মত শত শত অস্ত্রধারিণী রমণী বাস্তব জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন এই কাব্যে প্রচুর রহিয়াছে। কানড়া, কলিঙ্গা, লখাই—কেহই প্রমীলার অপেক্ষা কম বীরাঙ্গনা নহে। এক মহাভারত ব্যতীত এত অধিক যুদ্ধবিগ্রহের কথা আর কোন বাঙ্গালা-কাব্যে দৃষ্ট হয় না। অতএব, এই ধর্ম-মঙ্গলটিকে বাঙ্গালীর বাহুবলের অতীত ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

ধর্মমঙ্গলের সমালোচনা

ধর্মমঙ্গলের প্রধান চরিত্র—মহাবীর লাউসেন। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—গৌড়ের প্রধান মন্ত্রী মহামদ। প্রধানতঃ এই দুইজনের দ্বারা কাব্যোক্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে। ভাগিনার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া মহামদ লাউসেনকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে নিত্য নূতন বিপদের সৃষ্টি করিতেছেন, আর অপরাজেয় ভাগ্নে কোথাও বাহুবলে, কোথাও চরিত্রবলে, কোথাও বা ধর্মবলে সকল বাধাবিঘ্ন বিচূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। মহামদ—পরশ্রীকাতর নিষ্ঠুর ব্যক্তির জ্বলন্ত মূর্তি, আর লাউসেন—ধর্মবলে

বলীয়ান বীরপুরুষের জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি। ধর্মদেবের আশ্চর্য মহিমা বিস্তার করিবার জন্যই লাউসেনের অবতারণা, কাজেই অপার বিপদেও কবি তাঁহাকে কোথাও বিপন্ন হইতে দেন নাই। যেখানে উদ্ধারলাভের কোনই উপায় নাই, সেখানে দৈবীশক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে,—ধর্মের বাহন বীর হনুমান আসিয়া তাঁহার বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। "সুতরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই, এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছাবোধ করিবেন না।"[১] ধার্মিকের অসাধ্য কিছুই নহে, ঈশ্বরের সহায়তায় মৃত ব্যক্তিকেও তিনি পুনর্জীবিত করেন। তাঁহার চরিত্রে এইরূপ অলৌকিকতার অভাব নাই। কিন্তু এইরূপ অলৌকিকতার প্রভাবে তাঁহার বীরত্ব ম্লান হইয়া পড়িয়াছে ও মনুষ্যলোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইহেতু তাঁহার কার্যকলাপ আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না।

লাউসেনের চরিত্র অবাস্তব হইয়া পড়িলেও, তাঁহার সংশ্লিষ্ট অপর চরিত্রগুলি জীবন্তরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ইছাই ঘোষ, কালুবীর, কর্ণসেন, রঞ্জাবতী, কানড়া প্রভৃতির চরিত্র মনোজ্ঞরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গৌড়েশ্বরকে অনেকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা ধর্মপালের পুত্র দেবপাল বলিয়া অনুমান করেন। আনুমানিক ৮১০—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ কাল তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতার সাম্রাজ্য তিনি আরও বিস্তৃত করেন। হিমালয়ের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্যাচল এবং কম্বোজ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হয়। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া লাউসেন বহু রাজ্য বিজয় করেন। সুতরাং এই কাব্যের গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ দেবপাল। কিন্তু দেবপালের চরিত্র-চিত্রণ কবির উদ্দেশ্য নহে, তাই তিনি গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই, ধর্মপালের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। গৌড়েশ্বর অত্যন্ত দুর্বলচিত্তরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন; তিনি মহামদের ইচ্ছানুসারে চালিত, নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন। তথাপি কর্ণসেনের প্রতি তাঁহার সৌহার্দ্য, শ্যালিকা-পুত্রের প্রতি স্নেহ, মহাপাত্রের প্রতি করুণা,

১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

সরল মনে সকলকেই বিশ্বাস—আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। ইছাই ঘোষ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ঢেকুরগড় যে ভৌগোলিক স্থান,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের গৌড়রাজসভার বর্ণনা, সসৈন্যে মহারাজার সমরাভিযান, সৈন্যবাহিনীর শিবির-স্থাপন, পালোয়ানের মল্লযুদ্ধ, সামন্তরাজার স্বাধীনতা প্রভৃতি এই কাব্যেব বহুস্থানে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। গৌড়-সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা ও শিবির-সন্নিবেশের কিয়দংশ চিত্র নিম্নোদ্ধৃত হইল।—

হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত যূথে যূথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত॥
নরযানে ভূপতি বেষ্টিত বাব ভুঞা।
চৌহান রাজপুত কত নামজাদা মিঞা॥
সবার গমন বেগে আগে আসোয়ার।
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে কত ঢালি ফরিকাব॥
পিছে হাতী পদাতি পসাবি পায় পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী আগে যায়॥
... ...
কানাত পড়িল কত সিফাযের ডেরা।
পরিসর আড়ে দীর্ঘে বার ক্রোশ ধরা॥
রাজার কাণাত তাম্বু আগে করে শোভা।
নীল পীত পিঙ্গল ধবল রক্ত আভা॥
নানা চিত্র চামর চৌদিগে শোভা পায়।
কলধৌত কলসে পতাকা উড়ে বায়॥
মকেদ মহলে চৌকি থাকে রায় রায়্।
তার বামে পড়ে গেল পাত্তরের তাম্বু॥
বার ভুঞা মোকাম করিল চারি পানে।
হাতী ঘোড়া থানায় রাখিল কাণে কাণে॥

এই কাব্যে কবি পুরাণ-সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কথায় কথায় কাব্যোক্ত নরনারীরা পুরাণ হইতে সহস্র উদাহরণ দিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেছে। পূর্বকালে রাজসভায় পুরাণাদি পঠন ও শ্রবণের

প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজসভা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি সেই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পুরাণোক্ত কাহিনীর সহিত তাঁহার কাব্য-বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি,—চতুর্দশ সর্গে বর্ণিত আছে, পাত্রমিত্র লইয়া লাউসেন রাজসভায় সমাসীন রহিয়াছেন ও পণ্ডিতের মুখে ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দুরাচার কংস তাঁহাকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করেন। এই পর্যন্ত পাঠ হইলে, গঙ্গাধর ভট্ট সেই সভায় উপনীত হন। ক্রূরমতি মহামদের আদেশে তিনি লাউসেনকে ময়নাগড় হইতে গৌড়-নগরে লইয়া যাইতে আসেন। তৎপরে লাউসেন কামরূপ-যুদ্ধে প্রেরিত হন। এইরূপে পুরাণোক্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়া কবি তাঁহার বক্তব্য কাহিনীর পূর্বাভাস সুকৌশলে প্রদান করিয়াছেন।

অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বাৎসল্য ও শান্ত—এই দশ প্রকার রসেরই পরিবেশ ধর্মমঙ্গল-কাব্যে রহিয়াছে ;—ইহাদের মধ্যে বীর-রস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার পরেই করুণ-রসের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদিগের ন্যায় ঘনরামের কাব্যে কোথাও দীর্ঘ বিলাপোক্তি নাই বলিয়া, কেহ কেহ ইহাতে করুণ-রসের অভাব বোধ করিয়াছেন। কিন্তু বীর-রস-প্রধান কাব্যে করুণরসের প্লাবন বহাইবার অবসর নাই, তাহা স্মরণ রাখিয়া, কবি অতিশয় সংযতভাবে দুঃখের কথা বলিয়াছেন। "যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্রশোক ভুলিতেছে, ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে,—অতএব এই কর্মতৎপরতার মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কবি কোন চরিত্রের জন্যই আর অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করেন নাই। কিন্তু তথাপি কোন চরিত্রকেই যে হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও নহে। মাতার মুখ হইতে যুদ্ধে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মাতার আদেশেই যুদ্ধ-সজ্জা করিতে করিতে শুকা বলিতেছে—

—শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রু ত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥

যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত ॥
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ ॥

প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহা আর একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ দিক, অতএব ইহার মধ্যে কোন বস্তুর যে অভাব আছে তাহা বলা যায় না।"[১]

কিন্তু এই কাব্যে বিরাট ঘটনা, মহৎ চরিত্র ও বিবিধ রসের সমাবেশ থাকিলেও ইহা মহাকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। মহাকাব্যের উপযোগী রাশি রাশি বস্তু ইহাতে বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু "যে বিধিদত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।"[২]

(২) রামেশ্বর ভট্টাচার্য

শিব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। 'সত্যপীরের পাঁচালী' ও 'শিব-সঙ্কীর্তন' নামে তাঁহার দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্যদ্বয়ে তিনি যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি ভট্টনারায়ণ-বংশোদ্ভূত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণ, মাতার নাম রূপবতী এবং শম্ভুনাথ তাঁহার সহোদর। তিনি দুই বিবাহ করেন, একজনের নাম সুমিত্রা অপরটির নাম পরমেশ্বরী। তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যদুপুর নামক গ্রামে; সেইখানে তিনি 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করেন। কিন্তু হেমৎসিংহ নামক সম্ভবতঃ কোন রাজকর্মচারীর দ্বারা তিনি ঐ গ্রাম হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়-নামক প্রদেশের রাজা রামসিংহের সভাকবি হন। রামসিংহের পরলোক গমন ঘটিলে তাঁহার পুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন। এই যশোবন্তের অভিপ্রায়-ক্রমে তিনি 'শিব-সংকীর্তন' রচনা করেন। এই কাব্যের প্রারম্ভে এই দুই রাজার কথা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখিত হইয়াছে। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে 'শিব-সংকীর্তন' সমাপ্ত হয়।

১, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।'
২, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।'

রামেশ্বরের 'শিব-সংকীর্তন' জনসাধারণের নিকট 'শিবায়ন' নামে পরিচিত। ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ এবং ষোল পালায় বিভক্ত। ইহাতে শিব-পার্বতীর কথা প্রধানতঃ কীর্তিত হইলেও, প্রসঙ্গক্রমে দিলীপ, জয়ন্তী, শবর, বাণ, বৃকাসুর প্রভৃতির উপাখ্যান, রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এবং শিবরাত্রিতে জনৈক ব্যাধকর্তৃক আশুতোষের বর-প্রাপ্তির কাহিনী ইহাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সূচনায় গণেশ, শিব, নারায়ণ প্রভৃতি দেববৃন্দের বন্দনা ও সৃষ্টিপ্রকরণ; তৎপর দক্ষযজ্ঞ হইতে মূল গল্পের সুরু হইযাছে। দক্ষযজ্ঞের পরে হিমালয়ে হৈমবতীর জন্ম, উমার তপস্যা, মদন-ভস্ম, হর-গৌরীর বিবাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই অবধি কবি সংস্কৃত-পুরাণাদির অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কি, স্থানে স্থানে কবি কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যের অনুসরণ করিয়াছেন। সপ্তম সর্গে সদ্যোবিবাহিত শিব শ্বশুরালয়ে বাস করিতে করিতে সহসা কোঁচনী-পাড়ায় গিয়া প্রবেশ করেন, এবং তাহার পর হইতে মলিন ভিক্ষুকবেশে দেখা দেন। এইস্থান হইতে পৌরাণিক শিব হঠাৎ লৌকিক শিবে রূপান্তরিত হইয়াছেন এবং সংস্কৃত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কবি তাঁহার স্বীয় কল্পনার দ্বারা শিবের পরবর্তী লীলা অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পরবর্তী লীলা লৌকিক শিব-কাহিনীর দ্বারা পরিপুষ্ট। সুতরাং তাঁহার শিবচরিত্রে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। লৌকিক অংশে কল্পনার স্বাধীনতাবশতঃ শিবের পরবর্তী জীবন জীবন্তরূপে চিত্রিত হইযাছে, কিন্তু পুরাণের অনুকরণে পূর্ববর্তী জীবন অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই কাব্যটির দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই কবির নিজস্ব কবিত্ব ও মৌলিকত্বের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

শিবায়ন

যাহা হউক, তপস্বী মহেশ্বর অবশেষে পুরাপুরি সংসারী হন। মনোরমা পত্নী ও কার্তিক-গণেশাদি প্রিয় সন্ততি লইয়া তিনি কৈলাসধামে কুটীর বাঁধিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি একেবারে নিঃসম্বল, ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা কোনক্রমে সংসার পালন করেন। মহৈশ্বর্যশালী নগাধিরাজের আদরিণী কন্যা এই নিদারুণ দারিদ্র্য-যাতনা অধিক কাল সহ্য করিতে পারেন না; তিনি স্বামীকে চাষ-আবাদ করিয়া অন্নসংস্থান করিবার পরামর্শ দেন।—

বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন।
ভেবে ভেবে ভবানীর তনু হৈল ক্ষীণ॥

চিন্তিলাম চন্দ্রচুড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্ত্তক পরিজন॥

তখন ইন্দ্রের নিকট হইতে চাষের জমি, বিশ্বকর্মার নিকট হইতে লাঙ্গল ও কুবেরের কাছ হইতে ধানের বিছন লইয়া মহাদেব কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অনুচর ভীমকে লইয়া তিনি কঠোর পরিশ্রমের সহিত ক্ষেত্রকর্ষণ এবং যথাসময়ে বীজ-বপন করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটি রাশি রাশি সুবর্ণ ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সাফল্যের আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হন, ভীম সোৎসাহে নারদের ঢেঁকি লইয়া ধান ভানে,—অন্নপূর্ণার শূন্য ভাণ্ডার ধান্যে ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

দরিদ্র শিব কৃষিকর্মের সুফল লাভ করিয়া ক্ষেত্রের কার্যে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিনি এখন গৃহ-পরিবার ছাড়িয়া শস্যক্ষেত্রেই প্রায় সর্বক্ষণ পড়িয়া থাকেন; অনিন্দ্য-সুন্দরী পার্বতীর মিলনও তিনি আর কামনা করেন না। কিন্তু পতিব্রতা গৌরী অনতিকাল পরে প্রাণপতির বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে নারদের সহিত পরামর্শ করেন। নারদের যুক্তিতে তিনি অসংখ্য "উঙানি মশা" সৃষ্টি করিয়া শস্যক্ষেত্রের দিকে পাঠাইয়া দেন। উহাদের তীক্ষ্ণ দংশনে কৃষককুল ক্ষেত্র ছাড়িয়া গৃহে গিয়া আশ্রয় লয়, কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু শিব সর্বাঙ্গে ঘৃত মাখিয়া ক্ষেত্রে বসিয়া থাকেন। তখন শিবানী ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ, জোঁক, মাছি প্রভৃতি হিংস্র কীটপতঙ্গ শস্যক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভোলানাথ সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন ও গৃহিণীর প্রতি উদাসীন রহেন।

অগত্যা মহামায়া এক মনোহরা বাগ্দিনীর রূপ ধরিয়া শিবের শস্যক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথাকার এক নালা ছেঁচিয়া মাছ ধরিতে থাকেন। বহুদিন যাবত সংসারী শিব নারী-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত, সুতরাং নির্জন স্থানে যৌবনময়ী বাগ্দিনীকে একাকিনী দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রলুব্ধ হন ও সকাতরে তাহার মিলন প্রার্থনা করেন। তখন সুচতুরা বাগ্দিনী ছলনার দ্বারা তাঁহার অঙ্গুরীয়টি হস্তগত করিয়া অন্তর্ধান হয়। অনন্তর তিনি বিষণ্ণমনে তাঁহার বৃদ্ধ বৃষে আরোহণ করিয়া কৈলাসে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি গৃহে উপনীত হইলে, অভিমানিনী শঙ্করী তাঁহাকে কামান্ধ লম্পট বলিয়া কঠোর ভর্ৎসনা করেন,

এবং তাহার ফলে স্বামী-স্ত্রীতে দারুণ বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই প্রকার দাম্পত্য কলহ বাঙ্গালার কৃষক-কুটীরের দৈনন্দিন ব্যাপার।

বস্তুতঃ, কৃষিজীবী শিবকে অবলম্বন করিয়া কবি পরোক্ষভাবে বঙ্গপল্লীর দীন-দরিদ্র কৃষককুলেব কথাই কীর্তন কাঁরয়াছেন। ভিখারী শিবের মতই তাহারা নিঃস্ব ; তাহাদেব পত্নী-পুত্রাদি বহু পোষ্য আছে, কিন্তু জমি-জমা কিছুই নাই ; দৈহিক শক্তি ছাডা আর কোন সম্বল নাই। তাহারা পবের জমি চষিয়া অতিকষ্টে সংসার-জীবন যাপন করে। কোনক্রমে তাহাদের উদর পূর্তি হয বটে, কিন্তু কোন সখ বা বিলাস করিবার মত সংস্থান তাহাদের থাকে না। তাহাদেব একটি দরিদ্র পরিবাবের চিত্রই শিব-পার্বতীর অসচ্ছল সংসাব-যাত্রার মধ্য দিযা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "এক হিসাবে শিবায়ন চাষীব কাব্য, আদিম বাঙ্গালীব জাতীব কাব্য।"[১]

বঙ্গপল্লীর সহৃদয় কবিব সহজ দৃষ্টিতে শিবদুর্গা, তাঁহাদের দেবত্ববিবর্জিত হইযা, সাধাবণ কৃষক-দম্পতিরূপে প্রতিভাত হইযাছেন। তাঁহাদেব সংসার-যাত্রার মাধ্যমে দবিদ্র কৃষক-পবিবারেব দৈনন্দিন জীবনেব চিত্র প্রকট হইযা উঠিয়াছে। দবিদ্র গৃহে খাদ্যের আয়োজন সামান্য হইলেও স্নেহমযী গৃহিণীব সুনিপুণ বন্ধনের গুণে ক্ষুধার্ত গৃহকর্তা তাহাব সন্তান-সন্ততিদেব লইয়া পবম তৃপ্তিব সহিত ভোজন কবে। এইরূপ একটি মধুব দৃশ্য 'শিবাযন' কাব্য হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ক্ষুধার্ত শিব কার্তিক-গণেশ সহ ভোজনে বসিয়াছেন, আর অন্নপূর্ণাদেবী সযত্নে তাঁহাদেব অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। শাক, সুক্ত, সূপ, ভাজা ছাড়া আর কোনপ্রকার আয়োজন তাঁহার নাই, কিন্তু ভোজনকারীদেব তাহাতে কোনই ক্ষোভ নাই,—তাঁহারা শুধু ভাজা দিয়াই রাশি রাশি ভাত তৃপ্তির সহিত খাইতেছেন।

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জন একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥

---

১. শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেয় শিখিধ্বজ কয়॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেশরির পরে॥
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড় বড় দেবী আনি দিল ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা।
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥

চিরদরিদ্র স্বামীর গৃহে অভাগিনী স্ত্রীর সামান্য একটা সাধও পূর্ণ হয় না,—তাহার মনের বাসনা মনের মধ্যে জলিয়া উঠিয়া মনের মধ্যেই নিভিয়া যায়। পার্বতীর শাঁখা-পরিধান-কাহিনীটির মধ্যে সেই নীরব মর্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। অতিশয় সঙ্কোচের সহিত তিনি শিবের নিকট একটা নিবেদন করেন—

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুই বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই॥
লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥

সধবা বধুর হাতে দুই গাছি শাঁখা থাকা হিন্দুপরিবারের চিরন্তন প্রথা।

কিন্তু কাঙ্গাল মহেশ্বরের দারিদ্র্যবশতঃ সতীসাধ্বী পার্বতীর মৃণাল বাহুদ্বয় শঙ্খ-শূন্য রহিয়াছে। স্বামীর এই অমার্জনীয় অক্ষমতা সংগোপন রাখিবার জন্য তিনি সর্বদা রমণী-সমাজ হইতে দূরে থাকেন এবং কাহারও সাহত কখন হাত নাড়িয়া কোন বড় কথা বলিতে পারেন না। ইহা স্ত্রীর পক্ষে নিদারুণ ক্ষোভের বিষয় ; অথচ দরিদ্র শিব শঙ্করীর এই সামান্য অথচ ন্যায্য দাবীটিও পূর্ণ করিতে একেবারে অক্ষম। বিনীতা পত্নীর এই দীনতম অভিলাষকেও তিনি তীব্র গঞ্জনা সহকারে উপেক্ষা করেন—

ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তাঁরে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

অক্ষম স্বামীর নিকট হইতে এইরূপ কঠোর তিরস্কার বাঙ্গালার অনেক গ্রাম্য বধূকেই নিরন্তর সহ্য করিতে হয় ; পিতৃগৃহের "খোঁটা" কোন কোন পত্নীকে উঠিতে বসিতে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সর্বংসহা মহামায়া এইরূপ অন্যায় লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারেন না ; তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া প্রবল অভিমানে পিতৃভবনের দিকে যাত্রা করেন। নিরুপায় বঙ্গবালার দুঃখ-কষ্টের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইতেছে পিতৃগৃহ। কবি এই স্থানে জগজ্জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া, বাঙ্গালার দরিদ্র সংসারে সুকোমলা গৃহবধূরা কিরূপ হীনভাবে নিয়ত নির্যাতিত হয়, তাহাই সমবেদনার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু হৈমবতী তো আর সামান্যা বঙ্গবালা নহেন! তিনি একে তেজোময়ী তপস্বিনী, তাহার উপরে আবার নগরাজ হিমালয়ের অতি স্নেহের দুলালী। তাই তিনি অন্য কোন স্ত্রীর মত আত্মাবমাননার জ্বালায় নীরবে বিদগ্ধ হইতে পারেন না, অবিলম্বে পতিগৃহ হইতে প্রস্থান করেন।

দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥
কোলে করি কার্ত্তিকেরে হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈলা চণ্ডীর চলন॥

গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছু পাছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥
... ...
ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
"যাও যাও যত ভাব জানা গেল" বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে যায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি।
পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥

"এই 'পাথারে ফেলিযা গেলা পর্ব্বতের ঝি'—ছত্রে তরুণী ভার্যার শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহাবিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা একটু কৌতুক ও হাস্য উপভোগ করিয়াছি।"[১]

অভিমানিনী শিবানী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলে, মহাদেব বড়ই নিরুপায় হইয়া পড়েন। অবশেষে নারদমুনির পরামর্শে তিনি শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধরিযা হিমালয়পর্বতে গিয়া উপনীত হন। তখন নগেন্দ্র-প্রাসাদে মহাড়ম্বরে দুর্গোৎসব হইতেছে, মহানন্দে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন হইয়াছে। শাঁখারীকে দেখিয়া গৌরীর মনে শাঁখা পরিবার সাধ জাগিয়া উঠে। তিনি উল্লসিত হৃদয়ে শাঁখারীকে অন্তঃপুরে আসিতে আহ্বান করেন। তখন শাঁখা-পরিবার-কালে ছদ্মবেশী স্বামীকে তিনি চিনিয়া ফেলেন ও মান-অভিমান ভুলিয়া গিয়া পুনরায় পরম পুলকে শিবের সহিত সম্মিলিতা হন।

(৩) ভারতচন্দ্র রায়

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বাগ্‌-বিদগ্ধ কবি—ভারতচন্দ্র রায়। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভুরসুট-পরগণার জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ

১. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

রায়ের চারি পুত্রের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। তাঁহার তিন অগ্রজের নাম—চতুর্ভুজ, অর্জুন ও দয়ারাম। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে পৈতৃক ভবনে তাঁহার জন্ম হয় ও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার বাল্যকালে জমিদারি-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার পিতার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠে ও উহার পরিণামে নরেন্দ্র নারায়ণ সহসা হৃতসর্বস্ব হইয়া পড়েন। পিতার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে পলাইয়া যান। বর্ধমানের মঙ্গলঘাট-পরগণার অন্তর্গত নওয়াপাড়া-গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়া তিনি নিকটবর্তী তাজপুর-গ্রামে এক সংস্কৃত টোলে অধ্যয়ন করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই তাজপুরের সন্নিহিত সারদা-গ্রামের কেশরকুণি-আচার্য-বংশের একটি সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটিলে তিনি যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। উহাতে তিনি অতীব মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পুনরায় গৃহত্যাগ করেন এবং হুগলি-জেলার অন্তঃপাতী দেবানন্দপুর-গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর বাটীতে আশ্রয় নেন। তথায় থাকিয়া তিনি পারসী-শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই মুন্সীমহাশয়ের ভবনে একদিন সত্যনারায়ণ পুজোপলক্ষে তিনি একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করেন। ইহা তাঁহার স্বল্পবয়সের প্রথম রচনা হইলেও, ইহার ভাষা-মাধুর্য ও ছন্দোলালিত্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হয়।

রামচন্দ্র মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে পারসীভাষায় কৃতবিদ্য হন এবং পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার অগ্রজেরা এইবার তাঁহাকে নিজেদের সম্পত্তি-বিষয়ে তদ্বির করিবার জন্য বর্ধমান-রাজসরকারে প্রেরণ করেন। তথায় কোন অন্যায় আচরণ করিয়া তিনি কারাগারে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধূর্ত পণ্ডিত বেশীদিন কারাগারে বন্দী থাকেন না;—সকরুণ সুমিষ্ট বাক্যলহরীর দ্বারা কারারক্ষীর হৃদয় বিগলিত করিয়া তিনি কারাকক্ষ হইতে পলায়ন করেন এবং সুদূরে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটকে গিয়া উপনীত হন। কটকের সুবাদার° শিবভট্ট তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবার অনুমতি দেন। শ্রীক্ষেত্রে

এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে থাকেন। একদা এই দলের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে হুগলিজেলার কৃষ্ণনগরে উপনীত হইলে তাঁহার এক শ্যালিকা-পতির সহিত তাঁহার সহসা সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাঁহাকে সমাদর করিয়া স্বগৃহে লইয়া যান ও তাঁহার সন্ন্যাসী-বেশ ঘুচাইয়া দেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সারদা-গ্রামে শ্বশুরালয়ে লইয়া যান। তাঁহার শ্বশুর নরোত্তম আচার্য বহুকাল পরে হারানিধি জামাতাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হন ;—তাঁহার অন্তঃপুরে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হয়। "ভারতচন্দ্র বিবাহ-বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না।"[১]

ভারতচন্দ্র স্বীয় ভার্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া, জীবিকা-সংস্থানের নিমিত্ত ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসী-সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। মান্যবর দেওয়ান-মহোদয় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভায় প্রেরণ করেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক ৪০৲ বেতন ও প্রচুর জায়গীর দিয়া সভাকবি-পদে নিযুক্ত করেন। অনন্তর মহারাজার আদেশে তিনি ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। তাঁহার অনুপম কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "গুণাকর"-উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেন। তিনি 'রসমঞ্জরী' নামে বাঙ্গালা পদ্যে একটি অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কতিপয় গীতিকবিতা রচনা করেন। 'চণ্ডী-নাটক' লিখিবার সূচনা করিয়া, মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সহসা দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্র-রচিত 'অন্নদামঙ্গল' একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ ; ইহা তিনটি বিভিন্ন কাব্যে বিভক্ত—(১) অন্নদামঙ্গল, (২) বিদ্যাসুন্দর ও (৩) ভবানন্দ মজুমদারের পালা। এই তিনটি কাব্যেই অন্নদাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা "একই পুস্তক" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ

---

১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (কবি)।

ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ যোগসূত্র নাই; তিনটি কাব্যেই তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের শুধু প্রথমটিকেই প্রকৃতপক্ষে 'অন্নদামঙ্গল' বলা যাইতে পারে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় 'অন্নদামঙ্গল' বলিতে এই প্রথমখণ্ডটি মাত্র বুঝিতে হইবে।

'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যটি যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় বিরচিত, তাহা কবি নিজেই অন্নপূর্ণা-বন্দনায় ব্যক্ত করিয়াছেন।—

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥

উদ্ধৃত উক্তিতে "নূতন মঙ্গল" বাক্যাংশটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। 'অন্নদামঙ্গল' অনেকটা নূতন ধরণের একটা অভিনব মঙ্গল-কাব্য। ইহা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত না হইয়া, কেবলমাত্র নাগরিক বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই;—সেকারণেও ইহা "নূতন"। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলে চণ্ডী, মনসা বা ধর্মদেবতার নিজস্ব জীবন-কাহিনী কীর্তিত হয় নাই, তাঁহাদের প্রভাবের কথামাত্র বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু ব্যাধের উন্নতি, মনসার বিরাগে চাঁদসদাগরের বিপত্তি, বা ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে লাউসেনের বিজয়লাভ প্রভৃতি পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে স্বয়ং অন্নপূর্ণাদেবীর জীবন-কথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অন্নদার জন্ম, বিবাহ, সংসার-যাত্রা ও মহিমা-বিস্তার এই কাব্যে বিশদরূপে কীর্তিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে "নূতন মঙ্গল" বলা অসঙ্গত হইবে না।

অন্নদামঙ্গলে সর্বসমেত ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। উহাদের প্রথম আটটিতে গণেশ, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা ও নবমটি হইতে গ্রন্থ-সূচনা হইয়াছে। পূর্বগামী মঙ্গল কবিদের মত ভারতচন্দ্রও এই নবম কবিতায় তাঁহার কাব্য-রচনার একটি অলৌকিক কারণ দর্শাইয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল

তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁ একদা নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সহসা বার লক্ষ টাকা নজরানা চাহিয়া বসেন। তিনি উহা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারায় মুর্শিদাবাদের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। তিনি চিরদিন দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর পরম ভক্ত;—প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গোৎসব পালন করেন বলিয়া তিনি জনসাধারণে "দেবীপুত্র"-নামে বিখ্যাত।

তাই সেই নিদারুণ দুর্দশায় পড়িয়া তিনি সেই কারাগারেই সর্বান্তঃকরণে শ্রীদুর্গার চৌত্রিশাক্ষর স্তব করিতে থাকেন। তখন করুণাময়ী জগজ্জননী তাঁহাকে অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে দেখা দিয়া অভয় দান করেন ও নিম্নোক্ত সদুপদেশ দেন—

এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয় ॥
... ...
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও ॥

—এইরূপে দেবী ও নৃপতি উভয়ের আদেশক্রমে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন।

দশম কবিতায় কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন করিয়াছেন। এই কবিতাটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহাতে রাজমহিষীগণ, রাজকুমারগণ ও রাজকুটুম্বদের নামোল্লেখ ও রাজসভাস্থ প্রসিদ্ধ গুণীব্যক্তিদের কথা উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায—পণ্ডিত গদাধর তর্কালঙ্কার, কবি [illegible], সভাসদ কালিদাস সিদ্ধান্ত, জ্যোতির্বিদ অনুকূল বাচস্পতি, গায়ক বিশ্রাম খাঁ, যোদ্ধা ভগবন্ত সিংহ প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা সর্বদা অলঙ্কৃত থাকিত।

একাদশ কবিতা হইতে কাব্যের প্রধান কাহিনীর আরম্ভ হইযাছে ও দ্বিচত্বারিংশ কবিতায় উহা সমাপ্ত হইযাছে,—এবং এই অংশেই শিব-পার্বতীর লীলা প্রধানতঃ কীর্তিত হইয়াছে। উহার পরবর্তী কবিতা হইতে পঞ্চসপ্ততিতম কবিতা পর্যন্ত পরমপুণ্যতীর্থ কাশীধামের সৃষ্টি ও উহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর ত্রিনবতিতম কবিতা পর্যন্ত হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং তদনন্তর ভবানন্দ মজুমদার-কাহিনীর সূত্রপাত হইযাছে।

সংস্কৃত পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া কবি শিব-পার্বতীর কথা কীর্তন করিয়াছেন। শিবপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, তন্ত্রচূড়ামণি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আবশ্যকমত সাহায্য তিনি লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার

হর-গৌরী পৌরাণিক দেবতা ; তবে লৌকিক শিব-দুর্গার ছায়াপাত তাঁহাদের চরিত্রে দুই-এক স্থলে আসিয়া পড়িয়াছে।

এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তি হইয়াছেন মহামায়া অন্নদা,—তিনিই "পরমা প্রকৃতি"। যখন চন্দ্রসূর্যের সৃষ্টি হয় নাই, অনন্ত শূন্যস্থল নিবিড় অন্ধকারে পরিপূর্ণ, তখন পরমা প্রকৃতি স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা তমোনাশ করেন এবং কারণ-সলিল সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে বিনাগর্ভে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের জন্ম দেন। এই ত্রিদেবতা জলের উপরে রহিয়া নিরন্তর তপস্যায় মগ্ন হন। তাঁহাদের সত্ত্ব জানিবার জন্য পরমা প্রকৃতি শবরূপা হইয়া জলে ভাসিতে ভাসিতে একে একে তাঁহাদের সন্নিকটে উপনীত হন। গলিত মাংসের দুর্গন্ধে বিষ্ণু দূরে সরিয়া যান, ব্রহ্মা ঘৃণাভরে বার বার চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া চতুর্মুখ হন, কিন্তু শিব উহাকে আসন করিয়া ধ্যানে বসেন। তখন শিবের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া পরমাপ্রকৃতি তাঁহার "ভার্যারূপা" হন, এবং "দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা।"

অনন্তর ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষমুনির পত্নী প্রসূতির গর্ভে মহামায়া সতী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নারদমুনির ঘটকতায় শিবের সহিত সতীর বিবাহ হয়। কিন্তু বিষয়-বিরাগী শিবের "বিকট সাজ" দেখিয়া দক্ষমুনি মর্মাহত হন ও তাঁহার নিন্দা করেন। ইহাতে সদাশিব হর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সতীদেবীসহ কৈলাসপর্বতে চলিয়া যান ও তথায় কুটির বাঁধিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে থাকেন।

অতঃপর দক্ষমুনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং তাহাতে সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ করেন কিন্তু নির্গুণ জামাতা মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন না। দেবর্ষি নারদের মুখে এই মহাযজ্ঞের কথা শুনিয়া সতীদেবী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য উতলা হন ; কিন্তু বিনা-নিমন্ত্রণে তাঁহাকে যাইতে দিতে শিব কিছুতেই সম্মত হন না। ইহাতে তিনি ভয়ানক কুপিত হইয়া ভীষণা মূর্তি ধরেন এবং কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী—এই দশবিধ মূর্তি একে একে শিবকে প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে যোগীশ্বর পরম বিস্মিত হইয়া কম্পিত কলেবরে দেবীর স্তব করেন,—তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিতে আর সাহসী হন না।

পার্বতী বড় আগ্রহে পিতৃভবনে আসেন, কিন্তু আসিয়াই তিনি অতীব

মর্মাহত হন। তাঁহার মলিন বেশ ও বিশুষ্ক বদন দেখিয়া তাঁহার পিতা দক্ষ অতিশয় রুষ্ট হন এবং চিরদরিদ্রের পত্নী বলিয়া নিজের কন্যাকেও ঘোর উপেক্ষা করেন। তাঁহার সচ্ছলতার সংসারে অজস্র ভোগবিলাসে লালিতা-পালিতা সুকোমলা দুহিতাকে নিত্য অভাব-অনটনের আগুনে পুড়াইয়া অক্ষম শঙ্কর যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কর্ম করিতেছেন,—তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি শিবের ভয়ানক নিন্দা করেন। সেই সঙ্গে নিজের সোহাগিনী কন্যাকেও তিনি বৈধব্যের অভিশাপ দেন।—

বিধবা যখন হইবি তখন অন্নবস্ত্র তোবে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে তার মুখ না দেখিব॥

উপস্থিত সভাজনদের সম্মুখে তিনি উচ্চৈঃস্বরে শিব-নিন্দা করিতে থাকেন। এই স্থলে ভারতচন্দ্র "নিন্দাচ্ছলে" শিবের যে "স্তুতি" গাহিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ব্যাজস্তুতির একটি সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু পতিপরায়ণা সতীদেবী পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না;—তাঁহার পিতৃদত্ত ঘৃণিত দেহ তাঁহার পিতার সমক্ষে তিনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন।

দাম্ভিক দক্ষরাজের নির্মম আচরণে রুদ্রদেবের প্রাণসমা পত্নীর অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে,—এই সংবাদ শুনিয়া শ্মশানচারী ভূতনাথ অতীব ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহার অনুগত প্রমথদল লইয়া তিনি দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশ করিতে যাত্রা করেন। এইস্থানে কবি দক্ষযজ্ঞনাশের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার-সৌন্দর্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে অতুলনীয়। এই অংশটুকু ধ্বন্যুক্তি-অলঙ্কারের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহা পড়িবার সময় ছন্দের তালে তালে প্রমত্ত ভূতদলের প্রচণ্ড পদক্ষেপ স্বতঃই ধ্বনিত হয় ও ইহার শব্দরাশির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতিত বিপ্রগণের আর্তনাদ এবং যজ্ঞস্থলের মহা গণ্ডগোল স্বতঃই শ্রুত হয়। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্পঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥

... ...

বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায লাগ লাথি কীল মারিছে ॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥

এইরূপে মহাক্রুদ্ধ রুদ্রদেব যখন দুর্বৃত্ত ভূতপ্রেতের দ্বারা দক্ষরাজার মুণ্ডপাত ও যজ্ঞের বিনাশ সাধন করেন, তখন দক্ষ-পত্নী প্রসূতি বৈধব্য-যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতরা হইযা তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন। নিরপবাধা শাশুড়ীর ঐরূপ দুর্গতি দেখিযা তিনি অতিশয লজ্জিত হন ও দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন; কিন্তু তাঁহাব দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ একটি ছাগমুণ্ড তাঁহার ছিন্নগ্রীবায বসাইযা দেন। অতঃপর তিনি সাধ্বী সতীর পবিত্র শব সযত্নে স্বীয স্কন্ধে তুলিয়া নেন ও সতীদেবীর গুণরাশি গাহিযা গাহিযা নানাস্থানে উন্মাদের মত ঘুরিতে থাকেন। সতীর মৃতদেহ কালক্রমে তাঁহার স্কন্ধের উপরে বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু সেদিকে তাঁহার খেযাল নাই। তখন পরমেশ্বর বিষ্ণু অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার চক্রেব দ্বারা ঐ বিগলিত সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। উহার যে খণ্ড পৃথিবীর যেখানে পড়ে, সেইখানেই অবিলম্বে একটি পবিত্র পীঠস্থান গড়িয়া উঠে।

এদিকে লীলাময়ী মহামাযা হিমালয পর্বতে গিরিরাজ-মহিষী মেনকার গর্ভে উমারূপে পুনরায জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যৌবন-সমাগম ঘটিলে, মহাদেবের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার জন্য দেবকুল সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শিব তখন সতী-বিরহে বাহ্যজগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কৈলাসশিখরে গভীর ধ্যানমগ্ন রহিযাছেন,—দেবতাদের শত অনুরোধেও তিনি কোনরূপ সাড়া দেন না। তখন ইন্দ্রের পরামর্শে মদনদেব তাঁহার পুষ্পধনু লইযা "নিবাত নিষ্কম্প" ধূর্জটির অঙ্গে সম্মোহন-বাণ নিক্ষেপ করেন। উহার আঘাতে তপস্বী শিবের ধ্যানভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তিনি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইযা মদনদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন;—তাঁহার ললাট-লোচন হইতে সহসা জ্বলন্ত হুতাশন নির্গত হইয়া রতিপতিকে মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত করে। কিন্তু মদন মরিলেও কামোত্তেজিত পঞ্চানন চঞ্চল হইয়া অপ্সর-কিন্নরীদের আলিঙ্গন করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন।

কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাৎ তাড়িয়া ফিরেন শিব চঞ্চল ॥

এইস্থানে কবি পরমযোগী শিবচরিত্রের নিদারুণ দুর্গতি ঘটাইয়াছেন ;— সংযতেন্দ্রিয় মহেশ্বরকে নিতান্ত কামুকের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন। যাহা হউক, অবশেষে নারদমুনির তথায় আগমন ঘটিলে কামান্ধ মহাদেব প্রকৃতিস্থ হন। তাঁহার মধ্যস্থতায় গিরিরাজ-দুহিতা উমার সহিত শিবের পুনরায় বিবাহ স্থির হয়। তখন শ্মশানবাসী মহেশ্বর তাঁহার জটাজুটের চূড়ায় মণিময় সর্পফণা বাঁধিয়া, কটিদেশে বাঘছাল জড়াইয়া ও সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, এক বৃদ্ধ বলদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বরযাত্রা করেন ; বরানুগমন করে তাঁহার চিরানুচর ভূত-প্রেতগণ। এই স্থলে কবি প্রমথেশের সবান্ধব বরযাত্রার চিত্রটি উপভোগ্যরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।—

প্রেত-ভূতগণ ধায় অগণন আন্ধার কৈল ধূলায়।
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ লম্প ঝম্প দিয়া চলে॥
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম জয় মহাদেব বলে।
সহজে সবার বিকট আকার সহিতে না পারে আলো॥
থাবায় থাবায় মশাল নিবায় আন্ধারে শোভিল ভালো।
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি লক লক লক জিহি॥
করে চড়াচড়ি ধায় বাড়াবাড়ি কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে কে মানে কাহার বোল॥

হর-গৌরীর বিবাহ-বাসরে কবি কিঞ্চিৎ হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর ও বরযাত্রীদের বিকট মূর্তি ও অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া গিরিরাজ স্তম্ভিত হন, এবং মেনকারাণী স্ত্রী-আচার পালন করিতে গিয়া অতিশয় লজ্জায় পড়েন। এয়োগণ-সঙ্গে তিনি প্রদীপমালা লইয়া বর-বরণ করিতে আগাইয়া যান, এমন সময় গরুড়-পক্ষী হুঙ্কার দিয়া তথায় উপস্থিত হয়। সর্পভুক পক্ষীরাজকে দেখিয়া শিবের কটিদেশের সর্পকুল ভয়াকুল হইয়া পলায়ন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবের বাঘছালটি খসিয়া পড়ে।

বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥

নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥

"শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়"—এই বাক্যটির দ্বারা দীনবেশী শিবের ঐশ্বরিক মহিমা সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

উমাকে যথারীতি বিবাহ করিয়া তপস্বী শিব সস্ত্রীক কৈলাসশিখরে প্রত্যাগমন করেন। এই কৈলাস-পর্বতের বর্ণনাটি মনোহর ; ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস ॥
... ...
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফুলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে ॥

কিন্তু এমন মনোরম স্থানে বাস করিয়াও পার্বতীর মনে সুখ নাই। বিষয়-বিরাগী শিবের ভবনে অন্নবস্ত্রাদির নিদারুণ অভাব। তাঁহার স্নেহের কার্তিক-গণেশ ক্ষুধার জালায় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে, অথচ আত্মভোলা মহাদেবের সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি সর্বদা ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকেন। স্ত্রীপুত্রের প্রতি এইরূপ ঘোর ঔদাসীন্য কোন সংসারী পুরুষের পক্ষে অমার্জনীয়

অপরাধ। তাই তেজস্বিনী ভবানী অবশেষে দারিদ্র্য-জ্বালায় অস্থির হইয়া স্বামীকে তীব্র ভৎর্সনা করেন।—

আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি লয কথা কৈতে ভয হয
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা-বাপ পাষাণ হিযা ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া
ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥

অসন্তুষ্টা পত্নীর নিদারুণ গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া যোগীশ্বর ভূতনাথ অগত্যা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইযা পথে বাহির হন। এই স্থানে কবি হর-গৌরীকে বঙ্গপল্লীর চিরদরিদ্র দম্পতিরূপে অঙ্কিত করিযাছেন। সম্ভবতঃ শিবাযন-কাব্যের প্রভাবে তাঁহার শিব-পার্বতীর চরিত্রে এই প্রকার বিকৃতি ঘটিয়াছে। এই স্থানে গৌরীকে গ্রাম্য রমণীর মত কলহপরায়ণা ও বিশ্বনাথকে দীনহীন ভিক্ষুকের ন্যায় অবহেলিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। 'শিবের ভিক্ষাযাত্রা' নামক উনচত্বারিংশ কবিতায তেজোময় মহেশ্বর একটা নগণ্য বেদিযার মত অঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলে দুরন্ত বালকবৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অসঙ্গত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে।—

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

বাসনা-বিহীন বিরূপাক্ষের পক্ষে স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত অন্ন-সংস্থান করিবার

নিতান্ত অক্ষমতা লক্ষ্য করিযা, পরমা প্রকৃতি পার্বতী অবশেষে অন্নদা-মূর্তি ধারণ করেন ও কৈলাসভূধরে এক বিশাল অন্নসত্র খুলিযা সকল ক্ষুধার্তজনকে অন্নদান করিতে থাকেন। কার্তিক-গণেশাদিসহ নিঃস্ব শিবকেও আর উদর-জ্বালায দুঃখ পাইতে হয় না। অন্নপূর্ণাদেবীর এই অপার কৃপার পরিচয পাইযা তিনি তাঁহার পূজা মর্ত্যলোকে প্রচার করিতে উদ্যোগী হন। স্বর্গের বিশ্বকর্মা পবিত্র কাশীধামে একটি মনোহর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন, উহার মধ্যে তিনি স্বয়ং যথাবিধি পূজার্চনার সহিত বিশ্বপালিনী অন্নদাদেবীর স্বর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বর্গবাসী সকলেই সেই শুভানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

কাশীতে অন্নদার প্রতিষ্ঠা সমাপন করিযা, কবি কাশীব মাহাত্ম্য বর্ণন কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছেন। এই বর্ণনায তিনি "কাশীখণ্ড" নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থেব অনুসরণ করিযাছেন এবং উহার দোহাই দিযা কোন কোন স্থানে নিজের পরিশ্রমের লাঘব করিযাছেন ;—"কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ।" অন্নদামঙ্গলের পূর্বভাগের ন্যায় এই কাশী-মাহাত্ম্য তেমন মনোজ্ঞ হয নাই। কাশীবাসী শিব নিরতিশয় জড় ও স্থবির হইয়া পডিযাছেন ;—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি-কণার ন্যায তিনি দুই একবার জ্বলিযা উঠিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাপ বা আলো কিছুই নাই। যাহা হউক, কাশীর পুণ্য তীর্থে হর-গৌরীর একাধিপত্য দেখিযা, বিষ্ণুভক্ত ব্যাসমুনি অতিশয ঈর্ষান্বিত হন এবং শিব-নামের নিন্দা করিয়া হরিনাম প্রচাব করিতে উদ্যোগী হন। ইহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইযা তাঁহাকে কাশীধাম হইতে তাড়াইযা দেন। তিনি প্রতিহিংসার বশে দ্বিতীয কাশী নির্মাণ করেন ও অন্নদাকে তথায় স্থাপন করিবার মানসে তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হন। কিন্তু তাঁহার বাড়াবাড়িতে অন্নদা অসন্তুষ্ট হন এবং জরতীর বেশে তাঁহাকে ছলনা করিযা তাঁহার যাবতীয সাধনা পণ্ড করিযা দেন।

এই প্রসঙ্গে 'অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা'-কাহিনীটি প্রশংসনীয-রূপে বর্ণিত হইযাছে। জরা-জীর্ণা দুঃখিনী ভিখারিণীর যে অপরূপ চিত্র কবি এইস্থানে অঙ্কন করিয়াছেন তাহার তুলনা অতীব বিরল।—

কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥

ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥

এইরূপ বৃদ্ধা জরতীর বেশে অন্নদাদেবী ব্যাসকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথা মৈলে মোক্ষ হবে?" তদুত্তরে অহঙ্কারী ঋষি বলেন যে, ব্যাস-কাশীতে মৃত্যু হইলে জীবের তৎক্ষণাৎ মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু তিনি বধিরতাবশতঃ ব্যাসের উক্তি না বুঝিবার ভান করিয়া ব্যাস-কাশীর মহিমা বিষয়ে বার বার প্রশ্ন করিতে থাকেন। ইহাতে ব্যাস বিরক্ত হইয়া সক্রোধে বলিয়া ফেলেন, "গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ব্যাসের বাক্য অনুমোদন করিয়া সহসা অন্তর্হিত হন।—

এখানে মরিবে যেই গর্দ্দভ হইবে।
এ হৈল গর্দ্দভ-কাশী অন্যথা নহিবে।

অতঃপর কবি শিব-পার্বতীর ব্যক্তিগত জীবন-কথা ছাড়িয়া, অন্য ব্যক্তির জীবনে অন্নদাদেবীর প্রভাবের কথা কীর্তন করিয়াছেন। সুতরাং অন্নদা-মঙ্গলের এই অন্ত্যভাগে অন্নদা অপেক্ষা অন্নদা-কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের জীবনকথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'বসুন্ধরে অন্নদার অভিশাপ'-নামক ষট্‌সপ্ততিতম কবিতা হইতে 'হরিহোড়-বৃত্তান্ত' নামক আর একটি কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছে। একদা ধনীশ্রেষ্ঠ কুবের অন্নদা পূজার আয়োজন করেন ও তাঁহার প্রিয় অনুচর বসুন্ধরকে পূজার ফুল আনিবার ভার দেন। কিন্তু অন্যমনস্কতাবশতঃ বসুন্ধর পুষ্প আহরণে এত অধিক বিলম্ব করেন যে পূজার কাল বহিয়া যায়। তাঁহার এই অপরাধে অন্নদা তাঁহাকে মর্ত্যলোকে গিয়া দরিদ্র মনুষ্য-জীবন যাপন করিতে অভিশাপ দেন।

সেই অভিশাপের ফলে, বাঙ্গালাদেশের বাগুয়ান-পরগণার অন্তঃপাতী বড়গাছি-গ্রামে এক চির দরিদ্র ঘুঁটে-বেচা গৃহস্থের ঘরে বসুন্ধর, হরিহোড় নাম লইয়া, মানবজন্ম গ্রহণ করেন। হরিহোড় অতিকষ্টে বড় হইয়া, মাঠে

মাঠে ঘুঁটে কুড়াইয়া ও উহা বিক্রয় করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে কোন-ক্রমে লালন-পালন করে। একদিন সে মাঠে গিয়া কোথাও কোন ঘুঁটে খুঁজিয়া পায় না ;—তৎপূর্বে এক নবাগতা বৃদ্ধা সমস্ত ঘুঁটে কুড়াইয়া একটা ঝুড়িতে ভরিয়া রাখিয়াছে। সেই জীর্ণ-শীর্ণা বুড়ী তাহাকে ঘুঁটেপূর্ণ ঝুড়িটা বহন করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে বলে। ঝুড়িটা মাথায় লইয়া সে বুড়ীটার পশ্চাতে পশ্চাতে চলে। তাহার বাড়ী পার হইয়া বহুদূরে বুড়ীর বাড়ী। অথচ তাহার বাড়ীর নিকটে আসিতে আসিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হইয়া উঠে। অগত্যা দুর্বলা বুড়ী সে রাত্রির মত তাহার জীর্ণ কুটীরেই আশ্রয় নেয়। সেই কুটীর-মধ্যে তাহার জরাজীর্ণ পিতামাতা সারাদিন অনাহারে পড়িয়া আছে, সে নিজেও অনাহারে ; কিন্তু তাই বলিয়া অতিথিকে অনাহারে রাখা যায় না। তাই সে বুড়ীকে আশ্রয় দিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহার সেই দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা তাহার ঝুড়ি হইতে একটা ঘুঁটে উঠাইয়া লইয়া তাহার হাতে দেয় ও উহার দ্বারা প্রয়োজনমত খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া আনিতে বলে। ইহাতে সে অতিশয় আশ্চর্য বোধ করিয়া ঘুঁটেটার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখে—উহা বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ড।—ঝুড়িটার সকল ঘুঁটেই অত্যুজ্জ্বল কাঞ্চনখণ্ড !

হেম ঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থরথর।
অনিমিক নয়নে সলিল ঝরঝর ॥

এই বুড়ী কিন্তু আর কেহই নহে, ছদ্মবেশে স্বয়ং অন্নদাদেবী। তাঁহার অহেতুক অপার কৃপায় সরলমতি হরিহোড় সহসা দারিদ্র্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অতিশয় অবস্থাপন্ন হইয়া উঠে। ঘোষ, বসু ও মিত্র—এই তিন মুখ্য-কুলীনের তিনটি সুশীলা কন্যা বিবাহ করিয়া সে পরম সুখে বাস করে। একটি সুন্দর দেবালয় স্থাপন করিয়া সে উহার অভ্যন্তরে অন্নদাদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে ও প্রতিদিন আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করে। কিন্তু প্রচুর ঐশ্বর্যের প্রভাবে ভোগপ্রমত্ত হইয়া সে বৃদ্ধ বয়সে একটি তরুণী কন্যার পাণিগ্রহণ করে। এই নবীনা পত্নীর সঙ্গে অপর তিন প্রাচীনা গৃহিণীর শীঘ্রই ঘোরতর কলহ বাধিয়া উঠে এবং সংসারের সুখশান্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে অন্নদাদেবী অতিশয় অসন্তুষ্টা হইয়া হরিহোড়ের গৃহ-সংসার ছাড়িয়া ভবানন্দ মজুন্দারের ভবনের দিকে যাত্রা করেন।

অতঃপর কবি ভবানন্দ মজুন্দারের কাহিনী বলিতে সুরু করেন। 'নলকুবরে অভিশাপ' নামক ত্রিনবতিতম কবিতা হইতে এই কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিকাশ ও সমাপ্তি তৃতীয়খণ্ডে ঘটিয়াছে। বসন্তকালে শুক্লাষ্টমী তিথিতে [illegible] বাৎসরিক পূজা করিবার রীতি। কিন্তু কুবের পুত্র নলকুবর সেই শুভদিনে দেবীর পূজা না করিয়া, চন্দ্রিনী ও পদ্মিণী নামে তাঁহার দুই মনোলোভা পত্নী লইয়া এক কুসুমিত কুঞ্জকাননে প্রণয়-লীলায় প্রমত্ত হন। উহাতে অন্নদা দেবী তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলে তিনি নিন্দাবাক্যের দ্বারা দেবীকে ঘোর অপমানিত করেন। তাঁহার এই অন্যায় আচরণে দেবী অতিশয় রুষ্টা হইযা তাঁহাকে সপত্নী মর্ত্যলোকে গিয়া মনুষ্যজন্ম লইতে অভিশাপ দেন। "গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম,······তাহে রাম সমদ্দার নাম একজন, শ্রোত্রিয় কেশরী গাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ" বাস করেন। তাঁহার সতী-সাধ্বী পত্নী সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে নলকুবর ভবানন্দ মজুন্দার নামে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রিণী ও পদ্মিণী যথাকালে দুই ব্রাহ্মণের ঘরে চন্দ্রমুখা ও পদ্মমুখী নাম লইয়া ভূমিষ্ঠ হন। ভবানন্দ যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া এই দুই ব্রাহ্মণ কন্যাকে যথারীতি বিবাহ করিয়া সুখের সংসার পাতেন। তখন অন্নদাদেবী হরিহোড়ের গৃহ ছাড়িয়া তাঁহার আলয়ে আগমন করেন। গাঙ্গিণী নদীর তটে উপনীত হইয়া দেবী সেই ঘাটের পাটুনীকে ত্বরায তরী আনিতে বলেন।

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥

এই কবিতাটি সর্বজন-বিদিত। এমন অলঙ্কার-শোভিত সুললিত কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই বলিলে চলে। দেবী যে ছলে তাঁহার স্বামীর পরিচয় দিতেছেন, তাহা সূক্ষ্ম শ্লেষে রহস্যময়। কিন্তু সরল পাটুনী তাহার সহজ অর্থ লইয়া মন্তব্য করে, "যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।" তাহার পর তিনি যখন নৌকায় উঠিয়া বসেন ও রাঙ্গা চরণদ্বয় নায়ের বাড়ে নামাইয়া দেন, তখন নদীবক্ষে যেন শতদল ফুটিয়া উঠে, কিন্তু সতর্ক পাটুনী কুম্ভীরের ভয়ে তাঁহাকে পদদ্বয় সেঁউতীর উপরে রাখিতে বলে।

সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

এইস্থানে কবি সংযত ও সহজভাবে দেবীর ঐশ্বরিক মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গবাসিনী জগদীশ্বরীকে চর্মচক্ষে সন্দর্শন করিয়া পাটুনী নিজেকে ধন্য বোধ করে ও করজোড়ে প্রার্থনা জানায়, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।"—এই বাক্যটিতে পাটুনীর সন্তান-বাৎসল্য ও স্বল্পে-তুষ্টি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার এই "সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটুনীর নহে, অনাদিকালের দৈবহত মূক বাঙ্গালী নরনারীর চিরকালের স্নেহ-ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে।"[১]

যাহা হউক, দয়াময়ী অন্নদাদেবী যথাকালে গাঙ্গিনী নদী পার হইয়া ভবানন্দের পূজা-মন্দিরে প্রবেশ করেন ও উহার মেঝের উপরে "এক মনোহর ঝাঁপি" রাখিয়া অন্তর্হিতা হন। অতঃপর ভবানন্দ এক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, উহা স্বয়ং অন্নদাদেবীর ঝাঁপি। ইহাতে তিনি পরম পুলকিত হইয়া অন্নদাদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন ও নিয়মিতভাবে তাঁহার পূজার্চনা করেন। ভক্তবৎসলা দেবীর অনুগ্রহে তাঁহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এইস্থানে অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের জন্যই ভারতচন্দ্রের সমধিক প্রশংসা। একদা ইহার প্রভাব বঙ্গীয় সুধী-সমাজে দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া কলিকাতায় নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর-নাটক অভিনীত হয় (১৮৩৩ খ্রীঃ)। কবি গোপাল উড়ে ইহাকে যাত্রাগানে রূপান্তরিত ও বহুস্থানে অভিনীত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "মোটের উপরে ভারতচন্দ্রের

বিদ্যাসুন্দর

'বিদ্যাসুন্দর' প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের রসিক-সমাজে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।"[২] কিন্তু কেবলমাত্র ছন্দ-লালিত্য ও শব্দমাধুর্যের জন্যই কাব্যখানির এত বেশী সমাদর ঘটে, অন্যথায় ইহাতে প্রশংসনীয় বিশেষ কিছুই নাই। ইহার উপাখ্যান-ভাগ অভদ্রোচিত ও নিতান্ত অশ্লীল ;—ইহা ঘরে রাখিতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ হয়। ইহার "ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া এক সময়ে বঙ্গীয় যুবকগণ

১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'।

২, শ্রীসজনীকান্ত দাস।

নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন।"[১] বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইযাছে, তাহাদের চরিত্রে নৈতিক জ্ঞানের অভাব ঘটিয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় উপাযে তাহারা সংগোপনে রভস-লীলায প্রবৃত্ত হইয়াছে। হীরা-নাম্নী যে মালিনীর মধ্যবর্তিতায় তাহাদের সম্মিলন ঘটে, তাহার চরিত্র অনেকটা স্বাভাবিক হইযাছে।—

কথায হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুযাপান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয ছলে ॥

এই কাব্যের কোথাও কোন গভীর অনুভূতি নাই; কবি কেবল বাক্যপল্লব রচনা করিযাছেন, ভাব-কুসুম তাহাতে প্রস্ফুটিত হয নাই। সুন্দবেব আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায বিদ্যা বিনাইয়া বিনাইয়া অনেকক্ষণ বোদন করে বটে, কিন্তু সে ক্রন্দনে মর্মবেদনা ব্যতীত উচ্চরব, অশ্রুজল, অভিসম্পাত ইত্যাদি আর সবই আছে।

প্রভু মোর গুণের সাগব
রসময় রূপের নাগব।
বসিকের শিরোমণি বিলাসধনের ধনী
নৃত্য-গীত বাদ্যের আকর ॥
জননী ডাকিনী হইল মোর
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥

সুন্দরকে যখন বধ করিবার নিমিত্ত শ্মশানে আনা হয, তখন সে কালী-মাতার শরণাপন্ন হইয়া উচ্চকণ্ঠে কালিকা-স্তব আবৃত্তি করিতে থাকে। এই করুণ দৃশ্যটি ভারতচন্দ্র মর্মস্পর্শীরূপে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। মৃত্যু সুন্দরের কেশাকর্ষণ করিতেছে অথচ সে যথাযোগ্য শব্দরাশি চয়ন করিয়া ছন্দের মাত্রা ঠিক রাখিতে ও অনুপ্রাস সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

১, দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

তাহার কালী-বন্দনায় শব্দৈশ্বর্য ব্যতীত ব্যাকুলতা, ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রার্থনা প্রভৃতি কিছুই নাই।

কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশ জালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে॥

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে 'ভবানন্দ মজুন্দার'-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবির আশ্রয়দাতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত বলিয়া মনে হয়। মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে রাজা মানসিংহ যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে বঙ্গদেশে আগমন করেন।

ভবানন্দ মজুন্দার

তাঁহার সৈন্যবাহিনী ভবানন্দ মজুন্দারের বাসভবনের সন্নিকটবর্তী বাগোযান নামক স্থানে উপনীত হইলে, অন্নদাদেবীর মায়ায় তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় ও বহু সৈন্য প্রাণ হারায়। অবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া তিনি খাদ্যদ্রব্যের অভাবে দারুণ কষ্টে পড়েন। সেই সময় ভবানন্দ তাঁহার সৈন্যদিগের নিমিত্ত প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী ও আশ্রয়স্থল দান করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হন। প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, তিনি ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন ও ভবানন্দ-কৃত উপকারের কথা বাদশাহকে বলেন। ভবানন্দ বিনয়সহকারে বাদশাহকে জানান যে, উহাতে তাঁহার কোনই কৃতিত্ব নাই, কারণ অন্নদাদেবীর মায়ায় ঝড়বৃষ্টির উদ্ভব হয় এবং দেবীর কৃপাতেই তিনি মানসিংহের উপকার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বিধর্মী দিল্লীশ্বর হিন্দুদেবীর মহিমা শুনিয়া বিশেষ তুষ্ট হন না, বরং তিনি অন্নদাদেবীর অকথ্য নিন্দা করেন। ইহাতে ভবানন্দ রুষ্ট হইয়া সমুচিত প্রত্যুত্তর দান করেন, ও সেই অপরাধে সম্রাট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। তখন অন্নদাদেবীর মায়ায় দিল্লী নগরীতে ভীষণ ভূতের উপদ্রব দেখা দেয়। অবশেষে জাহাঙ্গীর ভীত হইয়া দেবীর স্তবস্তুতি করিলে প্রেতের অত্যাচার নিবৃত্ত হয়। এইরূপে দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়, তিনি তাঁহার নিকট হইতে রাজত্বের ফরমান লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে নবদ্বীপে রাজত্ব করেন। এই ভবানন্দের বংশেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। এই কাহিনীতে ঝড়বৃষ্টিতে মোগল

সৈন্যদিগের দুর্দশা, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের কথোপকথন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র-রচিত যাবতীয় কাব্যের মধ্যে তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' (অর্থাৎ প্রথম খণ্ড) বিশেষ প্রশংসনীয়। "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনই তাহার কারুকার্য্য।"—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মন্তব্য অন্নদামঙ্গলের কেবল প্রথম খণ্ডের প্রতি যথাযথভাবে প্রযোজ্য,—কারণ অপর দুই খণ্ডে যথেষ্ট কারুকার্য্য থাকিলেও বিমল উজ্জ্বলতার অভাব আছে। 'বিদ্যাসুন্দরে' শব্দ-সংযোজনের বিস্ময়কর কৌশল থাকিলেও, মনোহর চিত্র ও জীবন্ত চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ নাই। ভবানন্দের কাহিনীটিও অন্নদার মায়াতে ও ভূতের উপদ্রবে বাস্তবতাহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষায়, ছন্দে, শব্দ-প্রয়োগে কোথাও কোন ত্রুটি নাই। তাঁহার ভাষা সর্বত্র মার্জিত, অলঙ্কৃত, সাবলীল ও শ্রুতিসুখকর। তাঁহার ছন্দোবদ্ধ বাক্যধারা বাধাহীন নদীস্রোতের মত কলনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠে, শব্দোচ্চারণ কোথাও ব্যাহত হয় না, ছন্দের বেগে স্বতঃই উচ্চারিত হয়, মসৃণ ধরাতলে গুরুভার দ্রব্য যেমন আপনিই সবেগে গড়াইয়া যায়। জয়দেবের ন্যায় "কোমল কান্ত পদাবলী" ভারতচন্দ্রের রচনায় যথেষ্ট আছে। যথা—

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।
কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে॥

ভারতচন্দ্রের ভাষা কিন্তু সর্বত্রই প্রশংসনীয় নয়। কোন কোন স্থলে অলঙ্কারের আতিশয্যে সুন্দর চিত্রখানি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মহামুনি বেদব্যাসকে বিমুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্গাদেবী মোহিনী মূর্তি ধারণ করেন। উপমার বাহুল্যে সেই নিরুপম মূর্তিখানি সুস্পষ্ট হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। দেবীর রূপ বর্ণন করিতে গিয়া কবি স্বীয় অলঙ্কার-শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।—

কোটি শশী জিনি মুখকমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥

ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচচ্ছদিমূলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে ॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লযে।
পদনখে রহিয়াছে দশ রূপ হয়ে ॥

তবে, ভারতচন্দ্র যে ছন্দের অধীশ্বর,—তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙ্গালা-কাব্য ছন্দঃ-সম্পদে অতিশয় দীন। তিনিই সর্বপ্রথম বহুবিধ ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত করেন। ভুজঙ্গ-প্রয়াত, পঞ্চচামর, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত-ছন্দে তিনি বহু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করেন। তিনি হইতেই বঙ্গভাষায় ছন্দোবৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয।

ভারতচন্দ্র তাঁহাব কাব্যের নানাস্থানে বিবিধ প্রসঙ্গে অতি-অল্প কথায় বৃহৎ ভাব বা গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহু উক্তি প্রসিদ্ধ প্রবচনের মত বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। যথা—

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায হাসে।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায ?
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ?
হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকাযে যায়।
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

ভারতচন্দ্রের রচনায তাঁহার পূর্বগামী কবিদিগের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে তিনি অনেক স্থানে যথাযথ অনুকরণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রারম্ভে হর-পার্বতীর কথা আছে; তাহার অনেকাংশের সহিত ভারতচন্দ্রের কবিতার সাদৃশ্য আছে। কোন কোন স্থলে মুকুন্দরামের বর্ণনাকে তিনি ঘষিযা-মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু ভাব-সঞ্চারের দিক দিয়া কবিকঙ্কণের মত কৃতকার্য হন নাই। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের বর্ণনায় মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন।—

সয়ে নানা রুদ্র ক্রুদ্ধ বীরভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়া করে দূর
কেহ নিবারিতে নারে॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া পুথি লয় কাড়িয়া
ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার
পৈতা দেখাইয়া কান্দে॥
বেগে হোথা ধায় দানা ধরে তায়
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন ছিঁড়িল বসন
ভ্রুবের মারিয়া বাড়ি॥

ভারতচন্দ্র শব্দ-বিন্যাসে ও ছন্দ-তরঙ্গে সেই দৃশ্যকেই বিস্ময়কর করিয়া তুলিয়াছেন—

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।"—প্রভৃতি।

মুকুন্দরামের চণ্ডীদেবী কালিকেতু-ব্যাধকে আত্ম-পরিচয়-দানচ্ছলে বলিতেছেন—

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।

ভারতচন্দ্র তাহাই অন্নদার আত্ম-পরিচয়চ্ছলে অপূর্ব কবিত্বের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন—

গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সেই স্বামী-শিরোমণি॥

এই প্রকার বহু স্থলে ভাব ও ভাষায় মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক দৃষ্ট হয়।

(৪) রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের মত সাধককবি বাঙ্গালাদেশে পূর্বে বা পরে জন্মিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় আর কাহারও গীত

বাঙ্গালার সমাজে এত অধিক সমাদৃত হয় নাই। তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীত ও প্রসাদী-সুর এখনও বাঙ্গালীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহারই আদর্শে বহু গীত রচনা করিয়া, তাঁহার নাটকাবলী অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছেন। দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নাটোরাধিপতি রামকৃষ্ণ রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায়, আশুতোষ দেব প্রভৃতি আরো বহু কবি প্রসাদী-গীতের অনুকরণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রামপ্রসাদী সুরে অসংখ্য গীত এখনো বঙ্গদেশে গীত ও রচিত হইতেছে।

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত হালিশহর (বা কুমারহট্ট) গ্রামে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্যে তিনি সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন এবং মাতার নাম সিদ্ধেশ্বরী। নিধিরাম নামে তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও বিশ্বনাথ নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে তাঁহার দুই কন্যা এবং রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র ছিল। শাক্তধর্মাবলম্বী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি স্বভাবতঃই শক্তির উপাসক হইয়া উঠেন। বাল্যকাল হইতেই স্বগৃহ-প্রতিষ্ঠিতা কালীমাতার চরণে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি,—জগন্মাতার পূজায় ও সাধনায় তিনি অতিশয় আনন্দ বোধ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ও সংস্কৃত টোলে তিনি যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি হিন্দী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তি উৎসারিত হয়। প্রায় সর্বক্ষণ তিনি পরমার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন ও শ্যামা-মায়ের বন্দনা-গান মুখে মুখে রচনা করিয়া অপার আনন্দে ভাসমান রহেন।

তিনি যখন বাইশ বৎসরের নবীন যুবক, তখন তাঁহার পিতা সর্বানী নামে এক সুশীলা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু তিনি সংসারাসক্ত গৃহী হইতে পারেন নাই। সর্বদা বিশ্বমাতার ধ্যানে বিভোর হইয়া সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা স্বীয় হৃদয়ের ভক্তিভাব ব্যক্ত করেন। বিবাহের অনতিকাল পরে তিনি সস্ত্রীক স্বীয় কুলগুরুর নিকট শাক্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও যথা-বিধি শক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। অনন্তর এক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক কুমারহট্টে আগমন করিলে, তাঁহার নিকট তিনি তান্ত্রিক সাধনা শিক্ষা করেন, এবং প্রায় সর্বক্ষণ

ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চনা ও সাধন-ভজন লইয়াই প্রমত্ত থাকেন। তাঁহার পিতা কবিরাজী করিয়া কোনপ্রকারে সংসার চালাইতেন, তথাপি পুত্রের ধর্ম-কর্মে কখনও বাধা দিতেন না। কিন্তু রামরাম সহসা অকালে পরলোক গমন করেন। কাজেই সাধক রামপ্রসাদকে পূজার্চনা ও জপতপ ছাড়িয়া সংসার-যাত্রানির্বাহের নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে হয়। তখন তিনি চাকুরির উদ্দেশে কলিকাতা নগরে গমন করেন এবং গরাণহাটায় নবরঙ্গ-কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের ভবনে কেরানার কার্যে নিযুক্ত হন,—মাহিনা মাসিক ৩০৲ মাত্র।

এই সামান্য ত্রিশ টাকার চাকুবি পাইয়া পিতৃহীন যুবক রামপ্রসাদ অতিশয় আহ্লাদিত হন। তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া এই অকূল সংসার-সাগর পারি দিবার একটা উপায় হইল দেখিয়া, তিনি জগদীশ্বরীর চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করেন। তাঁহার প্রতি শ্যামা-মায়ের কৃপার পরিচয় পাইয়া তিনি ভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়েন এবং দিবানিশি মনে মনে গীত রচনা করিয়া বিশ্বজননীর প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকেন। ধনাঢ্য মিত্র মহাশয়ের সংসার-খরচের হিসাব লেখা তাঁহার চাকুরি, কিন্তু সেই হিসাবের খাতাতেই তিনি বেহুঁসভাবে স্বরচিত গীত লিখিয়া ফেলেন। পার্থিব বিষয় অপেক্ষা পারমার্থিক চিন্তায় তিনি এত অধিক নিমগ্ন থাকেন যে চাকুরির কার্যে তাঁহার প্রায়ই শৈথিল্য ঘটে এবং হিসাবের পরিবর্তে গানের দ্বারা তাঁহার খাতা পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্মচারী বিরক্ত হইয়া প্রভুর নিকটে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ জানান। তখন মহামান্য মুনিব মহাশয় তাঁহার হিসাবের খাতা দেখিতে চাহেন। কিন্তু খাতাখানির আষ্টে-পৃষ্ঠে কালীনাম, দুর্গানাম, মায়ের বন্দনা-গান প্রভৃতি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হন এবং প্রথমেই যে গানটি তাঁহার চোখে পড়ে, তাহা পড়িয়া তিনি অতিশয় বিমুগ্ধ হন।—

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর—তবু শিবের মাইনে ভারি॥

আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণধুলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি ॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥

ধর্মপ্রাণ মিত্রমহাশয় তাঁহার দরিদ্র কেরানীর প্রবল ঈশ্বরভক্তি ও স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে একান্তচিত্তে সাধন-ভজন করিতে ও মাযেব চবণে মধুময গীতাঞ্জলি অর্পণ করিতে সদুপদেশ দেন। তাঁহাব নিজেব আয় হইতে বামপ্রসাদের সংসার-যাত্রার জন্য ৩০৲ বৃত্তিব ব্যবস্থা তিনি কবেন এবং নবীন সাধককে স্বগৃহে ফিরিয়া জগন্মাতাব আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। গুণগ্রাহী প্রভুর এই সহজ কৃপাকে শ্যামামাযেবই দযা মনে করিযা বামপ্রসাদ অতীব উৎফুল্ল হন।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে ॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্ রে তুই বসে বসে ॥
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধর্‌বে না আর কালবিষে ॥
গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধরে যতনে কষে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে ॥

অতঃপর রামপ্রসাদ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নির্বিঘ্নে মাতৃ-পূজায মনোনিবেশ করেন। তিনি সর্বক্ষণ ধর্ম-কর্ম লইয়া ব্যাপৃত থাকেন এবং মুখে মুখে শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিযা সর্বদা উচ্চকণ্ঠে গান করেন। তাঁহার সেই গানগুলি নির্মল ভক্তিভাবে ও আন্তরিক আবেগে শ্রোতৃবর্গের হৃদয সহজেই স্পর্শ করে। পতিত-পাবনী গঙ্গাবক্ষে সে মধুর গীতধ্বনি বহুদূরে ভাসিয়া যায়, সে সুরের অমৃতলহরীতে বহুলোকে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সন্নিকটে আসে। ভাগীরথী তীরে দাঁড়াইয়া পথশ্রান্ত পথিকেরা সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হয় ; নদীবক্ষে নৌকা থামাইয়া আরোহীরা সে সঙ্গীত-সুধা পান

করে ; তাঁহার সেই আবেগময় গীতধারা শ্রবণ করিবার জন্য স্নানার্থী যাত্রীদের ভীড় লাগিয়া যায়। আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে তিনি গাহিয়া উঠেন—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥

কথিত আছে, নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় একদা নৌকারোহণ-কালে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হন এবং যতক্ষণ গান চলিতে থাকে ততক্ষণ তরণী থামাইয়া তন্ময়ভাবে উহা নীরবে শ্রবণ করেন। তাঁহার সুমধুর গীত ও সুমিষ্ট বাক্যালাপে মহারাজা অতিশয় প্রীতি লাভ করেন ও তাঁহাকে রাজসভায় স্থান দিতে অভিলাষী হন। কিন্তু পল্লীগ্রামের প্রশান্ত পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর বিলাস-ব্যসনের অশান্ত কোলাহলের মধ্যে যাইতে তিনি সম্মত হন না। অগত্যা মহারাজা তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ করিবার জন্য দান করেন ও "কবিরঞ্জন" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তিনিও প্রতিদান-স্বরূপ একটি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখিয়া মহারাজাকে উপহার দেন।

এইরূপে রামপ্রসাদ মায়ের নাম গাহিয়া একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি ও মাসিক ৩০৲ বৃত্তি অর্জন করিয়া, সংসার-যাত্রা-নির্বাহ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হন ও পূর্ণোৎসাহে মাতৃ-পূজায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার গৃহ-সংলগ্ন একটি উদ্যানে পঞ্চবটী রোপণ করিয়া তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করেন এবং সংসার-চিন্তা ছাড়িয়া সাধন-সমুদ্রে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান।—

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন—দু চার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন নিলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

কথিত আছে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মৃত্যুর পূর্বে রামপ্রসাদকে স্বীয় প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন ও তাঁহার মুখের মধুর গান শুনিতে শুনিতে তিনি পরলোকে প্রয়াণ করেন। সেই বিখ্যাত গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা॥

শেষ-জীবনে রামপ্রসাদ গৃহের সংস্রব একেবারে ছাড়িয়া দেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রদ্বয় যথাসাধ্য সংসার চালনা করেন। তিনি দিবানিশি পঞ্চবটী বনে কালীপূজা লইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন, আর প্রাণের আবেগে নিত্য নূতন গীত গাহেন। "এই সময় অপরূপ দিব্যজ্যোতিতে তাঁহার শরীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবেশীরা দেখিলে হঠাৎ চিনিতে পারিত না, স্তম্ভিত হইত। এই কি সেই রামপ্রসাদ। কি দিব্য কমনীয় কান্তি, কি স্নেহময় মূর্তি। অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতি যেন সর্বাঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে।"[১]

রামপ্রসাদ অবশেষে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন ;—সজ্ঞানে গান গাহিতে গাহিতে তিনি স্বর্গলোকে চলিয়া যান। তাঁহার পরলোক-গমনের পূর্বরাত্রে দীপান্বিতা অমাবস্যায় তিনি ঘটা করিয়া কালীপূজা করেন ও সারা নিশি জাগিয়া মহানন্দে বহু নূতন গান গাহেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিবেশি-বৃন্দসহ তিনি ভাগীরথী-নীরে প্রতিমা বিসর্জন দিতে গমন করেন। নদীতীরে উপনীত হইলে, তিনি আকণ্ঠ জলে নামিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে গীত গাহিতে থাকেন। একে একে তিনটি গান গাহিয়া তিনি আর একটি গান ধরেন—

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে॥

১, স্বামী বামদেবানন্দ, 'সাধক রামপ্রসাদ'।

শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি ;
মাগো, ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই ;
মাগো, ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা তুলে দিয়ে গাছে ॥
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড় ;
মাগো, ওমা, আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥

এই চতুর্থ গানের শেষ চরণটি গাহিতে গাহিতে তিনি তন্ময় হইযা পড়েন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, তাঁহার অন্তিম শ্বাস অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যায়। তিনি দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহার বয়স কত, তাহা সঠিক জানা যায় না ; কেহ বলেন আশী বৎসর, কেহ বলেন একশত বৎসর।

শ্যামা-সঙ্গীতের দ্বারা রামপ্রসাদ অমরতা লাভ করিলেও, তাঁহার রচিত অন্যবিধ কাব্যের অভাব নাই। 'বিদ্যাসুন্দর', 'কালীকীর্ত্তন,' 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে তিনখানি কাব্য ও 'শিবকীর্ত্তন,' 'সমরগীত,' 'আগমনী' ও 'বিজয়া' নামে অনেকগুলি গীত তিনি রচনা করেন। 'কালী কীর্ত্তন' কাব্যে পার্বতী দেবীর বাল্য-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।. গিরিরাজ হিমালয়ের ঔরসে ও মহারাণী মেনকাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, গৌরী যে সাধারণ বালিকা নয়, সে যে শিবশক্তি সতীদেবীর অভিনব আবির্ভাব, তাহাই এই কাব্যে মনোহররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদা যেরূপ শিশু-কৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়ায় ঐশী মহিমার বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হন, হিমালয়-মেনকাও সেইরূপ উমাদেবীর শৈশবলীলায় ক্ষণে ক্ষণে দৈবীভাবের প্রকাশ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন। কিন্তু উমার বাল্যলীলা অঙ্কন করিতে গিয়া কবি বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার অনুসরণ করিয়াছেন। উমার হাতে পাচনবারি ও বাঁশরী দিয়া, কবি তাঁহার দ্বারা গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলা পর্যন্ত করাইয়াছেন। আবার, কৃষ্ণপ্রেমাকুলা শ্রীরাধার মত উমাকেও তিনি শিবানুরাগিণী করিয়া তুলিয়াছেন। .বিরহিণী রাধার ন্যায় উমাও মহেশের বিরহে ব্যাকুলা হইয়া কুঞ্জকাননে কাঁদিয়া ফেরেন। কবির ভক্তিময় দৃষ্টিতে শ্যাম ও শ্যামা, রাধা ও উমা অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন ;—বৈষ্ণব ও শাক্তে তিনি সমন্বয় ঘটাইয়াছেন।

কালীকীর্ত্তন

উমাদেবীকেও অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদ কতকগুলি 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীত রচনা করেন। সুগভীর বাৎসল্যরসে এই গীতগুলি অতীব মধুর। বৎসরান্তে দুর্গাপূজার সময় গৌরীদেবী কৈলাস-শিখর ছাড়িয়া পিতৃগৃহে আসেন, ইহাতে স্নেহময়ী মেনকার কত না উল্লাস! আবার পূজান্তে দুর্গা পতিগৃহে ফিরিয়া যান, তখন প্রাণের কন্যাকে পরের ঘরে পাঠাইতে মেনকার কতই না হৃদয় বেদনা! মেনকা ও উমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি প্রকৃতপক্ষে কোমলহৃদয়া বঙ্গজননী ও মাতৃ-অনুরাগিণী বঙ্গললনার পরস্পর নিবিড় প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গীতটিতে ক্ষুদ্র শিশুর আব্দার পূর্ণ করিবার জন্য জননীর ব্যাকুলতা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

আগমনী ও বিজয়া

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে ॥

দীর্ঘকাল পরে, পতিগৃহ হইতে স্নেহের কন্যা যখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে, তখন বঙ্গজননী সেই হারানিধিকে পাইয়া কত আনন্দিত হয়, নিম্নলিখিত গীতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।—

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে ॥
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে ॥

শুনিয়া এ শুভবাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ-গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ অধরে॥
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে সাধারণতঃ দরিদ্র সংসারে পড়ে। মেয়ের পতি-গৃহের কষ্টের কথা ভাবিয়া, কোমল-প্রাণা মাতা কন্যাকে আর স্বামীর কুটীরে পাঠাইতে ইচ্ছা করে না। বিজয়া-গীতগুলির মধ্যে মাতার সেই সমবেদনা ধ্বনিত হইয়াছে।—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে-মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

সমর-গীত

রামপ্রসাদ সমর-বিষয়ক কতিপয় গীত রচনা করেন। এইগুলিতে শ্যামা-মায়ের দনুজদলিনী ভয়ঙ্করী মূর্তি প্রোজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। অনুপ্রাস ও ছন্দ-লালিত্যে এই গীতগুলি প্রশংসনীয়। ইন্দ্রিয় রিপুচয়ের বিরুদ্ধে বিবেক-জ্ঞানের দুর্বার অভিযানের কথা ইহাদের মধ্য দিয়া গূঢ়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জাতীয় গীতের একটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

বামা ওকে এলোকেশে।
সঙ্গিনী, রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি বেশে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরসে।

ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,
　　পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিযা,
　　ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে,
　　মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ॥
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে,
　　রূপে আলো করিছে দিগ্‌দশে।
কি করি রণেরে, হয়েছে মনে রে,
　　প্রসাদ ভনেরে চল কৈলাসে ॥

রামপ্রসাদের সমধিক প্রশংসা তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীতের জন্য। এই পদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। "ভাষার স্বচ্ছন্দ সরল গতি, সুরের অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, ভাবের গভীরতা একত্রে কেন্দ্রীভূত হইযা প্রসাদ-পদাবলীকে অপূর্ব্ব বস্তুতে পরিণত করিযাছে।"[১] ইহাদের মাধুর্য ও ভাব-গাম্ভীর্য গদ্য ভাষায় সহজে প্রকাশ যায় না। কবি মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, সেই সপ্রেম সাধনার অনুপম অনুভূতি এই গীতনিচয়ের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাধন-পথে তিনি যতই ঊর্দ্ধস্তরে উঠিযাছেন, ততই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গান গাহিয়াছেন। "রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্বের ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন।......তাঁহার ভক্তি-সাধনার প্রতিপদের চিহ্ন এই সঙ্গীতমালা। সেই চিহ্ন অনুসারে তাঁহার সঙ্গীতমালা গাঁথিতে পারিলে, ভক্তিশাস্ত্রের এক রমণীয় রত্নমালা লাভ হয।"[২]

শ্যামা-সঙ্গীত

শ্যামা বা কালীমাতা রামপ্রসাদের ইষ্টদেবতা। তাঁহার সঙ্গীতে শ্যামাদেবী স্নেহময়ী জননীরূপে চিত্রিতা। জননী-সর্বস্ব ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় তিনি কালীমাতার করুণা দিবানিশি ভিক্ষা করেন। সংসার-চক্রের দুর্বার নিষ্পেষণে ব্যথিত হইয়া তিনি দুর্বল বালকের ন্যায় বিশ্বমাতার চরণে তাঁহার তীব্র দুঃখ নিবেদন করেন।—

১, স্বামী বামদেবানন্দ।
২, পূর্ণচন্দ্র বসু।

মা, আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি পশুপক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলেম হত ॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ ॥
কুপুত্র অনেক হয মা, কুমাতা নয কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥

শিশু যেরূপ মাতার হস্তে প্রহৃত হইযা জননীর উপর অভিমান করে, কিন্তু আবার তাঁহারই ক্রোড়ে ফিরিযা যায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সংসার-জ্বালায় বিদগ্ধ হইয়া কালীমাতার উপর অভিমান প্রকাশ করেন, কিন্তু শোক-দুঃখ হইতে অব্যাহৃতি পাইবার জন্য শ্যামামাযেরই শরণাগত হন।—

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে, মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥

এইরূপে তিনি সরল ভাষায় ও উদাত্ত সুরে নিজের মনোবেদনা জগন্মাতার চরণে সকাতরে নিবেদন করিয়াছেন। সেই মনের ব্যথাকে তিনি প্রাণের

আবেগে গাহিয়াছেন,—তাই ভাবের মত সুরও তাঁহার হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে। বিশ্বপালিনীর করুণা লাভের নিমিত্ত তিনি যে করুণ আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্মান্তিক ধ্বনি যেন এখনো আমাদের নয়নে অশ্রুবিন্দু টানিয়া আনে !—

আমি এত দোষী কিসে,
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন আমি কাঁদি বসে ॥

রামপ্রসাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল ত্রিতাপ—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখরাশি হইতে চিরদিনের মত মুক্তি লাভ করা। তাঁহার একটি গীতে আছে—"সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।" এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই তিনি অধীর হন। এই মায়ামোহময় রোগশোক-জর্জরিত মানব-জীবনকে তিনি ঘোর দুঃখময় দেখেন ; তাই সেই মহাদুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি শক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জাগতিক দুঃখকে বরণ করিয়াই তিনি এই অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসিতে ভাসিতে শান্তি-স্বর্গের তটে গিয়া উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই ॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুঃখ দিয়ে মা বাজার বসাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥

মহামতি বুদ্ধদেবের ন্যায় ভক্তি-সাধক রামপ্রসাদ ইহলোককে মনোহর ভ্রান্তিময়, সংসারকে ভীষণ প্রতারণাময় ও মানবজীবনকে নিবিড় দুঃখময় বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে, প্রাণসমা পত্নীর প্রেম, প্রাণাধিক পুত্রের স্নেহ, প্রিয়বন্ধুর প্রণয়—কোন কিছুই সত্য নয়,—সমস্তই অস্থায়ী, ক্ষণিকের মাত্র।

যে মনোমোহিনী আজি তোমার বাহুবেষ্টনে অতীব উৎফুল্লা, সেই রমণীই কালি তোমায় ঘৃণার সহিত দূরে ফেলিয়া দিবে। যে আত্মীয়-স্বজন আজ সর্বদা তোমার সন্নিকটে রহিয়াছে, তাহাদের কেহই কিন্তু তোমার পরলোক-গমনের অন্ধকার পথের সহযাত্রী হইবে না। অথচ ইহাদেরই মায়া-মমতায় বশীভূত হইয়া তুমি তোমার সারা জীবন কঠোর অর্থোপার্জনে ব্যয় করিতেছ! কেবল মাত্র সংসার নয়, মানুষের দেহের মধ্যেও তাহার ভীষণ শত্রুকুল বাস করিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদিগকে অবিরাম অস্থির করিয়া রাখিতেছে, কামাদি ষড়রিপু আমাদের মনকে নিরন্তর সঞ্চালিত করিতেছে, এবং কুবাসনা আমাদের চিত্তকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিনষ্ট করিয়া, জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলি এবং স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ঐহিক সুখভোগে বৃথা কাল হরণ করিতে থাকি। এই মিথ্যা জগতে আমরা বৃথাই অহঙ্কারে স্ফীত হই। কারণ, ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনই সার্থকতা নাই, এখানে কেহই চিরদিন প্রভুত্ব করিতে পারে না, এস্থানের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং অসার বিষয়-বাসনার মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হও ও পরমপদ-প্রাপ্তির জন্য সাধনা কর,—ইহাই রামপ্রসাদের সদুপদেশ। এইভাবের দুইটি গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

(১) ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে,
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর-ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥

(২) গেল দিন মিছে রঙ্গে রসে
আমি কাজ হারালাম কালের বশে॥
যখন, তারা, ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ-বিদেশ।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আপন বশে॥
এখন আমার ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে॥

বিষয়-বাসনা হইতে মানুষের দুঃখ জন্মে এবং এই দুরন্ত বাসনাই মানুষের মরণশীল জীবনে আবদ্ধ হইবার প্রধান কারণ। এই হেতু সাধক কবি বাসনা দমন করিতে সর্বদা সচেষ্ট। বাসনা-মলিন হৃদয়ে নির্মল আত্মা কখনও প্রতিভাত হয় না, তাই চিত্তকে কামনাশূন্য করিতে হয়।—

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই,
মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধর্‌বে ভাল
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটী॥

কিন্তু মনের বাসনা বিনষ্ট করিযা আত্ম-সাক্ষাৎকার করা সহজ কথা নয়। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা ভোগলুব্ধ দুর্বলের কর্ম নয়,—"নাযমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তবে, অটল ভক্তির সহিত সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিলে পরমেশ্বরের কৃপায় মনোবাসনা জয় করা যায, মোক্ষ-লাভ অনেকটা সহজ হইয়া আসে। এই আন্তরিক ভক্তির উপরেই রামপ্রসাদ বেশী জোর দিয়াছেন।—

"ওবে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয়, মন, তার দাসী।"
"যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর।"

রামপ্রসাদের প্রায় প্রত্যেক সঙ্গীতেই শ্যামাদেবীর প্রতি অচলা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায। তাঁহার ভক্তি "বিষযীর রাজসিক ভক্তি নহে,—যে রাজসিক ভক্তি কেবল জাঁকজমকে প্রকটিত হইতে চায়; কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাত্ত্বিক ভক্তি। সেই সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজসিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে"—[১]

মন, তোর এত ভাবনা কেন?
জয় কালী ব'লে বস্‌না ধ্যানে।
জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের কর্‌ব পূজা, জান্‌বে নাকো জগজ্জনে।

১, পূর্ণচন্দ্র বসু।

ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে ?
আমি মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, বসাব হৃদ্‌পদ্মাসনে।
আলো-চাল আর পাকা কলা, কাজ কি তোর সে আয়োজনে ?
আমি ভক্তি-সুধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হব মনে মনে।
মেষ-মহিষ-ছাগ-আদি কাজ কিরে তোর বলিদানে ?
জয় কালী ব'লে দাও রে বলি এ দেহের ষড়্‌রিপুগণে।
কাজ কিরে তোর বিল্বদলে, কাজ কিরে তোর গঙ্গাজলে ?
এ দেহে আছে সহস্রদল, দাও রে মায়ের শ্রীচরণে।
ঝাড়-লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর রোষনায়ে ?
এ দেহে আছে জ্ঞান-দীপ, জ্বল্‌তে থাক্‌বে নিশি দিনে।
রামপ্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে ?
জয় কালী ব'লে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের শ্রীচরণে ॥

রামপ্রসাদের অনেক সঙ্গীতে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব স্থানলাভ করিয়াছে। সেগুলির মধ্যে বৈরাগ্য-ভাব বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই সংসার মায়াময় এবং এই পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য পঞ্চভূতের প্রপঞ্চ মাত্র,—ইত্যাদি উচ্চ দর্শনের কথা তিনি সহজভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

এ সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে প'ড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ॥

এই গীতের শেষ চরণটি অপূর্ব মধুর! মাতৃজঠরের সহিত মানবের যে নাড়ী-বন্ধন, তাহা তো ধাত্রী কাটিয়া দেয়, কিন্তু সংসারের সহিত তাহার যে মায়াবন্ধন, তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে কোন্ উপায়ে ? ইহা কেবলমাত্র রামপ্রসাদের প্রশ্ন নয়, ইহা সমগ্র মানবজাতির কঠিনতম সমস্যা। তাঁহার সঙ্গীতমালায় এই মহাসমস্যার সমাধান মিলে।

রামপ্রসাদের প্রায় সকল গীতেই কালী, তারা, শ্যামা প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি দেখিয়া, তাঁহাকে পৌত্তলিক বা সাকার-উপাসক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি নিরাকার ব্রহ্মেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিক দর্শনে সগুণব্রহ্ম ও নিগুর্ণব্রহ্ম—ব্রহ্মের দুই অবস্থার কথা উক্ত আছে। সগুণব্রহ্মের আরাধনার দ্বারাই নিগুর্ণব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। প্রতিমা-পূজা বা মূর্তির ধ্যান করা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী নহে, বরং উহার সহায়ক। পাতঞ্জল-দর্শনে মনঃসংযম করিবার জন্য সাকার মূর্তি-ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। কারণ, ধ্যান করিতে বসিলেই ধ্যান হয় না, নানা চিন্তা আসিয়া চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাই প্রথমাবস্থায় কোন মূর্তি অবলম্বন করিয়া মনঃসংযম করিতে হয়। এই মূর্তি-পূজা অবলম্বন করিয়া সাধকের মন যখন স্তরে স্তরে উঠিতে থাকে, তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া স্বীয় হৃদয-মন্দিরে ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতে পারে, প্রতিমাদি বাহ্যাবলম্বনের আর প্রয়োজন হয় না। অবশেষে তিনি যখন সাধনার উচ্চতম স্তরে উন্নীত হন, তখন সাকার ও নিরাকার দুই-ই তাঁহার কাছে একাকার হইয়া যায়,—অসীম অনন্ত ব্রহ্মে তাঁহার আত্মা বিলীন হইয়া যায়। রামপ্রসাদও সাধনার বিভিন্ন স্তরে উঠিয়া, সাকার বা নিরাকার, যে কোন ভাবেই তন্ময় হইয়া যাইতেন, এবং যখন যে ভাবে থাকিতেন তখন সেই জাতীয় গীত গাহিতেন। তিনি কখনও শ্যামাকে স্থূলা, সগুণা আবার কখনও বা সূক্ষ্মা, নিগুর্ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—

"তারা আমার নিরাকারা।"
"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি মন তাও জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটীর মূর্ত্তি
গড়িয়ে কর্‌লি উপাসনা॥"

মৃত্যু-ভীতির ন্যায় ভয়ঙ্কর ভয় মানুষের আর নাই। কিন্তু যিনি ব্রহ্মদর্শী বা আত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্ত তিনি মৃত্যুতে ভীত হন না;—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার আর কোন কিছুতেই ভয় হয় না। রামপ্রসাদের কোন কোন গীতে এইপ্রকার নির্ভীকতা

সতেজে ব্যক্ত হইয়াছে। ভীষণ যমের প্রতি তিনি নির্ভয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং আমাদের বিশ্বাস, তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছেন।—

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥

॥ সমাপ্ত ॥

আলোচিত গ্রন্থাদি

	লেখক	গ্রন্থ
১।	ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, বিদ্যাপতি গোষ্ঠী, History of Brajabuli Literature.
২।	ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, রামায়ণী কথা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ (ভূমিকা), কাশীদাসী-মহাভারত (ভূমিকা), ময়মনসিংহ-গীতিকা (ভূমিকা), History of Bengali Language and Literature, Mediaeval Vaisnab Literature, Chaitanya and his Companions, Chaitanya and his Age, The Bengali Ramayanas.
৩।	ডাঃ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, The Origin and Development of Bengali Language.
৪।	অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু	বাঙ্গালা সাহিত্য, চর্যাপদ (সটীক সঙ্কলন), দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী (ভূমিকা)।
৫।	রামগতি ন্যায়রত্ন	বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।
৬।	রায় বাহাদুর হারাণচন্দ্র রক্ষিত	ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য
৭।	রমেশচন্দ্র দত্ত	Literature of Bengal.
৮।	J. C. Ghose	Bengali Literature.
৯।	কবিশেখর কালিদাস রায়	প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য

১০।	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য	বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
১১।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	জাতীয় সাহিত্য
১২।	ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার	শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান
১৩।	স্বামী বামদেবানন্দ	সাধক রামপ্রসাদ
১৪।	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বৌদ্ধ গান ও দোহা (ভূমিকা)
১৫।	বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (ভূমিকা)
১৬।	ডাঃ শ্রী তমোনাশ দাশগুপ্ত	পদ্মাপুরাণ (ভূমিকা)
১৭।	অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ভূমিকা), পদামৃতমাধুরী (ভূমিকা)
১৮।	শ্রীসজনিকান্ত দাস	ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (ভূমিকা)
১৯।	অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা
২০।	ডাঃ শ্রীনীহার রঞ্জন রায়	বাঙালীর ইতিহাস
২১।	ডাঃ শ্রীশশীভূষণ দাস	শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে

সংশোধন-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৬	অষ্টাদশ	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ
	২৬	অষ্টাদশ	ষোড়শ
		ও	হইতে
২০	৬	২	১
	পাদটীকা	—	১, মণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ'
২৮	২০	২	১
	পাদটীকা	২	১
৩৬	পাদটীকা	—	১, শ্রীসুকুমার সেন, 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী'
৩৯	১২	সর্বশরার	সর্বশরীর
৪৫	৫	সখাদের	সখীদের
৮৪	২৮	চিরসাথা	চিরসাথী
৯০	১৪	সখাগণ	সখীগণ
৯৪	২১	১৪৮৬	১৪৮৫
৯৬	১৮	সাথা	সাথী
১৬৫	৭	সুখা	সুখী
১৬৯	৯	শেষে	শেযে
১৭১	৩	মনুষ্যরূপা	মনুষ্যরূপী
২০৩	৮	বিরাগা	বিরাগী
২১৩	২১	অরণ্যে	অরণ্যে
২৬০	৪	ভাঁড়	ভাঁড়ু
২৬৩	৪	খুলনা	খুল্লনা
	১৪	খুলনা	খুল্লনা
২৭৮	৮	পরিচত	পরিচিত
২৮৭	২৬	বড়য়া	বড়ুয়া
৩০০	২৩	রামাণ	রামায়ণ
৩২২	১৫	বগার	বর্গীর
৩৫০	৭	ভগ্না	ভগ্নী
	১৫	ভগ্না	ভগ্নী